উপহার

আমার মনের গোপন গহন-তলে
চকিত চরণে আসা-যাওয়া যার চলে—
কেশ হতে ঝরা কুসুমের মৃদু বাসে
স্বপন-লোকের বারতা ভাসিয়া আসে,—
চপল-নয়ন-চকিত-চাহনি-ক্ষেপে
কবে-শোনা সুর, আধ-ভোলা, জাগে কেঁপে !
অমল হাস্য, অধরের মধু-বাণী
ভুলায়ে তোলে এ সকল হৃদয়-খানি !
শত কাজ শত অকাজের কোলাহলে
যার আসা-যাওয়া চিত্ত সরসি' তোলে।
আঁচলে ভরিয়া আনে সে গন্ধ গানে
শ্যামল সবুজে ভরি দেয় মনে-প্রাণে !
কত আশা কত ভাষায় তোলে যে কুহরি—
বেদনাও সুরে-সঙ্গীতে কাঁপে শিহরি !
করে চির-যৌবন-রসে উচ্ছল চিত্ত,
রচে কি মায়া, কুহক, কত ছায়া-ছবি নিত্য !

অন্তরময়ী হে আমার চির-তরুণা—
আমি জানি তব কত প্রীতি, মায়া, করুণা !

কঠিন মর্ত্ত্য যেমনি বাজে এ চরণে—
বিছাও কুসুম উজল গন্ধে-বরণে !
ঝঞ্ঝার মেঘে আকাশ যখনি কালো—
বুকের প্রদীপে দিকে দিকে জ্বালো আলো !
বৈশাখী রোদে দারুণ দহন-জ্বালা- -
মমতা-বাদল অমনি অঝোরে ঢালা !
তুমি আছো, তাই আছে সঙ্গীত-ভাষা—
দুঃখে-দুর্দ্দিনে চমকে রঙীন্ আশা !
তোমারি লীলার শত গানে, শত ছন্দে—
তোমার পূজারী, তোমারেই আজি বন্দে !

সূচী

জয়-যাত্রা	১
ঝড়	৩২
মুস্কিল আসান	৫১
হাসি	৮৫
পাঁচ অঙ্ক	১০৩
মুক্তি	১৩৪
হাব্‌শীর-প্রেম	১৫৯
গঙ্গাস্নানের ফল	১৬৯
প্রেমের ফাঁদ	২০৫
চিরন্তনী	২২১
কাঁচা-পাকা	২৪১
বে-আইন	২৫৩

তরুণী

জয়-যাত্রা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রেলের মোট

বেলা প্রায় দশটা বাজে। রাণাঘাট-লোক্যাল পল্‌তা ষ্টেশনে থামিতে ইণ্টার-ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। স্থূলবপু লইয়া এক ভদ্রলোক কামরার কোণে বসিয়াছিলেন, তিনি একটা ব্যাগ হাতে লইলেন ও পার্শ্ববর্ত্তিনী এক কিশোরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ঐ গাঁটরিটা নিয়ে নেমে পড়্ রে মেনি—দেরী করিস্‌নে। গাড়ী এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না।

যাহাকে সম্বোধন করিয়া কথাটা বলা হইল, সেই কিশোরী গাঁটরিটাকে বিপুল বলে আকর্ষণ করিয়া যখন কামরার দ্বারের কাছে আসিল, তখন সেই স্থূল-বপু ভদ্রলোক ব্যাগ-হস্তে গাড়ী হইতে প্লাটফর্ম্মে নামিয়া পড়িয়াছেন। দ্বারের কাছে এক তরুণ যাত্রী খবরের কাগজের মধ্যে এমন মনঃসংযোগ করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল যে, কিশোরী মেনি একটু বিপদে পড়িল। গাঁটরি ঠেলিতে গেলে তাঁর পায়ে আঘাত লাগিবার যথেষ্ট আশঙ্কা। অথচ কি বলিয়া যে এদিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। সে

কি ভাবিতেছিল—চোখের পলকমাত্র! বাহির হইতে স্থূল-বপু হাঁকিলেন,—থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লি যে! ভ্যালা মেয়ে বাবা! ও দিকে ঘণ্টা পড়লো—নাম্, নাম্।

প্লাটফর্ম্মে গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল। যে তরুণ যাত্রী খবরের কাগজ পড়িতেছিল, তার চমক ভাঙ্গিলে সে দেখিল, কিশোরী সঙ্কোচ-ভরে দাঁড়াইয়া, আর তার পায়ের কাছেই একটি গাঁটরি। প্লাটফর্ম্ম হইতে হুঙ্কার আসিল,—সঙ্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তবু! রাণাঘাট যাবি না কি?

তরুণ যাত্রীটি ব্যাপার বুঝিয়া কিশোরীকে কহিল,—আপনি নামুন, আমি গাঁটরি নামিয়ে দিচ্ছি।

কিশোরী নামিল, তরুণও গাঁটরি হাতে লইয়া নামিবামাত্র ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। প্লাটফর্ম্মটি বেশ নীচু—গাঁটরি নামাইয়া ট্রেণে উঠিতে যাইবে, এমন সময় ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—অমন কাজ করবেন না, ষ্টেশনে এ্যাসিষ্টাণ্ট স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব এসেচেন ইন্‌স্‌পেক্‌শনে। আমার চাকরীটি যাবে তা হলে মশায়!

—কিন্তু আমার লগেজ যে ট্রেণে রইলো।

সে কথা কে শোনে! ষ্টেশন-মাষ্টার তখন তার হাতখানি বেশ বাগাইয়া ধরিয়াছেন।

নিরুপায়! ট্রেণ প্লাটফর্ম্ম ছাড়াইয়া গেলে ষ্টেশন মাষ্টার কহিলেন,—আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?

—রাণাঘাট। আমার একটা হাতব্যাগ গাড়ীতে রয়ে গেল যে। তা ছাড়া আজকের ফরওয়ার্ডখানা—

ষ্টেশন মাষ্টার একটু অপ্রতিভ হইলেন; হাসিয়া কহিলেন,—আচ্ছা, আমি এখনই তার করে দিচ্ছি ইছাপুর ষ্টেশনে, তারা নামিয়ে

রাখবে'খন। তার পর বলেন ত কাঁচড়াপাড়া' লোক্যালে পাঠিয়ে দেবে—এক ঘণ্টার ওয়াস্তা!

তরুণ কহিল,—বেশ, তাই করে দিন্—চলুন।

ইছাপুরে ব্যাগের জন্য তার করা হইলে তরুণ কহিল—দেখুন দিকি, কি মুস্কিলে ফেললেন। তার পর রাণাঘাটের ট্রেণ কখন্ পাবো জানি না—সেখানে গিয়ে আমায় স্নানাহার কর্তে হবে।

ষ্টেশন মাষ্টার কহিলেন,—পল্‌তা থেকে রাণাঘাট যেতে হলে বিকেল পাচটার আগে ট্রেণ পাবেন না।

তরুণ কহিল—বলেন কি, মশায়?

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—তবে, হ্যাঁ, নিরুপায় হবার মত অবস্থা নয়। এই যে ডাউন কাঁচড়াপাড়া লোক্যাল আসছে, এতে করে বারাক্‌পুরে যেতে পারেন, তার পর সেখান থেকে বেলা পৌনে দুটোয় যোগবানি-প্যাসেঞ্জারে রাণাঘাট যেতে পারেন।

—রাণাঘাটে পৌছুবো কখন্?

দেওয়ালে-আঁটা টাইম টেব্‌ল্ দেখিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—বেলা চারটে।

তরুণ দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল,—চমৎকার!

কথাটা বলিয়া ষ্টেশনের বাহিরে বেঞ্চের উপর সে বসিল, ঘড়ীতে তখন দশটা বাজিতে ঠিক দশ মিনিট বাকী।

হঠাৎ ষ্টেশন-কম্পাউণ্ডের ওদিকে তার দৃষ্টি পড়িল। সেই স্থূল-বপু পুরুষ ও তাঁর সঙ্গে সেই কিশোরী বালিকা চলিয়াছে। পুরুষটার হাতে ছোট হাত-ব্যাগ, আর কিশোরী সেই গাঁটরিটা একবার এ-হাতে, পরক্ষণে ও-হাতে লইয়া হেলিয়া অতি-কষ্টে ঢিপি-ঢাপা-ওয়ালা বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতেছে।

তরুণের মাথায় রক্তস্রোত উছলিয়া উঠিল। পাষণ্ড বর্ব্বর! অতখানি ভুঁড়ি লইয়া জোয়ান পুরুষ অবলীলায় পথ চলিয়াছে, আর ঐ শীর্ণ ক্ষুদ্র বালিকাকে দিয়া একটা কুলীর মোট বহাইতেছে! শুধু তাই? বালিকা বোঝার ভারে মাঝে মাঝে হাঁপাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছে, আর বর্ব্বরটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ খিঁচাইয়া তাকে কর্কশ ভর্ৎসনায় আরও উৎপীড়িত করিতেছে! রাগে তরুণের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল! এ জাতের কখনও মঙ্গল হইবে? এতখানি স্বার্থপর, আত্মপরায়ণ—পরকে দরদ জানাইতে চায় সভায় বক্তৃতা দিয়া! ঐ হতভাগা নিশ্চয় ঐ মেয়েটির বাপ—যদিও চেহারা দেখিয়া অনুমান করা যায় না! কিন্তু এতখানি আস্ফালন...বাঙালী পুরুষ ফলাইতে পারে এক স্ত্রীর কাছে, নয় কন্যার কাছে, নয় ত আশ্রিতা বিধবা ভগিনীর উপর! ছি! একটা কুলি ক'পয়সা লইত! গাঁটরিটা ভারীও ত কম নয়! সে নিজেই বহিয়া প্লাটফর্ম্মে নামাইতে গিয়া যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছে। আর ঐ ভারী মোট অম্লান অকুণ্ঠিত চিত্তে ঐ একফোঁটা মেয়েটার ঘাড়ে তুলিয়া দিয়া লক্ষ্মীছাড়া আরামে চলিয়াছে!

কিছু দূরে তারের বেড়া। বেড়ার ফাঁক দিয়া গলিয়া পুরুষ ও-ধারে পথে উঠিল। মেয়েটি...? বেচারী! জমীর উপর গাঁটরি নামাইয়া বুঝি দম লইতেছে! তরুণ আর থাকিতে পারিল না। সে দ্রুতপায়ে বালিকার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। কিশোরী তখন গাঁটরিটা দুই হাতে ধরিয়া তারের বেড়ার মধ্য দিয়া গলাইবার চেষ্টা করিতেছে। আর পুরুষ? সিংহ-বিক্রমে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে, পিছনে ফিরিয়া তাকায়ও না। আশ্চর্য্য!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহাত্মা গান্ধীর আদেশ

কিশোরীর কাছে আসিয়া তরুণ কহিল,—একটা কথা আছে—শুনচো ?

কিশোরী বিস্ময়ে সঙ্কোচ-ভরা দৃষ্টিতে তরুণের পানে চাহিল। তরুণ দেখিল, মেয়েটি—ইহাকে ঠিক বালিকা বলা চলে না—রৌদ্রের ঝাঁজে মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কপালের উপর একরাশ খোলা চুল উড়িয়া পড়িয়া ঘামে ভিজিয়া আঁটিয়া গিয়াছে। মেয়েটির সীঁথিতে সিন্দুরের স্পর্শ নাই। একরাশ লাবণ্য—চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটি শ্রী—সুমধুর, আর কি আশ্চর্য্য সরলতা! তরুণ কবি নয়, তবু তার মনে হইল, কবিরা যে মৃগ-নয়নার কল্পনা করেন, সে বুঝি এমনি চোখ দেখিয়া! সে কহিল,—তোমার গাঁটরি দাও। আমি নিয়ে যাচ্ছি,—ছেলেমানুষ, ভারী গাঁটরি নিয়ে যেতে পারবে কেন ?

বালিকা বিপদে পড়িল; সাম্‌নের চলন্ত পুরুষটির পানে একবার কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল,—আমি পারবো।

তরুণ হাসিল; হাসিয়া কহিল,—তুমি পারচো না দেখেই আমি বলচি। তা ছাড়া ছেলেমানুষ, তুমি এই ভারি মোট বয়ে নিয়ে যাবে, আর আমি জোয়ান পুরুষ দাঁড়িয়ে তাই দেখবো, এ হতেই পারে না।—বলিয়া সে অগ্রসর হইয়া গাঁটরিটায় হস্তক্ষেপ করিল। বালিকা সরিয়া আসিল। তরুণ কহিল,—ষ্টেশনে ত কুলি ছিল, একজন কুলির মাথায় মোটটা দিলেই ঠিক হতো!

বালিকা নতমুখে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল,—আমাদের বাড়ী বেশী দূরে নয়। এই কথাটুকু বলিয়াই সে স্থূল-বপুর দিকে চাহিল। তরুণ সে-দৃষ্টি লক্ষ্য করিল; সে-দৃষ্টিতে অনেকখানি বিভীষিকা মাখানো ছিল।

তরুণ তবু বিচলিত হইল না। সে কহিল,—ছ্যাখো, তুমি মহাত্মা গন্ধীর নাম জানো, নিশ্চয়ই! তুমি ত খবর রাখো, দেশে পরস্পরের পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য মহাত্মা গন্ধী কি রকম সকলকে উপদেশ দিচ্ছেন। আর এই রকম মোট বওয়ার কাজে তিনি আমাদের আরও বেশী সাহায্য করতে বলেচেন। তাঁর কথাটা রেখেও নয়—

বালিকা তরুণের পানে চাহিয়া আবার মুখ নত করিল। তরুণ কহিল,—ওঁকে ভয় করচো? তোমার বাবা তো—

বালিকা কহিল,—বাবা নন, আমার মামা।

তরুণ কহিল,—তাই বল। বাপ হলে কখনও মেয়েকে এ কষ্ট দিতে পারে? তোমার মামা! কিন্তু তুমি রাগ করো না, আমি সত্যি কথা বলচি, তোমার মামা ভারি স্বার্থপর।

বালিকার রৌদ্র-রাঙা মুখের উপর ভয়ের এমন কালিমা নিমেষে নামিল যে, সে একেবারে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। হাসিয়া তরুণ কহিল,—ভয় নেই, উনি শুনতে পাবেন না। চলো, তোমার মোট নিয়ে যাই। উনি যদি কিছু বলেন, আমি জবাব দেবো, মহাত্মা গন্ধীর শিষ্য আমি; তাঁর আদেশে আমি দুর্ব্বল ট্রেণ-যাত্রীদের মোট বয়ে দি। উনি বিশ্বাসও করবেন। দেখচো ত আমার পরণে খদ্দর।

বালিকা দেখিল, তাই বটে! তরুণকে নাছোড়বন্দা দেখিয়া বালিকা অগত্যা নিরুপায় হইয়া হাল ছাড়িয়া দিল। তরুণ গাঁটরিটা পিঠে তুলিয়া লইয়া কহিল,—এতে কি আছে?

বালিকা কহিল,—বই।

বই! তরুণ বিস্মিত হইল। এই পাড়াগাঁয়ে বইয়ের বোঝা লইয়া এ পাষণ্ড করে কি! এত বড় পণ্ডিত...!

বড় রাস্তায় পড়িয়া সামনেই এক তেমাথা। বাঁয়ের সরু পথ ধরিয়া তরুণ বালিকার পিছনে চলিল। ডানদিকে একটা ছোট বাগান—বাগানে কতকগুলা আম ও লিচুর গাছ। থলো-থলো ফল ধরিয়াছে। তরুণ কহিল,—তুমি বুঝি মামার বাড়ীতে থাকো? তোমার বাবা মা—

বালিকা কহিল,—স্বর্গে!

ছোট্ট কথাটুকু! কিন্তু কথার পিছনে কতখানি বেদনা! অদূরে গাছে কি-একটা পাখী ডাকিতেছিল—বড় করুণ স্বর! তরুণের মনে হইল, মুহূর্ত্তে যেন পৃথিবীর বাতাস বদ্ধ হইয়া গিয়াছে! একটা স্তম্ভিত হাহাকার যেন ঐ দীপ্ত প্রখর রৌদ্রের রশ্মিতে লাল টক্‌টক্ করিতেছে!

তরুণ এই করুণ স্তম্ভিত ভাবটাকে উড়াইয়া দিবার জন্য সবিস্ময়ে কহিল,—এত বই নিয়ে তোমার মামা কি করবেন?

বালিকা কহিল,—মামার বইয়ের দোকান ছিল আগে, এখনও পুরোনো বইয়ের ব্যবসা করেন।

তরুণ কহিল,—দোকান এখন নেই যদি ত এ পুঁটলি কি হবে?

বালিকা কহিল,—এক জন অর্ডার দিয়েচেন, বড়লোক...তাঁর জন্যে—

তরুণ কহিল,—ওঃ, তাই কিনে এনেচেন সেই খদ্দেরের জন্যে।

বালিকা কহিল,—হাঁ। একটু স্তব্ধ থাকিয়া পরক্ষণে আবার সে কহিল,—আপনিও বুঝি পল্‌তায় থাকেন?

তরুণ কহিল,—না।

বালিকা কহিল,—কোথায় তবে যাবেন এখানে? কাদের বাড়ী?

তরুণ কহিল,—আমি রাণাঘাট যাচ্ছিলুম। ওখানে আমার এক বন্ধুর বিয়ে হচ্ছে, তারি বৌভাতের খাওয়া আজ—আমার বিশেষ বন্ধু, দু'দিন থাকবার ইচ্ছাও আছে!

বাধা দিয়া বালিকা কহিল,—তবে এখানে নামলেন যে?

তরুণ কহিল,—ইচ্ছা করে নামিনি। তোমার এই মোট নামাতে যেই প্লাটফর্মে নেমেছি, অমনি ট্রেণও ছেড়ে দিলে—উঠতে গেলুম, ষ্টেশন-মাষ্টার উঠতে দিলে না! তারপর শুনলুম, বেলা সেই পাঁচটার আগে আর দ্বিতীয় ট্রেণ নেই রাণাঘাট যাবার। কাজেই, এ বেলায় পল্‌তায় অবস্থিতি—

বালিকা কহিল,—এখানে কারও সঙ্গে জানা-শোনা নেই আপনার?

হাসিয়া তরুণ কহিল,—তোমার সঙ্গে এই ত জানা-শোনা হলো।

বালিকা অপ্রতিভভাবে কহিল,—তা হলে কোথায় খাবেন?

তরুণ হাসিয়া কহিল,—কেন, তোমাদের বাড়ী! তোমার মামা দুটি খেতে দেবেন না?

বালিকা কিছুক্ষণ কোন জবাব দিল না।

তরুণ কহিল—আমি বেশী খাই না। তোমার মামা ব্রাহ্মণ তো?

বালিকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

তরুণ কহিল,—ওঁর নাম?

বালিকা কহিল,—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

তরুণ কহিল,—তবে আর কি, অন্ন মিলবেই। আমিও ব্রাহ্মণ।

বালিকা যেন একটু ভাবনায় পড়িল। অতি-কষ্টে কহিল,—মামা ভারী কৃপণ।

হাসিয়া তরুণ কহিল,—তোমার ভয় নেই। তোমাদের মোট পৌঁছে দিয়ে আমি কোন দোকানে গিয়ে কিছু খাবার কিনে খাবো'খন।

বালিকা কোনো জবাব দিল না। এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ বা অনুমোদন করিবার সামর্থ্য তার ছিল না। সে নীরবে চলিতে লাগিল। আরও একটা গলি-পথে গিয়া বালিকা কহিল,—আপনার জিনিষ-পত্র সঙ্গে নেই ?·· ষ্টেশনে রেখে এলেন বুঝি ?

তরুণ কহিল,—না। জিনিষপত্রের মধ্যে একটা ব্যাগ ছিল, আর খবরের কাগজ, সেগুলো গাড়ীতেই পড়ে রইলো।

বালিকা বিস্ময়ে চমকিয়া কহিল,—গাড়ীতে ?—তা হলে উপায় ?

তরুণ কহিল,—ষ্টেশন-মাষ্টার পরের ষ্টেশনে তার করে দেছেন, তারা পাঠিয়ে দেবে। ব্যাগে আমার নাম লেখা আছে। ভালো কথা, তোমার সঙ্গে এত কথা কয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তোমার নামটি এখনও জিজ্ঞাসা করি নি। তোমার মামা ত মেনি বলে ডাকলেন, তোমার ভালো নাম ?

বালিকা কহিল,—নীলিমা দেবী।

তরুণ কহিল,—বেশ নাম তো !·········

অদূরে ক্ষুদ্র লোকালয়। বালিকা একখানা একতলা বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কহিল,—ঐ আমাদের বাড়ী। এবারে ওটা আমায় দিন্—এটুকু আমি নিয়ে যেতে পারবো।

তরুণ কহিল,—চলো, তোমার বাড়ীতেই দিয়ে আসি। মোদ্দা

তোমার মামা বেশ লোক তো! একরত্তি মেয়ের ঘাড়ে মোট চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন!

নীলিমা কহিল,—আমি ষ্টেশন থেকে প্রায় মোট নিয়ে যাই। বই পৌছে দিয়েও আসি।

—বটে! বাড়ীতে ঝী-চাকর নেই বুঝি?

—না।

—তা হলে অন্য কাজ-কর্ম্মও সব তোমাকেই করতে হয়?

নীলিমা এ-কথার কোনও জবাব দিল না। তরুণ কহিল,—আজ কোথা থেকে আসছিলে?

নীলিমা কহিল,—কলকাতা থেকে।

তরুণ কহিল,—তোমায় দিয়ে এই বইয়ের বস্তা কলকাতা থেকে বইয়ে আনিয়েছেন?

নীলিমা কহিল,—না।

—তবে তোমায় কলকাতায় নিয়ে গেছলেন যে?

নীলিমা জবাব দিল না। তার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। তরুণ ভাবিল, লজ্জা! কিন্তু এ ব্যাপারে লজ্জার কি আছে!

আর একটু অগ্রসর হইতেই সাম্‌নে নীলিমাদের বাড়ী। দেওয়ালের ইট হইতে বালি-চূণ খসিয়া গিয়াছে। নীলিমা বহু মিনতি করিয়া বইয়ের মোট স্বহস্তে লইল, লইয়া দ্বারের সামনে আসিল। দরজার পরেই একটু উঠান। উঠানে বরবটী, লঙ্কা, বেগুনের গাছ, এক কোণে একটা কল্‌কে ফুলের গাছে হলুদ রঙের অজস্র ফুল ফুটিয়াছে। দ্বারের সম্মুখে মাতুল দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি হাঁকিলেন,—তোর রকম কি রে মেনি! এত দেরী! কোনো কর্ম্মের নোস্—যা, বইগুলো আমার ঘরে রেখে শীগ্‌গির দোকান থেকে এক পয়সার চিনি

নিয়ে আয় দিকিনি—গলাটা শুকিয়ে গেছে, একটু সরবৎ খেতে হবে।

নীলিমা গৃহ-মধ্যে ঢুকিলে মামা তার অনুগমন করিলেন। তরুণ বাড়ীর সামনে পথে দাঁড়াইয়া এ কথাটুকু শুনিল। তার বুকের মধ্য হইতে একটা নিশ্বাস ছুটিয়া বাহির হইল। মনে মনে সে কহিল, অনাথা!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পল্‌তা ষ্টেশন

বিজয় চক্রবর্ত্তীর গৃহের অনতিদূরে পথের বাঁকে মস্ত এক তেঁতুল-গাছ। গাছের তলায় সুদীর্ঘ ছায়া বিস্তারিত রহিয়াছে। তরুণ আসিয়া সেই ছায়ায় দাঁড়াইল, দৃষ্টি চক্রবর্ত্তীর সদরে ন্যস্ত।

অনতিকাল পরে নীলিমা দ্বার পার হইয়া পথে আসিল এবং তেঁতুলগাছের সামনে দিয়া যে সরু মেটে পথ পশ্চিমে গিয়াছে, সেই পথে চলিল। সেখানে জন-প্রাণীর চিহ্ন নাই। নীলিমা একটু অগ্রসর হইয়া গেলে তরুণ পথের মোড়ে দাঁড়াইয়া তার দিকে চাহিয়া তার গতি লক্ষ্য করিল। নীলিমা খানিকটা দূরে গেলে তরুণ ধীর-পায়ে গলির পথে অগ্রসর হইল। একটা উড়ে মালী একখানি গামছায় বাঁধিয়া কতকগুলি জামরুল লইয়া আসিতেছিল। তরুণের কণ্ঠ পিপাসায় শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। মালীকে কাছে ডাকিয়া তাকে পয়সা দিয়া সে কয়েকটা জামরুল কিনিল এবং সেই জামরুল চিবাইতে চিবাইতে নীলিমা যে পথে গিয়াছে, সেই পথে তেমনই ধীর-পায়ে অগ্রসর হইতে লাগিল।

বাঁ-দিকে টিনের ছাদ দেওয়া একটা মেটে ঘর। সেই ঘরে মুদি তার দোকান পাতিয়াছে। নীলিমা দোকান হইতে চিনি লইয়া গৃহের পথে ফিরিতেছিল; তরুণকে দেখিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইল, তার পর কহিল,—এই রোদে ঘুরচেন এখনো? ও কি, জামরুল?

তরুণ হাসিয়া কহিল,—হ্যাঁ, বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল, তাই জামরুল কিনে খাচ্ছি।

নীলিমা কহিল,—জল এনে দেবো ?

তরুণ হাসিয়া কহিল,—না, এতেই বেশ তেষ্টা মিটচে।

নীলিমা কহিল,—কোথায় খাবেন আপনি ?

তরুণ কহিল,—ভগবান্ যেখানে জুটোবেন।

নীলিমা কহিল,—ভগবান্ তো আর মুখে অন্ন তুলে দেবেন না। তিনি হাত-পা দিয়েচেন মানুষকে—মানুষ অন্ন জোগাড় করে নেবে।

তরুণ কহিল,—এক কাজ করলে হয় না ? আমি ঐ তেঁতুলতলায় বসে থাকি গে, তুমি দুটি ভাত এনে দিতে পারবে না ?

নীলিমা ভীত হইল, চকিত হইল। তার মত অসহায়ের কাছে অন্ন চাওয়া···শুধু তাকে বিপদে ফেলা বৈ তো নয়! মামার সজাগ পাহারা, মামীর সতর্ক দৃষ্টি—নহিলে ভাবনা কি ছিল! কোথায় পাইবে ? নিজে না খাইয়া সেই অন্ন নয় আনিয়া দিত! যে দরদ—যে মমতার পরিচয় সে এইমাত্র পাইয়াছে, তার বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা কি তার কিছু নাই ? কিন্তু সে কতখানি নিরুপায়, কি অসহায়! তার বুকটা দুঃখে ক্ষোভে ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইল, চোখের কোণে এক রাশ অশ্রু একেবারে ঠেলিয়া আসিল, অতি-কষ্টে সে-অশ্রুর বেগ সে রোধ করিল। তরুণ বুঝিল, বুঝিয়া কহিল,—অন্নদান করতে অসুবিধা হবে, তা আমি বুঝেচি। তুমি ভেবো না, লক্ষ্মি! আমি অন্নের কাঙাল একটুও নই। দোকানে মুড়ি-মিষ্টি যা পাই, তাই খেয়েই কাটিয়ে দেবো।

নীলিমা কহিল,—তার পর পাঁচটা অবধি এই পথে পথেই কাটাবেন ?

তরুণ কহিল,—মন্দ লাগচে না। সহরে থাকি, পল্লীর এই রৌদ্র, ছায়া, পাখীর ডাক, বনের গন্ধ আমার ভাল লাগচে। ঘুরে ঘুরে পল্‌তা গ্রামখানা দেখে ফেলা যাক্, সময় কেটে যাবে।

নীলিমা কহিল,—আপনি ষ্টেশনে থাকুন গে,—ষ্টেশনমাষ্টার বাবুটি লোক ভালো। ওঁর এক মেয়ে আছে, মলিনা। আমার সঙ্গে তার খুব ভাব। ওঁদের বাড়ী খাবেন আপনি?

তরুণ কহিল,—না, না, এত বেলায় কাকেও আমি বিব্রত করতে চাই না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না—বাড়ী যাও। তোমার মামার আবার সরবৎ না হলে গরম মেজাজ ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। ভারী স্বার্থপর লোক! এই রোদে তুমিও তো কষ্ট পেয়েচো বাপু, তা গ্রাহ্য নেই, আবার পাঠালে এক পয়সার চিনি আনতে!

নীলিমা অগ্রসর হইয়া চলিল। তেঁতুলতলায় পৌছিলে শুনিল মামার হুঙ্কার—মেনি, ওরে মেনি—

—ঐ মামা ডাকচেন, বলিয়া নীলিমা ভয়ে নীলমূর্ত্তি হইয়া গতি ক্ষিপ্রতর করিয়া দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। তার পর অতি করুণদৃষ্টিতে তরুণের পানে চাহিয়া মৃদু স্বরে কহিল,— আপনি চলে যান—এখানে দাঁড়াবেন না—কথাটা বলিয়াই সে উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া গৃহাভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঐ নিষেধটুকুর মধ্যে যে কতখানি মিনতি ঝরিয়া পড়িল, তরুণ তা বুঝিল। আরো বুঝিল, এ মিনতির অপর দিকে কতখানি বে-দরদ, আর নির্ম্মমতা কঠিন পাষাণ-শিলার মত খাড়া আছে! এখন উপায় কি?—সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ঘড়ি খুলিল—ডাউন ট্রেণের সময় হইয়াছে। তার ব্যাগ? ঐ যে একটা শব্দ—ট্রেণ আসিয়া পড়িয়াছে! তরুণ ষ্টেশনের দিকে চলিল।

যখন সে ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, ট্রেণ তখন প্লাটফর্ম্ম ছাড়াইয়াছে। ষ্টেশন-মাষ্টার তাকে দেখিয়া বলিল,—কোথায় গেছলেন আপনি? আপনার ব্যাগ এসেচে।

তরুণ কহিল,—আপনার জিম্মাতেই দয়া করে আপাতত রাখুন। বলিয়া সে প্লাটফর্ম্মের বেঞ্চে বসিল। বসিবামাত্র তার সমস্ত চিন্তা ঐ নীলিমাকে ঘিরিয়া প্রচণ্ড বেদনায় আর্দ্র হইয়া উঠিল। একটা কথা ঠিক যে, নীলিমা মেয়েটি বেশ, তবে সে বড় কষ্টে আছে। এই বয়সে মা-বাপ হারাইয়া এক বর্ব্বর মাতুলের ঘরে দাসীপনা করিয়া কাল কাটাইতেছে। দাসী কি! দাসীর অধম্—নেহাৎ বেচারী! কি করিলে এই মেয়েটির দুঃখ দূর করা যায়? মামাকে দু' কথা শুনাইয়া দেওয়া—ফল তাহাতে বিপরীত দাঁড়াইতে পারে। সে ভাবিল, এ লোকগুলা কি—একটা ছোট অসহায় মেয়েকে একটু দরদের চোখে দেখা কি এতই কঠিন?

ষ্টেশন-মাষ্টার হুঁকা-হাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কহিলেন—আপনি কোন্ ট্রেণে যাওয়া স্থির করলেন?

তরুণ কহিল,—কিছুই স্থির করতে পারি নি—তাই ভাবছিলুম।

ষ্টেশন-মাষ্টার অবাক্ হইলেন। এই খদ্দর-পরা ইয়ংমেনদের সবই কি অদ্ভুত! সব কাজই খেয়ালে করা!

তরুণ কহিল,—আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলুম, আপনার অবসর আছে?

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—আছে।

তরুণ কহিল,—এই গ্রামের বিজয় চক্রবর্ত্তীকে আপনি চেনেন?

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—বিলক্ষণ চিনি।

তরুণ কহিল,—উনি কি করেন?

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—ওঁর বইয়ের দোকান ছিল। দুষ্প্রাপ্য বই ঢের ছিল, তাই বেচে কিছু পয়সাও করেচেন। পলতাতেই বাড়ী—এখনো দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে বেশ চড়া লাভে তা বিক্রী করেন।

তরুণ কহিল,—বইয়ের কারবার করেও এমন বর্ব্বর! ঐ এক ফোঁটা মেয়েটাকে এত কষ্ট দেয়—ওকে দিয়ে অমন ভারী মোট বইয়ে নিয়ে গেল! বামুন, না, চামার?

রাগে তার চোখ জ্বলিয়া উঠিল। বেঞ্চের এক পাশে ষ্টেশন-মাষ্টার বসিলেন, হুঁকায় ক'টা টান দিয়া তরুণের পানে চাহিয়া কহিলেন, —তামাক ইচ্ছা করেন?

তরুণ কহিল,—আজ্ঞে, না, তামাক আমি খাই না।

ষ্টেশন-মাষ্টার আরো দুটা টান দিরার পর আগুনটুকু নির্ব্বাপিত হইলে কুলির হাতে হুঁকা দিয়া কহিলেন,—আহা! বেচারি! মেয়েটি বড় ভালো। আমার মেয়ের কাছে হামেশা আসে। দেড় বছর হলো, মেয়েটির মা-বাপ দুই মারা যায়। বাপ কলকাতার কোন্ স্কুলে হেড মাষ্টার ছিলেন, বিদ্বান্ লোক। ঐ একটি মেয়ে। মেয়েটিকে খুব যত্নে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। মেয়েটি ইংরাজী জানে, সংস্কৃত জানে। সংস্কৃত মোহমুদ্গর থেকে এমন স্থন্দর বাঙলা তর্জ্জমা করেচে—তাও পয়ারে। খাসা মেয়ে! তা মেয়েটিকে দিয়ে রান্না-বান্না বাসন মাজানো সবই করান।

বাধা দিয়া তরুণ কহিল,—দরকার হলে কুলির মোটও তাকে দিয়ে বওয়ান—তা এই একটু আগে দেখলুম।

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—হাঁ, আমি একবার ষ্টেশনে কুলি দিয়ে মোট নেওয়াচ্ছিলুম, তা চক্রবর্ত্তী মশায় চটে গেলেন, বল্লেন,—এইটুকু

পথ, কুলির পয়সা দিতে পারবো না, পয়সা এত শস্তা নয়। মেয়েমানুষ মোট বইবে না তো কি! না হলে শরীর শক্ত-সমর্থ হবে কেন? উড়ে আর সাঁওতালদের মেয়েরা মোট বয়—তাদের শরীরও কেমন মজবুৎ! কলকাতার ঐ পুঁয়ে-রোগা অপদার্থ বাবু-মেয়ে আমার দু-চক্ষের বিষ, ওদের জন্যই ত সমাজ উচ্ছন্ন যেতে বসেচে।

রাগে তরুণ জ্বলিয়া উঠিল, কহিল,—বটেই তো! অত বড় দুম্বো শরীর তুমি না হলে গড়ে তোলো! যাক্, তার পর?

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—মেয়েটি আমার মেয়ে মলিনার বয়সী, বরং কিছু বড় হতে পারে। তা মলিনাই তো এই—হাঁ, চোদ্দ বছর চলচে, দু বছর হলো তার বিয়ে দিয়েচি। মামা এ মেয়েটির বিয়ে দিচ্ছে না, অথচ মেয়ের বাপ হরনাথ বাবুর লাইফ-ইন্সিওর ছিল আড়াই হাজার টাকার— চক্করবর্ত্তী সে টাকাটাও ট্যাকস্থ করেচে। আহা! এই সে-দিন একটি পাত্র পাওয়া গেছলো—ন'পাড়ার শম্ভু চাটুয্যের ছেলে। ছেলেটি একটা পাশ করে রেলের চাকরিতে ঢুকেচে। চালাক ছেলে। পরে উন্নতিও করবে। তা তারা গহনায়-নগদে সবশুদ্ধ দেড়টি হাজা চেয়েছিল—গহনাও তো ওর মার কতকগুলো ছিল। তা বিয়ে দিলে না! বললে, এত ছেলেবেলায় ভাগ্নীর বিয়ে দেবে না—স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে। নিজে অথচ সাত-আট বছর হলো, পরিবার মারা গেলে দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেচে। বললে, ছেলেপিলে নেই, বংশটা লোপ পাবে কি? ছেলে ছিল—ডাগর, ছেলের বিয়েও হয়েছিল, তা সে-বছর বসন্ত হয়ে মারা গেল। বিধবা পুত্রবধূর গায়ের গহনাগুলি সব নিজে রেখে দেচে। পুত্রবধূকে আনে না, তার বাপ-মা আছেন,—তাঁরা পাঠান না—বলেন, আমার মেয়ে শ্বশুরের ঘরে কিসের প্রত্যাশায় বাস করবে এসে!

তরুণ কহিল,– এ স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার কেমন ?

ষ্টেশন-মাষ্টার চারিদিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন,—এ স্ত্রী খাণ্ডারী। তাঁর কাছে জুজুটি হয়ে আছেন। যত তম্বি ঐ এক ফোঁটা ভাগ্‌নীর উপর।

তরুণ কহিল,—বটে! সে চারিদিকে চাহিল। ট্রেণের লাইনগুলা রৌদ্রের তেজে ঝক্‌ঝক করিতেছে। রেলের মসৃণ গা ফুঁড়িয়া আগুনের রক্ত যেন সাপের জিভের মত লক্‌লক্‌ করিতেছে! সারা দুনিয়া নির্ম্মমতার দাব-দাহে কি দারুণ তপ্ত! কোথাও স্নেহ-মমতার শীতল ছায়ার চিহ্ন নাই!

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—আমাদের স্ত্রী-পুরুষে অনেক কথাই হয়। যদি এমন আইন থাক্‌তো যে, কেউ ভাগনী-টাগ্‌নীর উপর অত্যাচার-পীড়ন করলে বাইরের লোক হাকিমের কাছে দরখাস্ত দিলে প্রতীকার হয়!—তাও ছাই কোনো আইন নেই। না হলে আমি ছাঁপোষা মানুষ, তবু মেয়েটিকে আমার বাড়ীতে এনে মেয়ের মত যত্ন করে ঘরে রাখ্‌তুম।

তরুণ নির্ব্বাক্‌। ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েচে তো ?

তরুণ যেন শূন্যে বিচরণ করিতেছিল। কথাটা তার কানে গেল না। সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ষ্টেশন-মাষ্টারের দিকে চাহিয়া কহিল,—কি বল্‌লেন ?

—আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েচে ?

—না। তৃষ্ণা পেয়েছিল বলে ক'টা জামরুল কিনে খেয়েচি।

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—বিলক্ষণ! তা এখানে বন্দোবস্ত করি!

তরুণ বিপুল আপত্তি তুলিয়া কহিল,—না, না, না। অনর্থক এত বেলায় কাকেও পীড়ন করবেন না।

ষ্টেশন-মাষ্টার উঠিলেন, কহিলেন,—তাও কি হয়! আপনি ভদ্রলোক, এ-ভাবে এখানে এসে পড়লেন, আমার অতিথি—অভুক্ত থাকবেন!...তা কি হয়? আমি তো ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। তা আপনি?

—ব্রাহ্মণ।

—আমিও ব্রাহ্মণ। শুধু ভাতে-ভাত। গাওয়া ঘী একটু আছে। জামাই-বাবাজী এসেছিলেন গেল হপ্তায়, একটু ঘী ঘরেই তৈরী করা হয়েছিল। ট্রেণ ফেল করে এই রৌদ্রে না খেয়ে থাকবেন—বলেন কি?

তরুণ কহিল,—ট্রেণ ফেল ত অনেকে করে, আর ফেল করে ষ্টেশনেই বসে থাকে। তাদের সবাইকে যদি আতিথ্যে তৃপ্ত করতে হয়, তা হলে লক্ষ্মী যে ষ্টেশন-মাষ্টারের ঘরের দিকে ফিরেও চাইবেন না।

উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—তাও কখনও হয়, মশায়? অতিথিকে তুষ্ট করার বাড়া পুণ্য আর আছে?

ষ্টেশন-মাষ্টার উঠিয়া নিজের ঘরে গেলেন ও পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন,—উনুনে আগুন আছে এখনও। কতক্ষণই বা! গিন্নী বললেন, আলু-ভাতে ভাত, আর ডাল-ভাতে, ও-বেলার জন্য চাট্টি চুণোমাছ ভাজা আছে, আর দুধ আছে। ঘরের গাই। তার উপর কাল ওপাড়ার জগা বেশ ভালো মর্ত্তমান কলা এক ছড়া দিয়ে গেছলো,... তার এক ছেলের অসুখ হয়, আমি হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিতে সেরে গেছে—হুঃ! এমনি করেই এ নির্ব্বান্ধব পুরীতে থাকা—বুঝলেন কি না—

তরুণের বিস্ময়-শ্রদ্ধার সীমা রহিল না। সে কহিল,—ষ্টেশনের

নীরস লক্ষ্মীছাড়া গণ্ডীর মধ্যে এত বড় প্রাণও থাকে, এ যে আমি বিশ্বাস করতুম না, মশায়! দিন্, পায়ের ধূলো দিন্—উচ্ছ্বসিত আবেগে তরুণ আভূমিপ্রণত হইয়া ষ্টেশন মাষ্টারের পায়ের ধূলা গ্রহণে উদ্যত হইল।

ষ্টেশন-মাষ্টার শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—ছি, ছি, করেন কি! আপনাদের ইয়ংমেনদের উচ্ছ্বাস বড় প্রবল!

তরুণ কহিল,—না, পায়ের ধূলো দিতেই হবে, না দিলে ছাড়চি না।

তার পর ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—যা বলছিলুম, চক্করবর্ত্তী একটি পাত্র পেয়েচেন, ওঁরি বয়সী—পাঁচ-সাত ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী, দুই পরিবার মারা গেছে, তেজ পক্ষে বিবাহ করবে,·· সংস্কৃত কলেজে না কি পণ্ডিতী করে, তাকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে গেছলো কাল বিকেলে। মেয়েটি তাই শুনে ভারী কেঁদেচে আমার পরিবারের কাছে। আহা, কাঁদবে না? বোঝে ত কিছু-কিছু, বয়স হয়েচে·

অনেকখানি রহস্য তরুণের কাছে সাফ হইয়া গেল। ওঃ, তাই! তাই বটে, নীলিমা কথাটা শেষ করিতে পারে নাই! কলিকাতায় কেন গিয়াছিল, এ-প্রশ্নে দুঃখে ক্ষোভে তার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, চোখের কোণে জল আসিয়া কণ্ঠের স্বরকে চাপিয়া ধরিয়াছিল!

সে কহিল,—দেখুন, আমার আর রাণাঘাট যাওয়া হলো না। আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই, এ অন্যায় রোধ করতে পারি কি না।

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—দেখুন তো চেষ্টা করে। না হলে সভা করে, বক্তৃতা দিয়ে, আর চাঁদা তুলে কি ফল! এই যে কন্যাদায়, সমাজের নানা নিষ্ঠুর উৎপীড়ন, এই সবের প্রতীকার করুন দিকি

আপনারা, ও ভোট নিয়ে মারামারি, আর কৌন্সিলে ঢুকে গলাবাজী—এই সব করে গরীব গৃহস্থকে তো বাঁচানো যাবে না! নিজেদের সখই মেটানো শুধু এ! আপনারা ইয়ংমেন, আপনাদের কাছে যে আমরা প্রত্যাশা করি ঢের!

তরুণ উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল,—এর প্রতীকার যদি না করতে পারি, তা হলে হিমাদ্রি বাঁড়ুয্যে বলে আমায় যেন কেউ আর না ডাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিঠি চুরি

বেলা চারিটা বাজিয়াছে। ষ্টেশন-মাষ্টার ডিউটিতে ব্যস্ত। হিমাদ্রি প্লাটফরমের বেঞ্চে বসিয়া আকাশ-পাতাল কত-কি ভাবিতেছিল। তার ভাবনা ঐ নীলিমাকে লইয়া! নানা ফন্দী, নানা ফিকির, নানা মতলবের ধাক্কায় মাথা তার বিষম দোলে দুলিতেছিল।

জোর করিয়া নীলিমাকে যদি সে তার মামার ঘর হইতে তুলিয়া লইয়া যায়? পুলিশের ভয়?.. যদি সে বাঙ্গালোরে চলিয়া যায়? করাচী যায়? কাশ্মীর যায়? কে তার পাত্তা পাইবে? পুলিসের সাধ্য নাই, ধরে! দেশের কাজ, খদ্দর প্রচার, পল্লী-সংস্কার, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, এ কাজগুলা কিন্তু...একটা ক্ষুদ্র বালিকাকে উদ্ধার করিতে গিয়া অত বড় ব্রত পণ্ড করিয়া দিবে! এম-এ পাশ করিয়া ল'য়ের দু'-দুটো পরীক্ষা পাশ করিয়া, শেষেরটা ফেলিয়া সে দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। নিজের গৃহ-সংসার প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প যে একদম ত্যাগ করিল— সে কি এই জন্য? এক দিকে একটি ক্ষুদ্র বালিকা, আর অপর দিকে তার দেশ ভারতবর্ষের গোটা ম্যাপখানা— অসংখ্য ঘর-বাড়ী, লোক-জন, নদ-নদী, পর্ব্বতমালা লইয়া তার চোখের সামনে একটা জটিল সরীসৃপের মত যেন কিলবিল করিয়া ভাসিয়া উঠিল!—না!

তবে?—ঐ বালিকা এক শীর্ণ, লোলচর্ম্ম, জরাজীর্ণ বৃদ্ধের লালসার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া চোখের জলে ভাসিয়া সারা হইবে! একটা জীবন? .. ক্ষুদ্র জীবন! হোক্ ক্ষুদ্র, তবু জীবন...ব্যর্থ হইয়া যাইবে? সুখে-দুঃখে সর্ব্বক্ষণ স্পন্দিত একটা জীবন—আর ওগুলা? নিঃস্পন্দ, জড়, অনির্দ্দিষ্ট,

কি-সব অপ্রত্যক্ষ অজানার সমষ্টিমাত্র! হিমাদ্রি স্থির করিতে পারিল না, সে কি করিবে! কোন্ পথ গ্রহণ করিবে? নীলিমাকে লইয়া পলাইবে—কিন্তু তার পর? আজীবন তাকে বাঁধিয়া লইয়া চলাও দুষ্কর! একটি যোগ্য পাত্র দেখিয়া তাহার বিবাহ দিতে হইবে। সে বিবাহ দিতে গেলে তো আর তোমার বাঙ্গালোরে কিম্বা কাশ্মীরে পলাইয়া থাকিলে চলিবে না—পাত্র খুঁজিতে গেলে ঐ কলিকাতায়, কি তার আশেপাশেই খোঁজ করিতে হইবে! অথচ এধারে খোঁজ করিতে গেলে পুলিশ—শেষে কি মেয়েটাকে আদালতে দাঁড় করাইবে? যে লক্ষ্মীছাড়া দেশ!

চিন্তায় হিমাদ্রি এমনই বিভোর যে, নিঃশব্দে নীলিমা আসিয়া কখন্ তার কাছে দাঁড়াইয়াছে, সে তা জানিতেও পারে নাই। হঠাৎ কি একটা শব্দে হিমাদ্রির চমক ভাঙ্গিলে সে ফিরিয়া দেখে, নীলিমা আসিয়াছে। বেঞ্চের এক পাশে সরিয়া গিয়া হিমাদ্রি কহিল—এই যে, নীলিমা, এসেচো? বসো।

নীলিমা বসিল না, কুণ্ঠিতভাবে একধারে দাঁড়াইয়াই রহিল। হিমাদ্রি কহিল,—কি খবর?

নীলিমা কহিল,—আপনার ট্রেণের সময় হয়েচে বলে দেখ্তে এলুম। রাণাঘাট যাচ্ছেন তো এখন?

হিমাদ্রি কহিল,—না, যাওয়া হলো না।

নীলিমা বিস্মিত হইল। সে কহিল,—যাবেন না?

হিমাদ্রি কহিল,—না। অবেলায় এত বেশী খাওয়া হয়েচে যে, আর নড়বার সামর্থ্য নাই।

নীলিমা কহিল,—শুন্‌লুম, মলিনাদের এখানে খেয়েচেন আপনি।

হিমাদ্রি কহিল,—হাঁ। আর এত বেশী খেয়েচি যে, এ বেলায় না খেলেই ভালো হয়।

হিমাদ্রি নীলিমার পানে চাহিল, নীলিমা যেন কি বলিতে চায়, এমনই ভাব! হিমাদ্রি তা বুঝিল; বুঝিয়া প্রশ্ন করিল,—আমাকে কোনো কথা তুমি বল্‌তে চাও, নীলিমা?

নীলিমা পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। হিমাদ্রি কহিল,—বলো, কি বল্‌তে চাও! লজ্জা কি? নীলিমা মৌন দৃষ্টিতে আর একবার হিমাদ্রির পানে চাহিয়া বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া কহিল,—আপনি তো কলকাতায় থাকেন। তা, কলকাতায় আমার এক বন্ধু আছে, তার নাম সরসী। তাকে একখানা চিঠি লিখেচি, কিন্তু টিকিট কোথায় পাবো? আপনি যদি দয়া করে একটা চার পয়সার টিকিট এঁটে এই চিঠিখানা ডাকে দিয়ে দেন—

—দাও চিঠি।

নীলিমা চিঠি দিল। পাঁচ-ছ পাতা চিঠি। বালির মোটা কাগজ ভাঁজ করিয়া সে একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

হিমাদ্রি কহিল,—খাম নেই তো!...তা তোমার বন্ধুর ঠিকানা?

আর এক টুকরা কাগজ হিমাদ্রির হাতে দিয়া নীলিমা কহিল,—এইতে লেখা আছে।

হিমাদ্রি কাগজখানা হাতে লইল। তাহাতে ইংরাজি ও বাংলায় এমনি লেখা আছে—

"শ্রীমতী সরসীবালা দেবী।

C/o, Babu Gopendanath Ganguli.

36, Hiru Haldar, Lane.

Bagbazar, Calcutta."

পরিষ্কার ছাঁদের হরফগুলি। কালো মুক্তা নাই, কেহ দেখেও নাই! যদি থাকিত, তাহা লইলে কালো মুক্তা এমনই স্থন্দর হইত!

হিমাদ্রি কহিল,—তোমার হাতের লেখা?

নীলিমা সলজ্জভাবে কহিল,—হাঁ।

হিমাদ্রি কহিল,—খাসা লেখা! বাঃ, চমৎকার!

হিমাদ্রি নীলিমার পানে চাহিল। অপরাহ্লের সূর্য্য-কিরণ তার মুখে পড়িয়াছিল, শ্যামল বর্ণ···তা হোক, কিন্তু কি ডাগর চোখ! বসন্তের সবুজ পল্লবে যেন কে আবীর ছিটাইয়া দিয়াছে! হিমাদ্রি কহিল,— তোমার সব কথা শুনেচি, নীলিমা। তোমার সব ভালো, শুধু ঐ মামাটাই যা লক্ষ্মীছাড়া। আর কলকাতায় কেন গিয়েছিলে, তাও শুন্‌লুম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, নীলিমা। সে বুড়ো মর্কটের সঙ্গে তোমার বিয়ে আমি কখনই হতে দেবো না। এতে যদি দাঙ্গা-ফ্যাসাদ করতে হয় তো তাতেও আমি প্রস্তত্!

এ কথা শুনিয়া নীলিমা লজ্জায় জড়সড় হইয়া নিঃশব্দে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

হিমাদ্রি ভাবিল. বাঙালীর ঘরের মেয়ে তো নীলিমা, ডাগর হইয়াছে; সভ্য-সমাজের হাওয়ার পরশ তার গায়ে লাগে নাই, কাজেই বিবাহের নাম শুনিয়া লজ্জায় পলাইয়া গেল। সে ভাবিল, না, ও কথা বলিয়া সে ভালো করে নাই। না বলিলে দু'দণ্ড তবু সে কাছে থাকিত।

কিন্তু এই কাছে থাকা···! চট্ করিয়া হৃদয়ের কোন্ গোপন তল হইতে প্রশ্ন উঠিল, ইহাকে কাছে রাখিতে তোমার মন এত লোলুপ কেন, বাপু? ভালোবাসা? ধেৎ! তা নয়। মমতা—এ শুধু অনুকম্পা!

পরক্ষণেই মন বিদ্রোহী হইয়া কহিল, তুমি কে হে বাপু, নিজেকে এত বড় ভাবিয়াছ যে, ইহাকে অতি-ক্ষুদ্র তুচ্ছ জ্ঞানে ইহার উপর অনুকম্পা প্রকাশ কর! তোমার চেয়ে ও কিসে ছোট? নিজের স্বার্থ, নিজের ইচ্ছা, নিজের নিজত্ব বিসর্জ্জন দিয়া একটা বন্য জানোয়ারের মত দুর্দ্ধর্ষ মাতুলের ইচ্ছায় যে চলাফেরা করিতেছে, কত বড় হীরোর মত কতখানি দুঃখ ঐ ক্ষুদ্র বুকে সহ্য করিতেছে, ভাবো তো! তুমি হইলে নিমেষে ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইতে!

হিমাদ্রি ভাবিল, সে যদি নিজেই নীলিমাকে বিবাহ করে? কিন্তু না, তা হইতেই পারে না। হাইকোর্টের অত বড় দিগ্‌গজ উকিল নীলাম্বর মুখুয্যের সুন্দরী কন্যা···তার সঙ্গে দশ পনেরো হাজার টাকার যৌতুক, সেই সঙ্গে বিধবা মা'র মিনতি, আগ্রহ, সমস্তই সে বিরূপতার ঠোক্করে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে এই দেশ-সেবার পবিত্র ব্রত-পালনের জন্য! আর এখন একটা কিশোরীর রূপের মোহে—রূপমোহ? না, নীলিমার চেয়ে সুন্দরী মেয়ের অভাব ছিল না কোন দিনই এ দেশে! প্রেম নয়, ভালোবাসা নয়···এ শুধু এক দুর্ব্বল অনাথ অসহায় বালিকার প্রতি মমতা—মমতা মাত্র।

রেলের কুলি ঘণ্টা দিল। দুই একজন লোক টিকিট কিনিয়া প্লাটফর্ম্মে পায়চারি করিতে লাগিল; এবং ঘট্-ঘট্ শব্দে ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল—লোক উঠিল, লোক নামিল, ট্রেণ ছাড়িয়া গেল। হিমাদ্রি তখনও বসিয়া চিন্তার মালা গাঁথিতেছে। ষ্টেসন-মাষ্টার কহিলেন,—গেলেন না?

হিমাদ্রি কহিল,—না। আমি ভাবছিলুম···হিমাদ্রি ষ্টেশন-মাষ্টারের পানে চাহিল।

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—কি?

হিমাদ্রি কহিল,—ঐ মেয়েটিকে কি করে উদ্ধার করা যায়? একটি ভালো পাত্র—

ষ্টেশন-মাষ্টার উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন,—আহা! তা যদি পারেন।

হিমাদ্রি কহিল,—তাই ভাবচি!···আপনার ডিউটি শেষ হলো?

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—আর দু'খানা গাড়ী পাশ করতে বাকী! একখানা ডাউন—এলো বলে—

হিমাদ্রি কহিল,—আপনার ডিউটি শেষ হলে পরামর্শ করবো।

—বেশ। বলিয়া ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁর কামরায় চলিয়া গেলেন।

হিমাদ্রির বুক-পকেটে নীলিমার লেখা চিঠিখানি যেন খাঁচার মধ্যে বদ্ধ পাখীর মত ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল! হিমাদ্রি ভাবিল, চিঠিখানা পড়িয়া দেখিব? নীলিমা তাঁর বন্ধুকে কি লিখিয়াছে? কিন্তু বড় গর্হিত কাজ হইবে! বিশ্বাস-ঘাতকতা! একরত্তি মেয়ে বিবাহ হয় নাই—তার চিঠিতে এমন কোনো গোপন কথা থাকিতে পারে না·· দোষ কি? কোন মন্দ অভিসন্ধি তো তার নাই। বরং যদি এ চিঠিতে আরো কিছু পরিচয় পাওয়া যায়—নীলিমার মনের অতি-গূঢ় কোন ব্যথা!

দুর্ব্বার লোভ! হিমাদ্রি সেই অপরাহ্ণের সূর্য্যালোকে চিঠি খুলিল। মস্ত চিঠি—নানা দুঃখ-কষ্টের উল্লেখ করিয়া, সখীর সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করিয়া—এ কি—নীলিমা এ কি লিখিয়াছে······

চিঠির একাংশে লেখা আছে—

"বিয়ের ঠিক করেচেন মামা এক বুড়োর সঙ্গে। দুটিকে পার করেও তাঁর বিয়ের সাধ মেটেনি। এক-ঘর ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী। তৃতীয় পক্ষে আমাকে গ্রহণ করে তিনি মামার দায় উদ্ধার করতে উৎসুক। পাকা চুলে কালো কলপ মেখে আমায় দেখতে এসেছিলেন।

অসহ্য, ভাই! স্নেহলতা কাপড়ে আগুন জেলে তার মা-বাপকে সকল চিন্তার দায় থেকে মুক্ত করেছিল। আমি এ অপমান থেকে সেই ভাবেই মুক্তি নেবো। বড় সাধ ছিল, তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো, তা –”

এই অবধি পড়া হইতেই বিশ্বের সব আলো হিমাদ্রির চোখের সামনে নিবিয়া গেল। অন্ধকার—অন্ধকার—রাশি রাশি অন্ধকার আসিয়া বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ফেলিল! ভগবান্, ভগবান্, তোমার রচিত এ আলোর ছুনিয়ায় এত অন্ধকার! ছুঃখের শোকের অতি গাঢ় এমন অন্ধকারও ছুনিয়ায় আছে!

ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া কহিলেন,—কি পরামর্শ—বলুন তো?

হিমাদ্রি কহিল,—অনেক কথাই ভাবলুম, মেয়েটিকে রক্ষা করার একটি উপায় আছে। ভালো পাত্র—না?

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—ঠিক বলেচেন।

হিমাদ্রি কহিল,– দেখুন, আমি এম-এ পাশ করেচি, ল’য়ের ছুটো একজামিন পাশ করেচি এবং তাতে সেকেণ্ড হয়েচি। তারপর নন-কো-অপারেশনের জন্য শেষটি দিইনি। আমরা ছু’ভাই। আমি বড়, আমার বাবা ছিলেন ডাক্তার, মারা গেছেন। বাড়ী আছে, মোটর আছে, নগদ টাকা-কড়িও যা আছে, তাতে আমার চাকরী না করলেও চলে। আমার নাম হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ যণ্ডা ষাঁড় মামা আমার হাতে কি নীলিমাকে দেন না? আমি এক পয়সাও চাই না। এমন কি নীলিমার বাবার লাইফ-ইন্‌সিওরের আড়াই হাজার টাকাও না। তার উপর ওঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীকে বেনারসী শাড়ী সেলামি দেবো, আর মামা যদি বিয়ের খরচ-পত্র চান তো তাও নগদ ছু-চারশো টাকা তাঁকে দেবো। উত্তেজনায় হিমাদ্রির নিশ্বাস জোরে বহিতেছিল।

ষ্টেশন-মাষ্টার অভিভূত হইয়া পড়িলেন; কহিলেন,—বলেন কি, আপনি? আহা! মেয়েটার এমন ভাগ্য হবে?

হিমাদ্রি ষ্টেশন-মাষ্টারের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—আপনি সাহায্য করুন্। আপনার স্ত্রীকে বলে দিন, তিনি যদি দয়া করে ঐ মামার দ্বিতীয় পক্ষটিকে লুব্ধ করে তুলতে পারেন,—তা ছাড়া মামাটাকেও বল্‌বেন, আমি হিষ্ট্রীতে এম-এ, তাঁর বইয়ের নিয়মিত খদ্দের হতে রাজী।

ষ্টেশন-মাষ্টার কহিলেন,—বাবা, বাবা, তুমি কি শুভক্ষণেই আজ পল্‌তা ষ্টেশনে নেমেছিলে!

* * * *

মামা এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন। তবে অনেক তর্কের পর, অন্দর হইতে তাড়নার প্রেরণায়।

হিমাদ্রি রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া মাকে প্রণাম করিয়া যখন এই সংবাদ সবিস্তারে জানাইল, তখন তিনি এতখানি খুসী হইলেন যে, তাঁর দুই চোখে অশ্রুর বন্যা নামিল। তিনি বলিলেন,—তুই আজ আমায় বড় সুখী করলি, বাবা!

হিমাদ্রি কহিল,—ভেবে দেখলুম, নন্‌-কো-অপারেশনে কিছু হবে না, মা। জাতি গড়তে হলে আমাদের নিজেদের মধ্যে কো-অপারেশন চাই। আগে নিজেদের ছোট ছোট গণ্ডী, তার পর বাংলা দেশ—তার পর গোটা ভারতবর্ষ—অর্থাৎ আগে হেলে ধরতে শিখে তারপর কেউটে ধরা। তাছাড়া তুমি যে বলতে, সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ···

মা হাসিয়া কহিলেন,—নে, নে, তোর বক্তৃতা রাখ্।

হিমাদ্রি কহিল,—বক্তৃতা সত্যিই রাখচি, মা। বক্তৃতায় কিছু হবে না। দেশের উন্নতি বলো, আর জাতির উন্নতিই বলো, কাজ চাই, কাজ —হাতে-কলমে কাজ!

* * * *

জ্যোৎস্না-প্লাবিত ফুলশয্যার রাত্রে হিমাদ্রি নীলিমাকে বলিতেছিল, —অনুকম্পা, নীলিমা, প্রবল অনুকম্পা শুধু···এর মধ্যে প্রেমের বিন্দু-বিসর্গও ছিল না!

নীলিমা হাসিয়া কহিল,—অনুকম্পা যদি তো মোট নামিয়ে দিয়ে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে থাকবার কি দরকার ছিল মশায়?

হিমাদ্রি কহিল,—একটু বিশ্রাম···

নীলিমা কহিল,—তার পরে রাণাঘাট যাওয়া বন্ধ করে প্লাটফর্মে বেঞ্চে বসে কার ধ্যান হচ্ছিল? আমি গিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম, তা হুঁস নেই!

হিমাদ্রি কহিল,—তোমায় নিয়ে বিলাতী কায়দায elope করবার সাধ ছিল।

নীলিমা কহিল,—যেতুম কি না আমি·· ওঃ, কথা শোনো না। অজানা অচেনা লোক, না হয় মোটই বয়ে দিয়েছিলে···একটা কুলি!

হিমাদ্রি নীলিমাকে বক্ষে টানিয়া আবেগোচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিল,—আজীবন কুলিগিরি করতেও হলো তাই···কিন্তু মোট বওয়ার দাম? বলিয়া অজস্র চুম্বনে নীলিমার মুখখানিকে সে রাঙা করিয়া তুলিল।

—যাও, তুমি ভারী দুষ্টু! বেয়াদব কুলি···লজ্জা করে না? চিঠি চুরি করে পড়া · বিশ্বাস-ঘাতক, বেয়াদব··

হিমাদ্রি কহিল,—ভাগ্যে সে বেয়াদবি করেছিলুম, তাই ! নাহলে সেই থুথ্‌ড়ো বুড়োর পাকা চুলে কলপ লাগাতে হতো !

নীলিমা কহিল,—ইস্, তাই নাকি লাগাতুম ! তার আগেই মামার ঘরে কেরোসিন তেল ছিল না, বুঝি ?

আমরা শুনিয়াছি, হিমাদ্রি ল-এর ফাইনাল একজামিন দিবার জন্য আইনের কেতাবে মন দিয়াছে। তা দিক্, নীলিমাকে তা বলিয়া সে এক তিল চোখের আড় করে না। খদ্দর সে ছাড়ে নাই··· তবে বক্তৃতা ছাড়িয়াছে।

ঝড়

বেশ মনে পড়ে, সে-ও এমনি ঝড়ের রাত! চারিধারে বাতাসের এমনি গর্জ্জন, আকাশে মেঘের এমনি ছুটোছুটি! পনেরো বছরের কথা,—তবু মনে হয়, যেন সে কালকের ঘটনা! সেই রাতটিকে যদি আমার সর্ব্বস্ব দিয়েও আজ ফেরাতে পারতুম!

বাবা আমার মস্ত জমিদার। মান-সম্ভ্রম, আদব-কায়দার দিকে পুরোদস্তুর তাঁর নজর ছিল—আমি তাঁর একটিমাত্র মেয়ে। সকলে বলতো, হাঁ, বাপ্‌কা বেটী! মা বলতেন, বাপের অহঙ্কারটুকুও কি পূর্ণমাত্রায় পেতে হয়! মেয়ে-মানুষের পক্ষে ও জিনিষটা যে ভারী সর্ব্বনেশে!

তখন বুঝিনি, আজ বুঝচি, আমার স্নেহময়ী মার সে কথাটুকু কত খাঁটি! মাগো, চিরদিন নিজেকে সবার আড়ালে সবার পিছনে রেখে সকলকে তৃপ্তি দিয়ে কেন অত তাড়াতাড়ি তুমি চলে গেলে! যাবার বেলায় কেন মা, তোমার এই দুর্দ্দান্ত মেয়েটিকে তার সব অহঙ্কার সব গর্ব্ব চূর্ণ করবার মন্ত্রটুকু শিখিয়ে দিয়ে গেলে না? তাহলে যে আজ তাকে বুকের মধ্যে এমন বেদনা নিয়ে······

সেই কথাই বলতে বসেচি। কোনোখানে এতটুকু গোপনতা রাখবো না! মানুষের কাছে আমি বিচার চাইতে আসিনি—এ যে আমার নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া! রাখা-ঢাকার ফাঁকি তো আর নিজের মনের সঙ্গে চলে না।

আমার বয়স তখন দশ বৎসর—আমার লক্ষ্মী মা হঠাৎ একদিন বাড়ীটায় কান্নার রোল তুলে বিদায় নিলেন। বাবা ছিলেন পুরুষ! তিনি সংসারী জীবের এই মৃত্যুকে চিরন্তন সত্য জেনে মিথ্যা শোকের

ধোঁয়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে ফেললেন না। তিনি তাঁর জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম—পথ-ঘাট তৈরী, খাজনা-আদায়, বাকী বকেয়া উসুলের দরুণ বেয়াদব প্রজাকে শায়েস্তা করা প্রভৃতি—বেশ যথানিয়মেই করতে লাগলেন।

দেখে সকলে বললে, মার মৃত্যুর পূর্ব্বে যেমন, পরেও তেমনি তাঁর কাজ-কর্ম্মের ধারাটি বেশ অবিচ্ছিন্ন বয়ে চলেছে। আচার-ব্যবহারে বা ভাব-ভঙ্গীতে কোথাও এমন একটু ফাঁক দেখা গেল না, যা থেকে বাহিরের লোকে কোনো রকম বিচ্ছেদ বা অমঙ্গলের আভাষ পেতে পারে! বাড়ীর গুরু-পুরোহিত শাস্ত্র আওড়ে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, এই ত স্থিতধী মুনির লক্ষণ! আর একদল লোক আড়ালে বলাবলি করেছিল, মানুষটাকে কি ভগবান এক ফোঁটা প্রাণও দেন-নি! এ কথাটা খুব অস্ফুটে অস্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হলেও আমার কাণে পৌছুতে কিছুমাত্র বাধা পায় নি।

এমন বাপের মেয়ে আমি—মা-মরা মেয়ে! বোধ হয়, নিজের সম্বন্ধে এর বেশী আর কোনো কথা না বললেও চলে!

লেখা-পড়া গান-বাজনা—এই সব নিয়ে বেশ একটা স্বপ্নের রাজ্য গড়ে তুলছিলুম। বাহিরে বিশ্বের পানে চেয়ে দেখবার অবসর ছিল না। কিন্তু হঠাৎ পাঁচজনে এই স্বপ্নের রাজ্যে একটা খবর নিয়ে এল যে বয়স আমার পনেরো পার হতে চলেছে! বাড়ীতে এক বিধবা পিসি ছিলেন; তিনি বাবাকে শুনিয়ে বললেন, এ বয়সে হিন্দুর ঘরের মেয়েকে আইবুড়ো রাখা কিছুতেই চলে না! ইহলোকে লোকলজ্জা ত আছেই, তা ছাড়া পরলোকেও নাকি বিস্তর লাঞ্ছনা জমা হচ্ছে!

বাবা হেসে বললেন, নীরু এখনও ছেলেমানুষ। ওর যখন জমিদারী চালাবার মত বুদ্ধি হবে, তখন ওর বিয়ে দেবো!

পিসি বললেন, শোনো কথা! মেয়ে মানুষ আবার জমিদারী চালাবে কি রকম? তার চেয়ে নয় তোমাদের ঐ লেখা-পড়া-জানা শান্ত শিষ্ট সুন্দর একটি ছেলে দেখেই বিয়ে দাও; সেও তোমার বশে তোমারই ঘরে থাকবে—জমিদারীও বজায় রাখবে।

বাবা বললেন, বেশী-নিরীহ লোক নীরুর সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে পারবে না।

পিসি বললেন, তা ঠিক! যে ধিঙ্গি মেয়ে!

পিসির মুখ গম্ভীর হলো—বাবা চুপ করলেন, আমিও পাশের ঘরে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম!

বিয়ে!

এক-গা গহনা পরে আধ হাত ঘোমটা টেনে মুখ ঢেকে মাটীর পুতুলের মত জড়-ভরতটি হয়ে ঘরের কোণে বসে থাকা তো! পরের ইসারায় নড়া-চড়া খাওয়া-বসা শোওয়া-দাঁড়ানো—সুখে হাসতে পাবো না, দুঃখে বুক ভেঙ্গে গেলেও এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবার অধিকার নেই—এই ত বাঙালীর বৌয়ের সুখের ছবি! কাজ নেই আমার অমন সোনার চাঁদ বরের আদরে ডুবে সংসার করা! যেমন আছি, আমি যেন এমনিই থাকি—এই গান-গল্প, খেলা-ধূলো, হাসি-খুসি নিয়ে! কোনো নতুন লোকের নতুন সঙ্গ-সুখের স্বাদ আমি চাই না!

মনের যখন এমনি অবস্থা, তখন এক দিন বাবা বললেন, চ' নীরু একবার পশ্চিম ঘুরে আসি।

আমি বললুম, চলো।

দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, প্রয়াগ, নানান্ দেশ ঘুরে আমরা একদিন এসে কাশীতে আস্তানা পাতলুম। তীর্থ বলে যে কাশীর উপর টান পড়লো, সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। জানিনা, বাবা কোনো দিন

বিশ্বনাথ-দর্শনে গেছলেন কি না—তবে আমি গেছলুম—কিন্তু সে একদিন। দেবতাকে প্রণাম করতে যাবো বলে যাইনি—এ কথা স্পষ্টই স্বীকার করি। এতে যদি কেউ নাস্তিক বলে ঘৃণায় নাক সিঁটকে মুখ ফেরান, তাহলে নিরুপায়! আমি কিন্তু সত্য কথা বলচি। আর বলেচি তো, কারো বিচারের প্রত্যাশী হয়ে আমি নিজের এ কাহিনী আজ বলতে বসিনি। আমি গেছলুম, মন্দির দেখতে—শুধু সেই প্রাচীনতার কথা শুনে, তা দেখবার কৌতূহল নিয়ে।

এবং এই যে কাশীতে আটকে পড়লুম—সে পরকালে স্বর্গ বা শিবত্ব-প্রাপ্তির লোভে নয়! বাবার এক বন্ধু জুটে গেলেন, ছেলে-বেলায় কবে নাকি দু'জনে এক সঙ্গে কল্‌কাতার কোন্ স্কুলে পড়েছিলেন; ভাব ছিল—আজ প্রায় চল্লিশ বছর পরে দু'জনে এই কাশীতে দেখা। তাঁরই বন্ধুত্বের খাতিরে পড়ে বাবা বললেন, নীরু মা, এখানে আর কিছুদিন থেকে যাই।

ঘুরে ঘুরে আমিও একটু শ্রান্ত হয়েছিলুম, বললুম, বেশ!

বাবার সে বন্ধুটির নাম বিশুবাবু। বিশুবাবু লোকটি ভারী অদ্ভুত ধরণের। আর্য্যামির গর্ব্বে তিনি এমনই আত্মহারা যে, পৃথিবীর অপর সমস্ত জাতকে কুকুর-বিড়ালের সামিল বলেই তিনি মনে করতেন। বাবার সঙ্গে তাঁর তর্ক চলতো। বাবা যখন সাংসারিক স্বচ্ছলতা বা নানাবিধ আধিভৌতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা পাড়তেন, তখন বিশুবাবুর তর্কে আধ্যাত্মিক আগুন এমনি তীব্র তেজে জ্বলে উঠতো যে, তাঁর দিকে বেশী এগিয়ে যাওয়া যে-কোনো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল না। কারণ বিশুবাবুর তর্কে আগুন যতখানি জ্বলতো, গালাগালের ধোঁয়া তার চেয়ে ঢের বেশী উঠতো। সে ধোঁয়ায়

তাঁর প্রতিপক্ষের চোখে জল বার করিয়ে তবে তিনি স্থির হতেন। আমি এক-আধদিন আড়াল থেকে তাঁর তর্ক-যুক্তি শুনতুম—কিন্তু কোনো দিন সে তর্কে আঘাত দিতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি। বিশুবাবুর যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করতে মন আমার অশ্রদ্ধায় ভরে উঠতো!

এই তর্কে এক-আধদিন আবার বিশুবাবুর ভাগ্নে তিনকড়ি খুব মৃদু-মন্দ ছন্দে সুর মেলাতো। তবে তিনকড়ির বয়স ছিল কাঁচা, কাজেই, আর্য্যবংশাবতংস এমন মাতুলের যুক্তিধারা সে বেচারা তেমন পরমানন্দে পান করতে পারতো না। ফলে, অনেক সময়েই ঘটতো এই যে, তর্কের গোড়ায় মাতুলকে অনুসরণ করতে গিয়ে শেষ-বরাবর তিনকড়ি বাবার যুক্তির স্রোতে ভেসে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে এসেই থই নিতো! তার সে আচরণ দেখে মাতুলের অবস্থা বাতুলের মত হয়ে উঠতো! আমি নেপথ্যে বসে এদের কাণ্ড দেখে হেসে সারা হতুম।

একদিন এই তর্কের মুখে ভাগ্নের উপর চটে মাতুল বিশ্বনাথ বলে উঠলেন, তোমার মাথায় যদি এমন-সব ম্লেচ্ছ ভাব তাল পাকাতে থাকে, তাহলে তোমায় আমার কাছে বাস করতে দেওয়া তো নিরাপদ নয়।

এই আকস্মিক রসভঙ্গে তিনকড়ি একেবারে অবাক্ হয়ে গেল। বাবা কোনোমতে গোল থামিয়ে সেদিন মাতুল-ভাগিনেয়ের সম্পর্কের বাঁধনটুকু অটুট রাখলেন।

এর পর কথায় কথায় বাবা একদিন বললেন, বুঝলি নীরু, এই বিশুটা পাগল। এদিকে তো আমাদের চাল-চলন তার পছন্দ হয় না—তবু বলে কি, জানিস,—বলে, ঐ তিনকড়ির সঙ্গে যদি তোমার মেয়েটির বিয়ে দাও তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হই! তিনকড়িরও একটা হিল্লে হয় —তাছাড়া—

আমার কাণ তুটো গরম হয়ে উঠলো। কি আশ্চর্য্য আজগুবি সাধ! স্পর্দ্ধাও কম নয়! চোখে কঠিন দৃষ্টি নিয়ে বাবার পানে চাইলুম।

বাবা আমার ভাব বুঝতে পেরে ঘাড় নেড়ে বললেন, তা হয় না। তবে এটুকু বুঝচি, তিনকড়িকে বাড়ীতে রাখতে বিশুর আর তেমন ইচ্ছে নেই। ছেলেটির লেখাপড়ার দিকে চাড় আছে—বিশু বলে, যা-হোক কোনো উপায়ে রোজগার করতে লেগে যা!

বাবা যেন বাতাসকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলে গেলেন; আমিও তাই তাতে কোনো রকম সায় বা সাড়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করলুম না।

তিনকড়ির দোষ এমন-কিছু দেখি না। লোকটি নেহাৎ মন্দ নয়! বাহিরের চেহারা প্রভৃতি ভদ্রসমাজে চলবার মত—কিন্তু বড় গরিব সে! যাক্, কাজ কি আমার মিছে তিনকড়ির কথা ভেবে!

এর পর একদিন এক মজার ঘটনা ঘটলো।

চৈত্র মাস। আকাশে সেদিন তুপুর থেকেই মেঘের একটু সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। আমি তা গ্রাহ্য না করে চিরপ্রথামত বিকেলে বেড়াতে বেরুলুম।

কাশীতে স্ত্রীজাতির মস্ত একটা স্বাধীনতা আছে—এজন্য হে তীর্থ, তোমায় নমো নমো! তোমার কল্যাণে বাঙালীর মেয়ে এখানে তবু গায়ে একটু হাওয়া লাগিয়ে তাদের নারী-জন্ম কতক সার্থক করতে পায়!

সেদিন বরাবর গঙ্গার ধার দিয়ে চলে অনেকগুলো গলিঘুঁজি পার হয়ে বেণীমাধবের ধ্বজায় এসে উঠলুম। তখন জোর বাতাস বইতে

সুরু হয়েচে। ধ্বজার উপর থেকে ওপারে রামনগরের পানে চেয়ে দেখলুম। রামনগর থেকে অসি অবধি গঙ্গার উপর দিয়ে এপার-ও-পার জুড়ে কে যেন মস্ত একটা স্বচ্ছ বালির দেওয়াল তুলে দিয়েচে! আমার হাতে একখানা রুমাল ছিল—দমকা বাতাসে সেখানা উড়ে চকিতে যে কোথায় চলে গেল, বুঝতেও পারলুম না। হু-হু করে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগলো। তখন ভাবলুম, না, বাড়ী যাই। বেণীমাধব থেকে নেমে আবার গলি ভেঙ্গে একেবারে দশাশ্বমেধের কাছে এসে পৌছুলুম। মাথার উপর আকাশ তখন বেশ কালো হয়ে উঠেচে। দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে কি-রকম একটা সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে। ঠাণ্ডা জলো হাওয়ায় ওপার থেকে অদ্ভুত রকমের একটা বুনো গন্ধ ভেসে আসচে। আমি বাড়ীর দিকে চলতে লাগলুম। পথে না আছে একখানা এক্কা, না গাড়ী! খানিক আসতে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা ঝরতে সুরু হলো! গায়ে যেন হাজার তীর ফুটছিল! আমি আরো জোরে চলতে লাগলুম। বৃষ্টির বেগও এদিকে আরো বেড়ে উঠলো। আমার গা ছম্-ছম্ করতে লাগলো। এমন সময় পিছন থেকে কে বললে, এই বৃষ্টিতে আপনি পথে বেরিয়েচেন?

পা কেমন থম্‌কে থেমে পড়লো। এই সময় আবার বিদ্যুৎ চমকে গেল। পিছনে চেয়ে দেখি, তিনকড়ি; মাথায় তার ছাতা।

কোন জবাব দিলুম না; দরকার ছিল না। তিনকড়ি বললে, এই বৃষ্টি-ঝড়ে আর এগুবেন না। ঐ টিনের ছাদটার নীচে দাঁড়াবেন, চলুন। জলের বেগ কমলে আমি আপনাকে বাড়ী পৌছে দেবো।

তবুও কোনো কথা বললুম না। তিনকড়ি ছাতাটা এগিয়ে এনে আমার মাথায় ধরলে। অমন ভীষণ মুহূর্ত্তেও আমার হাসি পেলে। কি নির্লজ্জ রূপ-যৌবন-লোলুপ পুরুষের যেচে এই সেবা দেবার প্রয়াস!

অভদ্র দাসত্ব-পনা! কেউ তো তার এ সেবা চায় না! হায়রে, এই পুরুষই আবার শাস্ত্র লিখে স্ত্রীজাতির উপর প্রভুত্ব খাটাতে চায়! জেনো তোমরা নিতান্ত দুর্ব্বল দয়ার পাত্র বলেই স্ত্রীজাতি তোমাদের এই সব পুঁথির বুলির বিরুদ্ধে কোনো দিন কোনো কথাটি কয় না—ঘাড় পেতে সমস্ত সহ্য করে যায়! একবার যদি তারা এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তাহলে তাদের চোখের একটা বক্র ইঙ্গিতে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তোমাদের ঐ বহুমূল্য শাস্ত্র আর স্বার্থ-পঙ্কিল প্রাণ!

হঠাৎ একটা খেয়াল হলো। সামনেই দেখি, এক বড় গাছের নীচে খুঁটির উপর টিনের ছাদ-দেওয়া একটুখানি ছোট্ট আস্তানা। বোধ হয়, কোন্ সন্ন্যাসী কোন্ যোগের সুযোগে ছাউনি ফেলেছিলেন—এখন তাঁর সেই পরিত্যক্ত আস্তানাটুকু ভক্তের স্বর্গে যাবার সোপান হয়ে পড়ে আছে। আমি সেই টিনের ছাদ-দেওয়া ছাউনিতে এসে দাঁড়ালুম। যতখানি পারে তিনকড়ি আমায় বৃষ্টির জল আর ঝড়ের দাপট থেকে রক্ষা করবার চেষ্টায় ছাতা ঘিরে আড়াল তুলে দাঁড়ালো। ঝড়ের তখন কি সে প্রচণ্ড বেগ—বৃষ্টিরও কি জোর! মাথার উপর টিনের ছাদ হঠাৎ এক সময় তার খুঁটির-মায়া ত্যাগ করে ভূমিসাৎ হলো। আমায় রক্ষা করতে গিয়ে তিনকড়ি তার দুই হাত তুলে টিনখানা ধরে ফেল্‌লে। তার জামা ছিঁড়ে হাত কেটে রক্ত পড়তে লাগলো—তিনকড়ি শেষে টিনের ভার রাখতে না পেরে পিছলে পড়ে গেল।

ভালো গ্রহ! তাড়াতাড়ি আমি টিনখানা সরিয়ে তিনকড়ির হাত ধরে তাকে ওঠালুম। হাতে তার বেশ জখম! রক্ত পড়চে! আমি তাড়াতাড়ি আমার বৃষ্টিতে-ভেজা আঁচল ছিঁড়ে তার হাতে বেশ করে পটি জড়িয়ে দিলুম। তিনকড়ি ধুঁকছিল।

আমি বল্লুম, আর এখানে নয়। চলুন, আমাদের বাড়ী চলুন

পথে আরো ঢের বিপদ ঘটতে পারে! দেখুন দিকি, আমার জন্য নিজেকে একেবারে এতখানি ক্ষত-বিক্ষত করে ফেললেন!

তিনকড়ি আমার পানে চাইলে—বড় করুণ সে দৃষ্টি! সে দৃষ্টির অর্থ যে না বুঝলুম, তা নয়। সে দৃষ্টি আমার মনের মধ্যে এক দুর্দ্দমনীয় বিজয়-স্পৃহা জাগিয়ে তুললে। একটু কৌতুক করবার ইচ্ছা হলো। দৃষ্টিতে করুণা মাখিয়ে তিনকড়ির পানে চেয়ে দেখলুম। একে মেঘের এই চপল লীলা, তার উপর এ কৌতুক! সে এক মারাত্মক ব্যাপার!

তিনকড়ি বোধ হয় আমার চোখে সে সময় এমন-কিছু দেখেছিল, যাতে তার সমস্ত সঙ্কোচ চট্ করে কেটে গেল। সে একেবারে বলে উঠলো, আপনার যে গায়ে এতটুকু আঁচ লাগেনি, এতেই আমি কৃতার্থ! এর জন্য আমার প্রাণটা গেলেও—তিনকড়ির কথাটা আর শেষ হলো না। আদরের প্রত্যাশায় পোষা কুকুর যেমন আকুল চোখে প্রভুর পানে চায় তেমনি দৃষ্টিতে তিনকড়ি আমার মুখের পানে চেয়ে রইলো!

আমি খুব উচ্চ হাস্য করে বললুম, বটে—কেন, বলুন দেখি!

তিনকড়ির হাতের পটিটা তখন আমি চেপে চেপে আর-একবার ভালো করে জড়িয়ে দিচ্ছিলুম। হঠাৎ সে আমার হাতখানা ধরে ফেলে বললে, আমি আপনাকে ভালোবাসি, বড় ভালোবাসি। জানি, পাবার নয়, তবু আমার মনকে কিছুতে আমি ফেরাতে পারি না।

তাড়াতাড়ি আমি হাত টেনে নিয়ে সরে এসে বললুম, বৃষ্টি একটু নরম পড়েচে। চলুন, বাড়ী যাই।

বলেই তাকে আর আর দ্বিতীয় কথাটি কবার অবকাশমাত্র না দিয়ে রাস্তায় নেমে চলতে সুরু করলুম। তিনকড়িও আমার পাছু পাছু আসতে লাগলো।

বাড়ী ফিরে চা খেয়ে গরম কাপড়-চোপড় পরে বিছানায় এসে বসলুম। ধব্‌ধব্‌ করছে নরম বিছানা! সামনের টেবিলে বাতি জ্বলছিল; সেই বাতির আলোয় হঠাৎ আমার কেমন মনে হলো, আজ আমার মত সুখী কে! আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন! এমন ঐশ্বর্য্য আমার, এমন বয়স, এমন রূপ! মানুষ এর বেশী কিছুই আর কামনা করতে পারে না। ইহলোকে মানুষের কামনা করবার মত বস্তুই বা আর কি থাকতে পারে? কিছু না। তিনকড়ির কথা মনে পড়লো। মাতুলের ভিক্ষা-অন্নে লালিত, নিতান্তই সে কৃপার পাত্র! নিজের মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই! আজ ঐ মামা বিশ্বনাথ যদি তাকে পথে বার করে দেয়—আজ—এই রাত্রে—এই ঝড়-বৃষ্টির পরে বাহিরের পথ-ঘাট যখন অত্যন্ত কদর্য্য বিশ্রী হয়ে আছে—তাহলে এই কদর্য্য পথে-ঘাটেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে!

সামনে প্রকাণ্ড আয়না ছিল—তার পানে চেয়ে দেখলুম। হেসে চেঁচিয়ে আপনাকে আপনি বলে উঠলুম, এ মূর্ত্তি দেখে কে চুপ করে থাকতে পারে! বেচারা, বেচারা তিনকড়ি!

মন যখন এমনি গর্ব্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েচে, ঠিক সেই সময় কে যেন তার চুলের মুঠি ধরে বলে উঠলো,—এই তো রূপ আর তরুণ বয়স নিয়ে বসে আছিস্—কে এলো রে তোর কুঞ্জ-দ্বারে, কে তার স্তুতিগান শোনাতে এলো! আর এই তিনকড়ি—এ মানুষ!

মন আবার চোখ রাঙিয়ে উঠলো, বললে, কি! আমি রাজার মেয়ে, আর ঐ তিনকড়ি পথের ভিখিরী! সে আমায় পূজো করতে পারে, কিন্তু—

ভাবনার আর অন্ত রইলো না। হু-হু করে যা-তা ভাবনা এসে মনটাকে তোলপাড় করে দিলে!

কিসেরই যে ছাই-পাঁশ ভাবনা! হাসি পেলে! আমি শুয়ে পড়লুম। রাত্রে ঘুমের ঘোরে কিন্তু সেই এক স্বর কানের কাছে বাজতে লাগলো, ভালোবাসি, ভালোবাসি, ওগো বড় ভালোবাসি!

সকালে উঠে মনটা প্রথম কেমন আচ্ছন্ন বোধ হলো! জোর করে চাবুক মেরে তাকে সিধে করলুম। তারপর কা'রা দু'দলে মিলে মনের মধ্যে এক বিষম লড়াই বাধিয়ে দিলে! অস্থির হয়ে বললুম, না, না, না।

বাবাকে বললুম, কলকাতা যাই চলো, বাবা, এখানে আর ভাল লাগচে না।

বাবা বললেন, কিন্তু একটা কথা আছে মা—

আমি বাবার মুখের পানে চাইলুম।

বাবা বললেন, এই তিনকড়ি বেচারা! ও আমায় বড্ড ধরেচে। লেখাপড়া শিখে ও মানুষ হতে চায়, কিন্তু অর্থপিশাচ মামা তার জন্য আর একটা কাণাকড়িও খরচ করতে রাজী নয়। সে বলে, কাশী-হেন স্থান, যাত্রী ধরে পেট চালা। তিনকড়ি তাতে রাজী নয়। সে বলে, তার মার যা গহনা-পত্র ছিল, সেগুলো দাও, তা বিক্রী করে সে লেখাপড়া শিখবে। মামা হাঁকিয়ে দেছে, বলে, গহনা আবার কি! তাই বেচারা আমায় এসে ধরেচে! কি বলিস্ মা?

আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো! আবার সেই তিন্‌কড়ি! যার জন্য মনের সঙ্গে অহরহ এই যুদ্ধ চলেছে—যার কাছ থেকে দূরে যেতে চাই, এমনি করে ভূতের মত সে সঙ্গ নেবে! না, কখনো না। কে তিনকড়ি—সে আমার কে যে তার জন্য এত মাথাব্যথা! না, সে কেউ নয়, কেউ নয়। হতভাগা, বেচারা, পথের এক সামান্য পথিক সে'

বাবা আবার বললেন, তাহ্‌লে কি বলিস্‌ মা ?

আমি বললুম, তাকে তুমি সঙ্গে রাখতে চাও না কি ?

বাবা বললেন, তুই যা বলিস্‌, তাই করি—

ইচ্ছা হ্‌লো বাবাকে বলি, আর ফ্যাসাদ জড়িয়ো না, বাবা ! কিন্তু গলাটা কে যেন চেপে ধরলে। একটা ঢোঁক গিলে বললুম, বেশ, কিন্তু আমাদের একসঙ্গে থাকা হবে না, তা বলে রাখচি। কোথাকার কে, কেমন লোক—

বাবা বললেন, লোক বোধ হয় মন্দ হবে না। ছেলে ভালো, তার মামার মত নয়। তবে হ্যাঁ, এক বাড়ীতে থাকা হয় না—কেন না, আমি আজ কোথায় থাকি, কাল কোথায় যাই, ঠিক নেই—তার চেয়ে ওকে মাসে মাসে বরং কিছু করে দেবো, ও কলকাতায় গিয়ে মেসে থেকে পড়ুক। কেমন ?

আমি বললুম, বেশ—তাহ্‌লে ওকে কালই কলকাতায় পাঠাও, আমরা এদিকে আরো ক'দিন মুঙ্গের-টুঙ্গের ঘুরে তার পর কলকাতায় যাবো'খন।

কোথায় যেন আমার বাধ্‌ছিল। গা ছমছম করছিল। তিনকড়ির সঙ্গে আর না দেখা হয় ! একটু ভয়ও হচ্ছিল। কিন্তু না, কিসের ভয় ? আমি রাজার মেয়ে—তার উপর এই রূপ, এই বয়স ! কোথাকার কে তিনকড়ি এসে কানের কাছে এক আবদারের স্থর তুলবে, আর অম্‌নি আমি—না, না, কখনো না !

তারপর সেই বছর মাঘ মাসেই আমার প্রাণে বসন্ত জেগে উঠলো। আমরা তখন কলকাতার বাড়ীতে। অজস্র ফুলের গন্ধে, পাখীর গানে আমার প্রাণটাকে ভরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত সমারোহ করে আমার হৃদয়-

রাজ্যেশ্বর একদিন সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন। মাগন্দীর রায় বাবুদের বংশ-তিলক এক তরুণ যুবার হাতে বাবা আনন্দাশ্রু-চোখে আমায় সমর্পণ করলেন। সে রাত্রির সেই আলো গান বাজনা আর ফুলের গন্ধে আমার প্রাণ-মন অসহ্য সুখের সম্ভাবনায় বিভোর হয়ে উঠলো! সেই আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত হাতের উপর হাত রেখে আমার মনে হলো, মস্ত একজন সহায় পেলুম, বন্ধু পেলুম, স্বামী, স্বামী, স্বামী! মনে মনে আমার চিরজীবনের সুখদুঃখ এই হাতেই অসীম নির্ভরে সমর্পণ করে প্রাণ আমার কৃতার্থ হলো। বিচিত্র আবেশ এক অপূর্ব্ব মায়া-কুঞ্জ আমার চোখের সামনে ধরে দিলে, প্রাণের মাঝে বহুদিনকার সাধ-আশা ফুলের মত অজস্রভাবে অপরূপ শোভায় ফুটে উঠলো!

কিন্তু হায়রে, সে কতক্ষণের জন্য!

ফুলশয্যার রাত্রে ফুলের গহনা পরে মনের মধ্যে প্রেমের মণিদীপ জ্বেলে ফুলের বাগান সাজিয়ে বসেছিলুম—এইবার আমার প্রিয়তমকে প্রাণ ভরে একান্তে দেখবার সুযোগ পাবো! অস্থির পুলকে ক্ষণে ক্ষণে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিল—এমন সময় আমার স্বামিদেবতা দেখা দিলেন। হায়, ফুলের মুকুট মাথায় দিয়ে নয়, শান্তি, আরাম, আশ্বাস-ভরা প্রেমের ডালি হাতে নিয়ে নয়—চোখ তাঁর জবাফুলের মত লাল, পা টলমল করচে, মুখে বিশ্রী গন্ধ, মদ খেয়ে মাতাল! নিমেষে যেন কোথা থেকে এক ভীষণ ঝড় উঠলো—তার দাপটে আমার প্রণের মধ্যে সে দীপের আলো নিবে গেল—অত সাধের ফুলের রাশ ছিঁড়ে কোথায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়লো! সুন্দর মায়া-কুঞ্জ চোখের পলকে শ্মশানের মত বীভৎস হয়ে উঠলো। অসহ্য জ্বালা সারা দেহ-মনটাকে একেবারে তাতিয়ে তুললে। ঘৃণায় আমি সে ফুলের গহনা ছিঁড়ে ফেললুম,

মাথাটা দপ্-দপ্ করে উঠলো। একেবারে খড়খড়ির ধারে এসে দাঁড়ালুম। খড়খড়ি বন্ধ ছিল, জোরে খুলে ফেললুম। বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কে যেন অনেকখানি জ্বালা জুড়িয়ে দিলে! দূর হতে কার বাঁশীতে সাহানার সুর ভেসে আসছিল, আকাশে একরাশ নক্ষত্র—মনে হলো, সবাই হাসচে, সবার মুখে তীব্র বিদ্রূপ! ভাবলুম, আজ যদি আমার এই তপ্ত প্রাণের তীক্ষ্ণ জ্বালায় সমস্ত আকাশ-বাতাস জ্বালিয়ে দিতে পারতুম, পৃথিবীটা পুড়ে ছাই হতো!

দেবতা এসে হঠাৎ আমার আঁচল টেনে জড়ানো গলায় ডাকলেন, প্রাণেশ্বরী—

এক ঝটকায় আঁচল টেনে নিয়ে সরে দাঁড়ালুম। মাতাল অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো—খানিক পরে বললে, বেশ বাবা!

আমার স্বামি-সম্ভাষণ এই প্রথম, এই শেষ!

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলছিল। বাড়ী এসে বাবাকে বললুম, আমি আর কোথাও যাবো না বাবা। যদি আর আমায় সেখানে পাঠাও, আমি আত্মহত্যা করবো।

বাবা আমার মুখের পানে চাইলেন। আমার মনের মধ্যে তখন এমন আগুন জ্বলছিল যে তার ঝাঁজ অবধি আমার চোখ-মুখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছিল। আমি বললুম, এক পাষণ্ড মাতাল—

কেঁদে ফেললুম। বাবারও চোখে জল এলো। তাড়াতাড়ি আমাকে বুকের মধ্যে তিনি টেনে নিলেন। বাবার মুখে একটিও কথা ফুটলো না।

তার পর আবার সেই পুরোনো জীবন-ধারায় গা ঢেলে দিলুম।

বাপে-মেয়েতে নানান্ দেশে লক্ষ্যহীন গতিতে আবার সেই ভেসে বেড়ানো !

দেবতার কাছ থেকে এত্তেলা এলো, পাঠাও।

বাবা জবাব দিলেন, না।

তাঁরা চোখ রাঙালেন, ছেলের আবার বিয়ে দেবো।

বাবা লিখলেন, তোমাদের মর্জ্জি হয় দাওগে।

তাঁরা আবার শাসালেন, আদালত আছে।

বাবা লিখলেন, কেউ পায়ে দড়ি বেঁধে রাখেনি, স্বচ্ছন্দে সেখানে যেতে পারো !

তারপর সব চুপচাপ।

কিন্তু এই নানান্ দেশে ঘুরে বেড়িয়ে, নর-নারীর এই বিপুল মেলায়— তাদের সুখের ঢেউ মাঝে মাঝে আমার মনটাকে ছুঁয়ে এক বিষম দোল দিয়ে যেত ! পাখীর গান, ফুলের গন্ধ, এ-সব তেমনি আছে—তবে আমার প্রাণে তারা আর কোন সাড়া জাগায় না ! বসন্ত তেমনি আসে, চাঁদ তেমনি আলোর ঢেউ তুলে নেচে চলে যায়, কিন্তু সব নির্জ্জীব, সব জড় ! কুয়াশায় আগাগোড়া কে যেন তাদের সে প্রাণটুকু ঢেকে দিয়েচ ! এক-একবার সেই কবেকার ঝড়ের রাত্রির কথা মনে পড়তো ! সেই বেচারা তিনকড়ি, আর তার সেই ব্যাকুল বেদনা-ভরা আবেদন ! সে যেন একটা স্বপ্ন ! মনকে চাব্‌কে বললুম, খবর্‌দার ! তোর আপন তেজে তোকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে— মাথা হেঁট করা কিছুতেই চলবে না তোর ! ভেঙ্গে যাস্ যদি, যা— কিন্তু মচকে পড়িস্ নে…

এমনি বিপুল দ্বন্দ্বে মনকে নিয়ে যখন অস্থির, তখন কোথা থেকে

বুকে বাজ পড়লো। বাবা হঠাৎ একদিন কোন্ অদৃশ্য লোকে চলে গেলেন। এ বিপুল জগতে আমি আজ একা!

জোর করে বললুম, না, কিসের ভয়! আমার অগাধ ঐশ্বর্য্য—রাজার ঐশ্বর্য্য!

দুদিন পরে আবার এক খবর এলো; আমার স্বামী-দেবতা এক গণিকার গৃহে মজলিশ করছিলেন—শেষে এক সময়ে মদের নেশায় ভালোবাসার সীমা দেখাতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ দিয়েচেন! মস্ত একখানা ভারী পাথর বুক থেকে সরে গেল। বাঃ! আমার সব বন্ধন আজ কেটে গেছে—আমি আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন, মুক্ত! চমৎকার!

শ্রান্ত মন নিয়ে বারো বৎসর নানা দেশ ঘুরে আবার একদিন বাড়ী ফিরলুম। রাজ্যেশ্বরী রাজ্য-পালনে মন দিলুম। খাতা-পত্র থেকে মহাল পর্য্যন্ত নিজে দেখে তদ্বির করতে লাগলুম। এক-এক সময় চোখের সামনে পড়তো, গরিবের সংসার, চাষার সংসার। স্বামী ক্ষেতে খেটে সারা হচ্ছে, মাথায় প্রচণ্ড সূর্য্য আগুন ছড়াচ্ছে, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই, শুধু খাটচে, খাটচে, খাটচে! তার স্ত্রী ছোট ছেলে-কাঁকালে করে থালায় ভাত বেড়ে স্বামীকে খাওয়াতে এলো। দুজনে গাছের ছায়ায় বসে ছোট্ট ছেলেটিকে একটু নাড়া-চাড়া করলে—তারপর স্ত্রী হেসে ছেলে-কোলে বাড়ী ফিরে গেল, স্বামী ক্ষেতে খাটতে লাগলো! কোথাও-বা স্বামী কাজে বেরুচ্ছে, আর তার তরুণী স্ত্রী লোক-চক্ষু বাঁচিয়ে ছাদের আড়ালে দাঁড়িয়ে ম্লান হাসি হেসে তাকে বিদায় দিচ্ছে! অনাদি কালের সংসার তার সরল ধারাতে বয়ে চলেছে।

দেখে মন আমার হু-হু করে উঠতো!

আবার এক চৈত্র মাস। আকাশে বৃষ্টি-বাতাসের ভীষণ যুদ্ধ! ঘরের জানলা বন্ধ করে বিছানায় শুয়েছিলুম—মনের মধ্যে আলো-আঁধারের খেলা চলেছিল।

বৃদ্ধ নায়েব মশায় এসে বললেন, উকিল বাবু এসেচেন।

আমি বললুম, কেন?

তিনি বললেন, বাহারগাঁয়ের প্রজারা খাজনা বন্ধ করেছিল—কাল তাদের নামে নালিশ রুজু না করলে সব তামাদি হয়ে যাবে। তাই আর্জী তৈরি করে আপনাকে তা বুঝিয়ে আপনার সই নিতে নিজেই তিনি এসেচেন!

আমি বললুম, তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।

নায়েব দ্বিরুক্তি না করে চলে গেলেন।

উকিল আমাদের সেই তিনকড়ি। বাবার কৃপার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার সে করেছিল। আজ পাঁচ বৎসর উকিল হয়ে আমাদের এষ্টেটের সমস্ত কাজ-কর্ম্ম সে-ই দেখচে।

উঠে একটা ইজি চেয়ারে আমি বসলুম। উকিল তিনকড়ি ঘরে এসে দাঁড়ালো। নিষ্ফলতার তীব্র রোষে মন আমার মুহূর্ত্তের জন্য জ্বলে উঠলো। তার পর হাসি-মুখে সহজ স্বরেই বললুম, কি চাই?

অত্যন্ত বিনীত স্বরে তিনকড়ি বললে, এই আর্জীগুলো এনেচি—পড়ে সই করতে হবে।

আমি বললুম, পড়—

তিনকড়ি পড়তে লাগলো। আমার কাণে তার কিছু গেল না। শুধু জাগছিল এক বিষম ঝড়ের হু-হু গর্জ্জন! আর তারি ফাঁকে-ফাঁকে ভেসে আসছিল অত্যন্ত কোমল স্বরে এক করুণ আবেদন, ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি, আমি ভালোবাসি!

কলের মতই কতকগুলো সই করলুম। নায়েব মশায় আর্জীগুলো হাতে নিয়ে বললেন,—আমি তাহলে তপসীলগুলো ঠিক করে রাখিগে।

নায়েব মশায় চলে গেলেন।

তিনকড়িও চ'লে যাচ্ছিল ; আমি বললুম,—দাঁড়াও।

তিনকড়ি দাঁড়ালো। ঘরে আর কেউ নেই, শুধু তিনকড়ি আর আমি। বুক আমার দুড়্-দুড়্ করে উঠলো। আমি বললুম,—আর কোনো কথা নেই তোমার ?

—না।

—নিজের···কোনো কথা নয় ?

তিনকড়ি চুপ করে রইলো।

আমি বললুম,—এই রাত্রে নিজে তুমি কষ্ট করে এসেচো! এই জল-ঝড়— কোনো কথা নেই ?··· একটা নিশ্বাস কিছুতেই চেপে রাখতে পারলুম না।

তিনকড়ি তখনও দাঁড়িয়ে, নির্ব্বাক্,—মুখ তার মাটীর পানে!

খুব সাবধানে ছোট একটা নিশ্বাস চেপে আমি বললুম, বাড়ীর সব খবর ভালো ? বৌ ভালো আছে ?

—হ্যাঁ।

—যাও।

তিনকড়ি চলে গেল। এই সেই তিনকড়ি! একটা কদর্য্য মাংস-পিণ্ড—বিয়ে করে পরম সুখে নিশ্চিন্ত মনে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করচে!

আর আমি ? শুধু সেই কবেকার এক ঝড়কে বুকের মধ্যে পুষে রেখেচি!

হারে হতভাগিনী, আজ কোথায় তোর সে তেজ, সে গর্ব্ব! বাতিটা নিবিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে বিছানায় শুয়ে পড়লুম। চোখের জল আর কোনোমতেই চেপে রাখতে পারলুম না।

বাড়ীর দোর-জানলাগুলোকে কাঁপিয়ে বাহিরে উদ্দাম ঝড় হা-হা করে গর্জ্জে ফিরতে লাগলো।

মুস্কিল আসান

কলিকাতায় দাঙ্গার হাঙ্গামা তখন কমিয়াছে। কমিলেও গায়ের ছম্‌ছমানি ভাব সম্পূর্ণ কাটে নাই। সন্ধ্যার পর মুসলমান-পাড়ার পথ এখনো কেহ মাড়াইতে চায় না! নির্জ্জন পথে দৈবাৎ কোনো দফ্‌তরী কিম্বা কোচম্যান-সহিস দেখিলেও চমক লাগে! গেঁড়াতলা, না, সুঁদরবন!

আমাদের মেশ্‌ হ্যারিসন রোডে। সন্ধ্যার পর মেশের ঘরে দাঙ্গার গল্প চলিয়াছে—এমন সময় কোথা হইতে আনন্দ আসিয়া হাজির। তার মুখে-চোখে উদ্বেগের ভাব। কহিলাম,—ব্যাপার কি হে? এ সময় এখানে?

বুঝি, কোনো গুণ্ডায় তাড়া করিয়াছে! না হইলে আনন্দ থাকে দর্জীপাড়ায়, হঠাৎ…

আনন্দ কহিল,—তোমার সঙ্গে গোপনে একটা কথা আছে…

গোপনীয় কথা! কহিলাম,—এসো আমার ঘরে। কোনো গুণ্ডায় তাড়া করেনি তো…? শরীরে শিহরণ জাগিল; আবার কহিলাম,—দেখো।

আনন্দ কহিল,—না।

আমার ঘরে আসিয়া কহিলাম,—চায়ের ফরমাশ করবো?

আনন্দ কহিল,—করো। যোদ্দা চায়ের জন্য খুব উৎসুক নই। তবে যখন বলচো…ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম, কেটলিতে দু' পেয়ালার মত জল গরম করে আন্‌। ভৃত্য চলিয়া গেল।

আনন্দকে কহিলাম,—কি কথা হে ?

আনন্দ পকেট হইতে একখানা খামে-মোড়া চিঠি বাহির করিয়া কহিল,—এইটে আগে পড়ো, তারপর সব বলচি···

খাম হইতে পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলাম,—

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

মহেশমুণ্ডা

সোমবার

কল্যাণীয়েষু

তোমার পত্র পাঠ করিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আচার-ব্যবহার বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য সহস্র উপদেশ দিয়া তোমায় কলিকাতায় পাঠাইয়াছি, বিদ্যাশিক্ষার জন্য। পাশ করিয়া তোমায় চাকুরিও করিতে হইবে না, ইহা তুমি জানো। তোমায় কলিকাতায় পাঠাইতে আমার বিস্তর আপত্তি ছিল; তার কারণ, কলিকাতায় উচ্ছৃঙ্খলতার সীমা নাই। পান-ভোজন, আচার-ব্যবহারে নিষ্ঠার একান্ত অভাব এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই হিন্দু-সমাজ ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। তুমি জানো আমাদের বংশে আজ পর্য্যন্ত বরফ বা বিলাতী জল চলে নাই। তুমি আমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়াছ যে, তুমি ঐ সকল অনার্য্য পান-ভোজন হইতে সর্ব্বথা বিরত থাকিয়া এ বংশের নাম রক্ষা করিবে। সেবার হারাধনের মুখে এ সংবাদও পাইয়াছিলাম, যে, তুমি মস্তকের শিখা ছেদন করিয়াছ ! তোমায় তখনই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম,—এরূপ অনাচার ঘটিলে তোমায় অচিরে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে। তুমিও বলিয়াছিলে, এরূপ অনাচার আর ঘটিতে দিবে না। এখন এ পত্রে যে সমস্ত কথা জানাইয়াছ, তাহাতে তোমার মূঢ়তাই শুধু প্রকাশ পায় নাই; আমার

পুত্র হইয়া এরূপ কল্পনাকে মনে স্থান দেওয়াকে আমি পিতৃদ্রোহিতা নামে অভিহিত করি। আমার সনাতন ধর্ম্ম, সনাতন সমাজ, সনাতন আচার ব্যবহার হইতে একতিল ভ্রষ্ট হইলে আমার সঙ্গেও সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইবে, জানিয়ো।

কোন্ রায় সাহেবের কন্যা দাঙ্গার সময় তোমার প্রাণ বাঁচাইয়াছেন,—এজন্য বহুপ্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায়। তাই বলিয়া তাঁকে বিবাহ—এত বড় বাতুলতার পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা তোমার কি করিয়া হইল, ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি! তুমি লিখিয়াছ, তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানী নন, হিন্দু; ব্রাহ্মণ। তবে মেয়েটি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী—অর্থাৎ স্বাধীন জেনানা! স্ত্রীলোকে চাকুরি করে! তা তাঁরা যাই হৌন্, তাঁদের আচার ব্যবহার কখনই আমাদের সনাতন আদর্শানুযায়ী নয়। যখন তাঁহাদের সঙ্গে পানভোজন চলিতে পারে না, তখন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন তো দূরের কথা! ও সব আকাশকুসুম রচনার আশা ত্যাগ কর এবং এ বৎসর পরিশ্রম করিয়া শেষ পরীক্ষায় পাশ দিয়া গৃহে ফিরিয়া আইস। রায় সাহেবদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখিবে না।

ইহার পরেও যদি শুনি, তাঁহাদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছ, তাহা হইলে তোমাকে ত্যজ্যপুত্র করিব। আমার বিষয়ের উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে এবং মাসহারাও বন্ধ করিব। তাহা হইলে স্বোপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়ো। বড় হইয়াছ, লেখাপড়া শিখিয়াছ, বুদ্ধিও জন্মিয়াছে; অতএব বুঝিয়া কার্য্য করিবে।

ইতি

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীমথুরামোহন চক্রবর্ত্তী

চিঠিখানি পড়িয়া আনন্দর পানে চাহিলাম। আনন্দ হতাশভাবে আমার পানেই চাহিয়া ছিল, কহিল,—পড়লে?

আমি কহিলাম,—ব্যাপার কি?…লভ্?

আনন্দ কহিল,—তাই। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

কহিলাম,—কৈ, এর বিন্দুবিসর্গও তো জানি না—শুনিনি কিছু!

আনন্দ কহিল,—কোথেকে শুনবে! এই দাঙ্গার মরশুমেই এর যা-কিছু ঘটেচে।

আমি কহিলাম,—বাঃ!‥ স্তব্ধভাবে আনন্দর পানে চাহিয়া রহিলাম।

আনন্দ কহিল,—সমস্ত কথা তোমায় বলচি। তোমার মাথায় বুদ্ধি খেলে,—শুনে উপায় নির্দ্ধারণ করো, ভাই। আমি তো নিরুপায়! মোদ্দা, যামিনীকে না পেলে আমার জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে।…আবার উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে যামিনীকে গ্রহণ,—তার মানে, দারুণ দারিদ্র্য আর দুশ্চিন্তার মধ্যে তাকে এনে পিষে মারা—সে-ও ঠিক হবে না।

আমি কহিলাম,—শুধু লভ্ নয়! Love with every good sense তাহলে!‥ বেশ, এখন সব বুঝিয়ে বলো দিকিন্…দাঙ্গার সময় কি বিপদে পড়লে, আর এঁরা তা থেকে তোমায় উদ্ধারই বা করলেন কি রকম করে! কিছুই তো জানি না…

আনন্দ কহিল,—কি করে জানবে! তারপর থেকে আমিও তো তোমাদের সঙ্গে দেখা করিনি।…অর্থাৎ আমি সেদিন বীডন্-রো ধরে উত্তরমুখো চলেছিলুম—বেলা তখন তিনটে কি চারটে…ঐখানে এক মসজিদ আছে। তার সামনে কি একটা গোলযোগ চলছিল—মধ্যস্থতা করতে গেলুম…হঠাৎ দুটো ষণ্ডা মুসলমান গুণ্ডা আমায় তাড়া করে।

একজনের হাতে ছিল ছোরা ·আমি দৌড়ে পালাই,—তারা পাছু নেয়·· কোথায় যে আশ্রয় নেবো, তার ঠিক ছিল না। কেননা, ওপাড়ায় সকলের বাড়ীর দরজা তখন বন্ধ—দু'একটা পানের দোকান, খাবারের দোকান, তারা হাঁ-হাঁ শব্দে দোকান বন্ধ করে ফেললে, ঢুকতে দিলে না! ছুটতে ছুটতে আমি এসে একটা দোতলা, বাড়ীর দরজা খোলা পেয়ে তারি মধ্যে ঢুকে পড়লুম···সেটা এক গার্ল-স্কুল—মেয়েরা স্কুলে নেই। বোধ হয় ছুটি হয়ে গেছে। আমি ঢুকে পড়ে একেবারে তার অফিস-কামরায়···এক বেটা গুণ্ডাও সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়েছিল। চৌকাঠে হোঁচোট্‌ খেয়ে আমি তো পড়ে গেলুম। তখন হঠাৎ এই যামিনী রায় সেই গুণ্ডার সামনে এসে দাঁড়ালেন—আর দাঁড়িয়ে সে কি heroic ভঙ্গীতে তাকে আদেশ করলেন—যাও! গুণ্ডা সুড়সুড় করে চলে গেল! আমায় তিনি আশ্রয় দিলেন। আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালুম, তারপর আলাপও ক্রমে নিবিড় হলো। এই যামিনী রায় হলেন সেই গার্ল-স্কুলের হেড মিষ্ট্রেশ্‌—বি-এ অবধি পড়েচেন।

আমি কহিলাম,—অবিবাহিতা?

আনন্দ কহিল,—হাঁ। তাঁর মা আছেন, আর কেউ নেই। স্কুলের দোতলায় এক কামরায় মা ও মেয়ে থাকেন···তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েচে খুব—ব্রাহ্মণ···এবং এই ঘনিষ্ঠতা থেকে বুঝচি যে যামিনী দেবীকে পেলেই আমার জীবন সার্থক হবে। নাহলে··

আনন্দর মুখের কথা লুফিয়া লইয়া আমি কহিলাম,—শূন্য, বিরাট শূন্য···কিন্তু তাঁর কথাও বিচার করতে হবে তো! তিনি বালিকা নন্‌, তায় বি-এ অবধি পড়েচেন...

আনন্দ কহিল,—তাঁরো খুব ইচ্ছা·· অর্থাৎ এ বিবাহে তাঁদের আগ্রহও আমার আগ্রহের চেয়ে এক তিল কম নয়।

আমি কহিলাম,—কিন্তু হেড্ মিষ্ট্রেশ···অর্থাৎ তাঁর antecedents? মানে, আমাদের সমাজে মেয়েদের চাকরি করা যখন চলে না···

আনন্দ কহিল,—কেন চলবে না? কারো বাড়ী রাঁধুনিগিরি করা চলতে পারে, আর লেখাপড়া শিখে কারো গলগ্রহ হয়ে না থেকে ভদ্রভাবে পয়সা রোজগার করাই দোষের! আনন্দ চটিয়া উঠিল; কহিল,—এঁদের বংশও বেশ সম্ভ্রান্ত জেনো। যামিনী দেবীর বাবা ছিলেন এক মার্চেণ্ট অফিসের একাউন্টেণ্ট—হিন্দু, ব্রাহ্ম নন,—তবে খুব নব্য প্রকৃতির। অবরোধ-প্রথা মোটে মানতেন না; স্ত্রীকে নিয়ে মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন; সস্ত্রীক ট্রামে চড়তেন এবং মেয়েটিকে বেথুনে পাঠিয়েছিলেন। মেয়েটি থার্ড-ইয়ারে পড়বার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। সঞ্চয় কিছু ছিল না, কাজেই আত্মীয়-কুটুম্বের ঘৃণায়-দেওয়া অন্ন ভিক্ষা না করে মেয়ে যামিনী দেবী ঐ ভগবতী গার্ল-স্কুলে চাকরী নেন্। মাসে পঁচাশি টাকা মাহিনা পান, তাছাড়া ফ্রী-কোয়ার্টার্স আর বিনা বেতনে একজন দাসী। রূপে-গুণে যামিনী দেবীর তুলনা নেই। তাকে যে পত্নীত্বে বরণ করবে, সে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি।

আমি কহিলাম,—ব্যাপার তো বুঝলুম···এ যে বেশ একটি ছোটখাট উপন্যাসের প্লট···এ অবধি বেশ! তবে উপসংহারটুকুকে মিলনান্ত করে তোলবার কোনো সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে না···

আনন্দ কহিল,—কেন?

আমি কহিলাম,—তোমার বাবার এই পত্র লগুড়ের মত সে উদ্যত মিলনের মাঝে থেকে বিঘ্নের সৃষ্টি করচে।

আনন্দ কহিল,—তাই তো তোমার কাছে এসেচি,—তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি খেলে···তার উপর তুমি গল্প লেখো···ধরো, এটা একটা

উপন্যাসেরই প্লট, বাস্তব ঘটনা নয়,—একে মিলনান্ত করবে কি-ভাবে, ভেবে ঠিক করো···তাহলেই···

হাসিয়া আমি কহিলাম,—কিন্তু মুস্কিল হয়েচে এই যে, গল্পর বাপেরা রক্ত মাংসের জীব নন্, কলমের ইঙ্গিতে তাঁদের যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে ফেরানো যায়! আর এখানে···? অর্থাৎ তুমি প্রেমে পড়ে বেকুবি করেচো·· তোমার বাবার মত অমন সেকেলে মতের মানুষ; আর বিশেষ আচার-নিষ্ঠার দিকে তাঁর এত বেশী টান যে, ছেলের সুখ-দুঃখ সে আচার-নিষ্ঠার কাছে কিছু নয় ভাবেন···

আনন্দ হতাশভাবে কহিল,—বাবার ধারণা, আমাদের দেশটা সেই পলাশীর যুদ্ধের সময় যে ভাবে চলছিল, সেইভাবেই তার চিরদিন চলা উচিত।

তাই-ই। আমি তো জানি, আনন্দর পিতা মথুরামোহন বাবু কতখানি সনাতন-পন্থী। পাবনা অঞ্চলে তাঁর মস্ত জমিদারী; স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতে এই পাঁচ-সাত বৎসর তিনি জগদীশপুরের কাছে মহেশমুণ্ডায় বাড়ী তৈয়ার করিয়া সেইখানে বাস করিতেছেন। পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে ক্বচিৎ কখনো দেশে যান। দেশে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না, মহেশমুণ্ডার জলে কি নাকি সব উপকরণ আছে···সে জল পান করিলে শরীর ভালো থাকে। কলিকাতা তাঁর মতে নরকের তুল্য! এখানে অনাচার, পাপ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে। বিলাতী আব-হাওয়ার স্পর্শ পাছে গায়ে লাগে, এই আশঙ্কায় তিনি ট্রেণে থার্ড ক্লাশ কামরা রিজার্ভ করিয়া ভ্রমণ করেন,—এ্যালোপ্যাথি ঔষধ প্রাণান্তে সেবন করেন না, তাহাতে মদ আছে। মাথায় দীর্ঘ শিখা রাখিয়া, পূজাহ্নিক করিয়া—এই সবের সাহায্যে কোনে মতে এই ভ্রষ্টাচারের যুগে তিনি হিন্দুয়ানী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আনন্দ প্রথম যখন

কলিকাতায় আসে, তখন তার মা বাঁচিয়াছিলেন। বি এ পাশ করিলে কি হইবে, আনন্দর মাথায় টিকি আছে এবং সে হাঁসের ডিম খায় না। বরফ ও লিমনেড যা খায়, তা খুব গোপনে। এই পিতার পুত্র হইয়া আনন্দ কি করিয়া প্রেমে পড়িবার দুরাশা মনে স্থান দিল, আশ্চর্য্য! তার চেয়ে আরো আশ্চর্য্য, এ সম্বন্ধে বাপকে সে পত্র লিখিল কি বলিয়া! ...আচারের দাম যাঁর কাছে স্নেহ-মমতার চেয়েও ঢের বেশী, তাঁর পক্ষে আচার-পালনের জন্য একমাত্র পুত্রকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করা কিছুমাত্র অসম্ভব নয়!...বিরক্ত হইলাম।

আনন্দ কহিল,—তুমি তো জানো, বাংলা মাসিক-পত্রের ছোট গল্প আমি কি ভয়ঙ্কর আগ্রহে পড়ি। এখনকার নব্য লেখকদের লেখায় যে রোমান্সের আবহাওয়া ছুটে চলে তার পরশ পেয়ে আমি এ পৃথিবীর ধূলোমাটি র কথা ভুলে যাই! এই সব গল্পে তরুণ-তরুণীর মধ্যে মিলনের কি আগ্রহ, কি ব্যাকুলতা, অথচ বাধা-বন্ধও কেমন শিথিল! পড়ে আমার কেবলি মনে হয়, আমার ভাগ্যে এমন রোমান্স ঘটবে না...

চোখে একরাশ বিস্ময় ভরিয়া আনন্দর পানে চাহিলাম। আনন্দ কহিল,—যামিনী দেবীর সঙ্গে একদিন এ বিষয়ে কথা হচ্ছিল। তিনিও বললেন,—এই সব গল্প পড়ে জীবন-সংগ্রামের দুঃখ-নৈরাশ্য কোনোমতে তিনি ভুলে থাকেন। অর্থাৎ তাঁরো এই রোমান্সের দিকে খুব অনুরাগ...

বাধা দিয়া আমি কহিলাম,—তোমার বাবার এ বিবাহে আপত্তির প্রধান কারণ...?

আনন্দ কহিল —যে যামিনী দেবী কলেজে পড়েচেন, এবং চাকরি করেন...

আমি কহিলাম—এ ছাড়া আর কোনো কারণ থাকা সম্ভব? মানে, তিনি কি রকম মেয়ে চান তোমার বিবাহের জন্য?

আনন্দ কহিল.—এক অতি-সেকেলে ঘরের মেয়ে—লেখাপড়া জানবে না, তার বয়স হবে দশ বছর কি এগারো বছর! নেহাৎ পুঁচ্‌কে! সুদীর্ঘ ঘোমটায় সারাক্ষণ মুখ ঢেকে থাকবে. চন্দ্র-সূর্য্য মুখ দেখতে না পায়,—এবং কলের মত দিবারাত্র কাজকর্ম্ম করে বেড়াবে···

আমি কহিলাম,—এঃ, একেবারে অচল! তাছাড়া এ রকম ঘর, আর এ রকম মেয়ে কি বাংলা দেশে এখন মিলবে?

আনন্দ কহিল,—বহুৎ মিলবে।·· এই ভয়েই এম এ পড়ার অছিলায় কলকাতায় পড়ে আছি—মহেশমুণ্ডার 'সিনারি' খাসা, তবু সেদিকে যাই না···

আমি কহিলাম,—বহুৎ আচ্ছা!

বন্ধুকে আশ্বাস দিয়া কহিলাম,—কল্পনার সাহায্যে বাস্তবকে একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক্—অর্থাৎ এই যে সব গল্প লেখা হয়, বাস্তবের সঙ্গে এর কোনোখান্‌টা খাপ খায় কি না।

আনন্দ কহিল,—খাপ কেন খাবে না!—বাস্তব থেকেই তো কল্পনা, আবার কল্পনা থেকেই বাস্তব।

আমি কহিলাম,—A vicious circle···তা যাক্—

সন্ধানে জানিলাম, মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহেশমুণ্ডাতেই বাস করিতেছেন। মহেশমুণ্ডায় যাইতে হইলে পঞ্জাব মেলে মধুপুর; তারপর মধুপুর-গিরিডি লাইনে জগদীশপুরের পর মহেশমুণ্ডা। মথুরামোহন বাবুর সুকঠিন চরিত্র-দুর্গের কোনোখানে ঈষৎ ভঙ্গুরতা আছে কি না, তারো সন্ধান লইলাম। অতঃপর একটা অভিসন্ধি স্থির করিয়া একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে কয়েকটা প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র

পুরিয়া ও একটা বিছানার মোট লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে যাত্রা করিলাম। বার্থ রিজার্ভ করা ছিল,—ট্রেণে কাজেই আরামের কোনো ব্যাঘাত ঘটিল না।

রাত্রি একটায় মধুপুর। ডাউন মেল ও-দিককার প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া ফুঁশিতেছিল। ষ্টেশনে আমাদের ট্রেণ থামিলে নামিয়া গিরিডি লাইনের গাড়ীতে উঠিয়া বেঞ্চে বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলাম। ভোর পাঁচটায় এ ট্রেণ ছাড়িবে। চার ঘণ্টা ঘুম মন্দ হইবে না! কামরায় আমি একা। শুইতে ভালো লাগিল না। উঠিয়া বসিলাম। প্লাটফর্ম্মের দিকে তাকাইয়া চারিধারে দেখিতেছিলাম। সাইডিংয়ে রক্ষিত কালো কালো গাড়ীগুলা অন্ধকারকে আরো গাঢ় আরো ঘন করিয়া তুলিয়াছে,—মাঝে মাঝে লাল আর সবুজ আলোর রশ্মি! সেগুলা যেন কোনো প্রাণীর চোখ জ্বলিতেছে! ষ্টেশনগুলা আমার ভারী ভালো লাগে, বিশেষ রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে ঐ লাল, সবুজ আলোর রশ্মিগুলা···ওগুলা যেন শূন্য মনে কল্পনার দুই একটা ক্ষীণ দীপ্তি-রেখা!··· ভাবিতেছিলাম, এতদূর তো আসিলাম,—আর ক' ঘণ্টা পরেই মহেশ মুণ্ডায় মথুরামোহন চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। ভালো কথা, আসিবার সময় ওল্ড ক্লাব হইতে চাণক্যর শিখা-সমেত কৃত্রিম পরচুলাটাও আনিয়াছিলাম, তাছাড়া একজোড়া তালতলার চটি এবং একশুট গরদের ধুতি ও নামাবলী। গরদটা ওল্ড ক্লাবের সম্পত্তি, চটি জোড়া নিজস্ব। এগুলা ব্যাগের মধ্যেই সংরক্ষিত ছিল।

হঠাৎ প্লাটফর্ম্মে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন এক তরুণী··· রূপে যেন জ্যোৎস্না ঝরিতেছে! তরুণী বাঙালী, ব্রাহ্ম ধরণে শাড়ী পরা, হাতে একটি ছোট ব্যাগ; পিছনে কুলির মাথায় ছোট একটি ষ্টীল ট্রাঙ্ক।

স্বপ্ন ? চোখ দুইটাকে রগড়াইয়া সাফ্ করিলাম। ঘুমের ঘোর ছিল না! ভালো করিয়া চাহিয়া দেখি, না, স্বপ্ন নয়! তরুণী কল্পনার অশরীরী মূর্ত্তিও নন্!·· তিনি বাস্তব জীব। বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহারি পানে চাহিয়া আছি···তিনি আমায় প্রশ্ন করিলেন,—এইটেই গিরিডির ট্রেণ ?

আমি কহিলাম,—হাঁ।

তরুণী কহিলেন,—ভোর পাঁচটায় মধুপুর ছাড়বে ?

আমি কহিলাম,—হাঁ।

তিনি অগ্রসর হইয়া গেলেন,—আমি সেই গতি-চঞ্চলা বিদ্যুল্লতার পানে চাহিয়া রহিলাম, মুগ্ধ নয়নে···

তরুণী তখনি ফিরিলেন, কহিলেন,—একখানি মাত্র সেকেণ্ড ক্লাশ কামরা, দেখচি···তা, এই চার ঘণ্টা একলা থাকা···ভাবনা হয়েছিল! আপনি বুঝি গিরিডি যাচ্ছেন এই ট্রেণে ?

বীণার তারে সাতটা স্বর যেন অতি অবলীলায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল! আমি কহিলাম, না—গিরিডি যাবো না। আমি যাবো মহেশমুণ্ডা!

তরুণী চমকিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—মহেশমুণ্ডা! আপনি তাহলে মথুরাবাবুর ওখানে যাচ্ছেন ?·· কলকাতা থেকে আসচেন কি ?

আমি কহিলাম,—হাঁ···

চকিতে একটা কথা বিদ্যুতের মতই আমার মনে ফুটিল। কহিলাম,—আপনি কি···

তরুণী কহিল,—শ্রীমতী যামিনী রায়। আপনিই আনন্দ বাবুর···?

আমি কহিলাম,—বন্ধু। বলিয়া তরুণীকে সসম্ভ্রমে কামরায় আহ্বান

করিলাম। তরুণী উঠিয়া বসিলে আমি কহিলাম,—কিন্তু আনন্দ তো এ কথা আমায় বলেনি যে আপনিও…

যামিনী দেবী কহিলেন,—হঠাৎ স্থির হলো…

আমি কহিলাম,—আপনি কি মহেশমুণ্ডায় মথুরাবাবুর ওখানেই গিয়ে উঠবেন?

যামিনী দেবী কহিলেন, না আমি গিরিডি যাচ্চি,—আমার এক মাসতুতো ভাই সেখানে থাকেন। তাঁর বাসা খালি আছে। সেখানে গিয়ে উঠবো। তারপর যেমন স্থির হয়…

কহিলাম,—বুঝেচি। ভালোই হলো…

যামিনী দেবী সামনের বেঞ্চে বসিলেন। কুলি লগেজ নামাইয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল। আমি তাঁকে লক্ষ্য করিতেছিলাম। যামিনী দেবী সুন্দরী…খুব সুন্দরী…ইহার জন্য আনন্দ যে অতখানি ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে—তার রুচির তারিফ করিতে হয়! কিন্তু সে অতি গর্দ্দভ! এই রূপ! এ রূপের জন্য রাজ্য ও রাজার সিংহাসন ত্যাগ করা যায়, পাবনা অঞ্চলের জমিদারী তো অতি তুচ্ছ, ছার! এঁকে দেখিয়া, এঁর ভালোবাসা পাইয়া আনন্দ বাপের সম্পত্তির কথা ভুলিতে পারে নাই? রাস্কেল! ইনি পাশে থাকিলে সাহারা মরুভূমিতেও স্বর্গ রচনা করা যায়! আমি হইলে…কিন্তু না, ছি…সে-কথা মনে আনা উচিত নয়! বন্ধুর প্রণয়িনী…বান্ধবী! তবে এ শুধু কল্পনার কথা একটা তুলনা মাত্র!

আমি কহিলাম,—আপনি একাই আসচেন?

যামিনী দেবী কহিলেন,—হাঁ।

—আনন্দ?

যামিনী দেবী কহিলেন, আনন্দর এক মাসিমা আছেন, তাঁর স্বামী ডায়মণ্ড-হারবারের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। হাকিম হইলে কি হয়,

এদিকে যেমন তিনি খুব নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, কোর্টে মুড়ি ও ডাবের জল খাইয়া টিফিন করেন, ওদিকে তাঁর স্ত্রী তেমনি বিদুষী, মনটি মমতায় ভরা, মাসিক পত্রে তাঁর দু চারখানি উপন্যাসও ছাপা হইয়াছে—আর এই মাসিটির কথা মথুরামোহন বাবু বড় ঠেলিতে পারেন না! তাঁকে ধরিয়া যদি এ বিষয়ে কিছু বিহিত করিতে পারেন…

একটু দুষ্টামি করিবার অভিপ্রায়ে প্রশ্ন করিলাম,—কোন্ বিষয়ে?

যামিনী দেবী মুখখানি নত করিলেন। লজ্জা? বি-এ পড়া তরুণীও তাহা হইলে বিবাহের নামে লজ্জা পান্! জ্ঞানলাভ হইল। ভবিষ্যতে কোনো গল্পে এ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিব। যামিনী দেবী সলজ্জভাবে কহিলেন,—বিবাহের…

আমি কহিলাম—ওঃ! তা আপনি হঠাৎ এ যুদ্ধযাত্রায় বেরুলেন যে…

মৃদু হাসিয়া যামিনী দেবী কহিলেন,—ঠিক তা নয়। তবে, ছদ্ম পরিচয়ে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবো·· আমি বি-এ পড়েচি স্ত্রীলোক হয়ে, আর চাকরি করি—এইটেই মস্ত বাধা,, না?

গাড়ীর সামনে ফিরিওয়ালা হাঁকিল,—পুরী, মিঠাই। এত রাত্রেও মানুষ অনাহারে আছে না কি? আশ্চর্য্য নয়! ট্রেণে চড়িলে কাহারো ক্ষুধা বিষম বাড়িয়া ওঠে! আমার কিন্তু পিপাসা বোধ হইতেছিল। তাকে ডাকিয়া কহিলাম,—পানিপাঁড়েকে ডাকিয়া দিতে পারো বাপু…?

·· জী! বলিয়া সে হাঁকিল—এ পানিপাঁড়ে…

যামিনী দেবীকে প্রশ্ন করিলাম,—জল খাবেন? চা? কেল্‌নার থেকে ভালো চা? মথুরাবাবুর বাড়ী যাচ্ছি বলে ষ্টেশনের হিন্দু চা ফরমাশ করবো না।

যামিনী দেবী কহিলেন,—না। কিছুই চাই না।

পানিপাঁড়ে আসিল। তাকে বলিলাম,—কিছু বরফ লইয়া আয়। সে বরফ আনিতে ছুটিল।

যামিনী দেবীকে প্রশ্ন করিলাম,—আপনি···মানে, অর্থাৎ এই প্রেম জিনিষটাকে বিশ্বাস করেন? মানে, উপন্যাসের প্রেম?

যামিনী দেবী আমার পানে সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমি কহিলাম,—তামাসা করচি না, এটা মস্ত সমস্যা—তাই প্রশ্ন করচি। আনন্দ বিশ্বাস করে। আপনি···?

যামিনী দেবী কহিলেন,—গল্প পড়ে একটা সংশয় জাগতো বটে, কিন্তু··তাঁর কণ্ঠস্বর বাধিয়া গেল।

কহিলাম,—বুঝেচি। এখন বিশ্বাস করেন!

যামিনী দেবী কহিলেন.—আপনি করেন না?··কিন্তু আপনি তো গল্প লেখেন ···

কহিলাম,—তা লিখি। কল্পনায় অনেক জিনিষ আসে। তবে বাস্তবের সঙ্গে তার কতখানি মেলে, এইটে বরাবরই সমস্যা হয়ে কাঁটার মত মনে খচ্‌খচ্‌ করে। যদিও আমার লেখা গল্পের বহু তারিফ পেয়েচি··অবশ্য, বন্ধুদের কাছে।

জল আসিল। বরফও সঙ্গে-সঙ্গে। ব্যাগ হইতে ছোট এলুমিনিয়মের গ্লাশ বাহির করিয়া গ্রহণ করিলাম। পানান্তে আরাম বোধ করিয়া যামিনী দেবীকে কহিলাম,—আপনি এই চার ঘণ্টা জেগে বসে থাকবেন? সে তো ঠিক হবে না। শুয়ে নিদ্রা দিন্‌। চোরের ভয় করবেন না। আমি প্রহরীর মত জেগে বসে থাকবো'খন।

যামিনী দেবী কহিলেন,—সে কি হয়!

আমি কহিলাম,—কেন হবে না? মানে, ট্রেণে আমার ঘুম হয় না,—তাই হুইলারের বুকষ্টল থেকে, এই দেখুন না, একখানা ছ'পেনি

ডিটেক্‌টিভ-নভেল কিনে এনেচি। এ বস্তুর সঙ্গে পরিচয় খুবই কম,— আর সে পরিচয় এই ট্রেণেই আমার ঘটে আসচে চিরকাল।...

বেলা ঠিক ছ'টায় ট্রেণ আসিয়া থামিল মহেশমুণ্ডা ষ্টেশনে। বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়া লাইন চলিয়াছে। বাঁ দিকে ছোট পাহাড়— সামনে গিরিডির উঁচু পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া। যামিনী দেবীকে অভিবাদন করিয়া নামিয়া পড়িলাম। তাঁর চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। যাঁরা বলেন, পাশ করিলে নারীর মন কঠিন হয়, তাঁরা মূঢ়! বেচারা তাঁরা তো যামিনী দেবীকে দেখেন নাই! তরুণী করুণাময়ী। মনে মনে আনন্দর ভাগ্যের প্রশংসা করিলাম। যামিনী দেবী কহিলেন,— আমি শীগ্‌গিরই আসবো'খন। ভালো কথা, আমার ঠিকানা, রতন ভিলা, গিরিডি। সুবিধামত বেড়াতে আসবেন...

আমি কহিলাম,—আসবো।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। ষ্টেশন-মাষ্টার বাঙালী। তাঁর কাছে সন্ধান লইয়া জানিলাম, ডান দিকে প্রায় আধ ক্রোশ পার হইলেই একটা মস্ত পুকুর দেখিব; সেই পুকুরের কাছেই প্রাসাদের তুল্য একটি মাস্ত অট্টালিকা—সেই অট্টালিকায় মথুরাবাবু বাস করেন।

ষ্টেশন পার হইতেই অনিবিড় জঙ্গল। খানিকটা আসিয়া চারিদিকে তাকাইলাম, কেহ নাই। তখন ব্যাগ খুলিয়া চাণক্যর শিখা-সমেত পরচুলা বাহির করিয়া মাথায় আঁটিলাম। আয়না বাহির করিয়া দেখি, চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। নাকের পাশে দুই-একটা কালির রেখা টানিয়া প্রবীণ সাজিলাম। তারপর তালতলার চটি ও গরদ পরিয়া মথুরামোহন বাবুর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

...মস্ত পুকুর—খুব উঁচু পাড়। পাড়ের পরেই প্রাসাদ। প্রাসাদ-সংলগ্ন

মন্দির—চূড়া দূর হইতে দেখা যায়। গৃহের ফটকে আসিয়া দেখি, ফটকের সাম্‌নে সাদা পাথরের গায়ে কালো হরফে লেখা, আশ্রম। বায়োস্কোপে স্কট্‌ল্যাণ্ডের প্রাচীন প্রাসাদের বহু ছবি দেখিয়াছি। এ আশ্রমের পাশে সেগুলাকে অতি তুচ্ছ মনে হইল।

ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।…সাম্‌নে বাগান। অজস্র ফুল ফুটিয়া আছে। বেশীর ভাগই দেশী ফুল। বাগানের পর কয়টা সিঁড়ি। তার পরেই ফ্লোরের উপর মস্ত দোতলা বাড়ী। বাড়ীর বহির্ভাগটুকুর গড়ন মন্দিরের অনুরূপ। পিছনে ছোট ছোট পাহাড়ের 'ব্যাক্‌-গ্রাউণ্ড'—তার কোলে এই মন্দিরের মত চূড়াবিশিষ্ট গৃহ—যেন একখানি ছবি! সামনের বারান্দায় একটা কাঠের বেঞ্চে এক ভৃত্য পড়িয়া ঘুমাইতেছিল,—তাকে ডাকিয়া তুলিলাম। সে উঠিতে গৃহস্বামীর সন্ধান করিলাম। ভৃত্য কহিল,—বাবু উঠিয়াছেন; তবে প্রাতঃকৃত্য, আহ্নিক, জপ প্রভৃতি সারিয়া বেলা আটটায় নীচে নামিবেন, তারপর বেড়াইতে যাইবেন; একটু বেড়াইয়া দশটায় গৃহে ফিরিবেন, ইত্যাদি।

আটটা—তার মানে, এখনো প্রায় দুই ঘণ্টা! ভৃত্যকে কহিলাম,—আমার স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দাও। ভৃত্য তখনি আদেশ-পালনে উদ্যত হইল।

এমন চমৎকার চাকর দেখা যায় না! বড়লোকের বাড়ীর চাকরদের সঙ্গে কিছু পরিচয় যে নাই, এমন নয়! কোনো ফরমাশ করিলে তাদের তা গ্রাহ্য করানো কতখানি কঠিন—কিন্তু মথুরাবাবুর ভৃত্য… না, সনাতন আচার-পালনে সুবিধা আছে বিলক্ষণ!

কূয়ার ধারে স্নান সারিয়া আবার সেই মেক্‌-আপ্‌ সারিয়া লইলাম। তারপর সন্ধ্যাহ্নিক! ধপধপে সাদা উপবীত, মাথায় দীর্ঘ শিখা—এ অবস্থায় মথুরাবাবুর গৃহে সন্ধ্যাহ্নিক না করিলে যে বিপদে পড়িব!

ভৃত্যটা কি ভাবিবে? মন্ত্র মনে নাই—কোশাকুশি নাড়িয়া যা-তা করিয়া খানিকটা সময় কাটাইয়া দিলাম। তারপর চা···ভৃত্যকে গরম জল আনিয়া দিতে বলিলাম। জলের পর সনাতন পাথর বাটীও আসিল; এবং কোনোমতে বিশুদ্ধ হিন্দু-মতে চা তৈয়ার করিয়া পান করিলাম। ভৃত্যকেও ভাগ দিলাম। সে চা পান করিয়া মহা খুসী হইল—কহিল,—এ কি, বাবু?

আমি কহিলাম,—প্রসাদী চরণামৃত!

ভৃত্য কহিল,—খাসা!

ভাবিলাম, সনাতন আশ্রমই বটে! ভৃত্যটা চায়ের স্বাদ জানে না! এ যেন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙালীর কথা!

মথুরাবাবু যথাসময়ে নীচে নামিলে পরিচয় দিলাম,—অধ্যাপক বলিয়া। নাম শ্রীচাণক্য শাস্ত্রী। আরো বলিলাম, আমি সনাতন হিন্দু সমাজে আচারের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রকাণ্ড বহি লিখিতেছি এবং সেই বহির মধ্যে নিষ্ঠাবান্ বাঙালী হিন্দু মাত্রেরই মতামত লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল ধাক্কায় আমাদের সনাতন আচার-নিষ্ঠা কি ভীষণভাবে পিষ্ট ও দলিত হইতে চলিয়াছে—এই বলিয়া কথা শেষ করিলাম।

মথুরাবাবু মহা খুসী হইলেন, কহিলেন,—একটা কাজের মত কাজ করচেন।

আমি তখন ইংরাজী শিক্ষা হইতে সুরু করিয়া বুট্ জুতা পায়ে দেওয়া, বিলাতী ঔষধ সেবন ইত্যাদির অশেষবিধ অপকারিতার উল্লেখ করিলাম। মথুরাবাবু কহিলেন,—এই যে আমায় দেখুন না, এমনি অম্বলের ব্যথা ধরে! আমার এই পাঁজরার নীচে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড বেদনা বোধ করি, প্রাণ সংশয় হয়—তার উপর অগ্নিমান্দ্য,

অজীর্ণতা—এ-সবের উৎপাতও খুব আছে। অনেকে বলেন, বিলাতী চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। আমার পুত্র আনন্দ অনেক অনুনয় করেচে, শুনিনি। আমি ঐ কবিরাজী ঔষধই ব্যবহার করি। রোগের উৎপাত কমে না, তবু আমি যাতনা সয়েও বিলাতী ঔষধ, বিলাতী ডাক্তারীর ব্যবস্থা পালন করি না! তুচ্ছ শরীরের জন্য কি শেষে আচার-ভ্রষ্ট হবো!

আমি কহিলাম,—ঠিক তো। শরীরং জন্মজন্মনি, কিন্তু আচার তো তা নয়।…তা আপনার ব্যাধি কি ঐ?

মথুরাবাবু কহিলেন,—হাঁ। সেই জন্যই দেশ ছেড়ে এখানে থাকা। মহেশমুণ্ডার জল ভালো…সকলেই বলে,—তাই…

আমি কহিলাম,—আপনার উপকার হয়েচে?

মথুরাবাবু কহিলেন,—না হোক্, আচার তো অক্ষুণ্ণ রাখতে পারচি…

পরের দিন দুপুর বেলায় শ্রীমতী যামিনী দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে তখন হিন্দু সমাজের আচার-নিষ্ঠা সম্বন্ধে আমার আলোচনা খুব জমিয়া উঠিয়াছে। যামিনী দেবীর মূর্ত্তি শুষ্ক, বেশভূষায় কোনো পারিপাট্য নাই। তিনি অত্যন্ত বিচলিতভাবে কহিলেন, তিনি গিরিডিতে বাস করিতেছিলেন,—সেখানে তাঁর বাংলায় ডাকাত পড়িয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। একটি মাত্র ভাই—সেই অবধি নিরুদ্দেশ। নিরাশ্রয় হইয়া কোথায় যাইবেন? তাই গিরিডিতেই পাঁচজনের কাছে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচয় পাইয়া আশ্রয়ের জন্য তিনি আসিয়াছেন। হিন্দুর মেয়ে আশ্রয়-প্রার্থিনী! নারী—বয়সটা অত্যন্ত ভয়-সঙ্কুল, কাজেই…অর্থাৎ যামিনী দেবী কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিলেন,—হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে!

আমি অত্যন্ত বিচলিত ভাব দেখাইয়া কহিলাম,—আহা! যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী-রূপে বরাভয় আর আশা নিয়ে এই আশ্রমে উদয় হলেন!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় মনোনিবেশ-সহকারে যামিনী দেবীর আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিতেছিলেন,—শাড়ী বাঙালী মেয়ের মত সাধারণ-ভাবে পরা হইলেও পায়ের নাগরা জুতা-জোড়ার পানেই তাঁর নজর! আমি বুঝিলাম, ঐখানটাতেই তাঁর বাধিতেছে! নহিলে এমন রূপ লইয়া যদি কেহ আশ্রয় চায়,...

কহিলাম,—পায়ে জুতা দেওয়া তো হিন্দুর প্রথা নয়, লক্ষ্মী...

যামিনী দেবী কহিলেন,—আমাদের বাড়ী এই প্রথা চলে আসচে। পশ্চিমেই বরাবর থাকি কি না। এটা রাজপুতানার সতী পদ্মিনী দেবীর আদর্শে। আপনারা রাণা অমরসিংহের গ্রন্থাগারে পদ্মিনী দেবীর যে ছবি আছে, তা দেখেননি?

আমি কহিলাম,—ঠিক! দেখেচি বটে! রাজপুত আদর্শ ঠিকই!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিস্ময়ে নির্ব্বাক্! আমি কহিলাম,—তা, ঠিক জায়গায় এসেচো লক্ষ্মী। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মত নিষ্ঠাবান হিন্দু আমি তো বঙ্গদেশে দেখিনি... শরণাগতকে রক্ষা করার জন্য রাজা শিবির মতই...

যামিনী দেবী রহিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হইল। যামিনী দেবীর পায়ে জুতা ছিল না। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন মন্দিরে আরতির আয়োজন দেখিতে গিয়াছেন।

আমি কহিলাম,—ওঁর জন্য আপনি বার্লি তৈয়ার করুন। ওঁর কাল রাত্রে কলিক হয়েছিল...অম্বলের ব্যাধি, বার্লিতে উপকার হবে। বার্লি জানলে উনি অবশ্য খাবেন না—কারণ, বিলাতী টিনে প্যাক হয়ে

আসে। আমার কাছে টিনও আছে। বার্লি আর তার সঙ্গে বাই-কার্ব্বনেট অফ সোডা…আনন্দর কাছে ওঁর অসুখের কথা শুনেছিলুম…আপনি ওঁর কাছে কথা পাড়বেন,—কি কথা—শিখিয়ে দেবো। ওঁর মনখানি আপনাকে দখল করতে হবে। এবং দখল করা শক্ত হবে না—বিশেষ যখন সেবার জন্য নারী-হস্তের এখানে একান্ত অভাব।

যামিনী দেবী কহিলেন,—উনি আমায় বলেচেন নাগরা খুলে ফেলতে।

আমি কহিলাম,—ও, তাই খালি পা!

যামিনী দেবী কহিলেন,—হাঁ।

পরামর্শ হইয়া গেল।

রাত্রে ঠাকুরের অরাতির সময় যামিনী দেবী শুদ্ধাচারে মন্দিরে গিয়া শাঁক বাজাইলেন,—আরতির পর বহুক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন; তারপর মথুরামোহনকে কহিলেন,—কাল থেকে আমায় পূজার পুষ্পপাত্র সাজাবার ভার দিন্ বাবা!

বাবা! চক্রবর্ত্তী চক্ষু মুদিলেন। কার কথা বুঝি মনে পড়িতেছিল! পিতৃ-হৃদয়ের ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা!…

যামিনী দেবীর পানে চাহিলাম। যামিনী দেবী কহিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, কুমারী!

আমি কহিলাম,—শাস্ত্রে ষোড়শী কুমারীকেই পূজা-আয়াজনের যোগ্য অধিকারিণী বলেচে! কথাটা বলিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পানে চাহিলাম।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় খুসী হইলেন, কহিলেন,—বেশ।

মন্দির হইতে ফিরিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কক্ষে বসিয়া ছিলাম। যামিনী দেবী গীতা পড়িতেছিলেন। বহিখানি তিনি সঙ্গে

আনিয়াছিলেন—নিশ্চয় এ আনন্দর পরামর্শ! সুকণ্ঠে গীতার সংস্কৃত শ্লোক—আমার মত পাষণ্ডও মুগ্ধ হইয়া উঠিল। শ্লোকের শক্তিতে, কি পাঠিকার স্বরের মাধুর্য্যে, ঠিক বলিতে পারি না।

তাকিয়ায় ঠেশ দিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় হঠাৎ শুইয়া পড়িলেন। যামিনী দেবী বহি বন্ধ করিয়া কহিলেন,—আপনার শরীর অসুস্থ দেখচি···

অমোঘ বাণ! চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—সেই বেদনাটা···

যামিনী দেবীর পানে চাহিলাম। যামিনী দেবী কহিলেন,—যেন হাজার ছুঁচ ফুটেচে—না?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—ঠিক তাই।

যামিনী দেবী কহিলেন,—আমি জানি, আমার বাবারও ঐ অসুখ ছিল। অনেক চিকিৎসা হয়; সারেনি। শেষে হরিদ্বার থেকে এক সন্ন্যাসী আসেন···উদ্দেশে যামিনী দেবী কাহাকে প্রণাম করিলেন! তারপর কহিলেন,—তিনি এক ঔষধ দেন, সাদা গুঁড়ো, ময়দার মত। লছমনঝোলায় কি একরকম বদরী ফল আছে তার আঁটি, আর সেই গাছের ছাল চূর্ণ করে তৈরী। সেই চূর্ণটা জলে ভাল রকম সিদ্ধ করে তাতে মিছরীর গুঁড়ো আর লেবুর রস দিয়ে রোজ রাত্রে খাওয়া—মাসখানেক খেয়ে তিনি আরাম হন·· তারপর বরাবর ঐ ঔষধ তিনি খেতেন। কখনো আর এ রোগ হয় নি! ··

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—সে সন্ন্যাসীকে কোথাই বা পাওয়া যাবে, মা?

যামিনী দেবী কহিলেন,—সন্ন্যাসীকে না পাই, চূর্ণ পাওয়া যাবে।

চক্রবর্ত্তী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। যামিনী দেবী কহিলেন,—সে চূর্ণ আমার কাছে আছে। বলেন তো···

আমি কহিলাম,—নিশ্চয়! এর আর বলাবলি কি! আপনি তাহলে তৈরী করে দিন্, লক্ষ্মী…হিন্দু ঔষধ তো? অনাচারের কিছুই নাই তো…?

যামিনী দেবী কহিলেন,—না।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—বেশ, দাও মা…আমায় বাবা বলেচো, মেয়ের কাজ করো…

যামিনী দেবী উঠিয়া গেলেন; এবং ঘণ্টাখানেক পরে পাথর বাটীতে তরল পানীয় আনিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আনিয়া দিলেন, পানের জন্য।

ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিলাম, কি? সেই বার্লি আর সোডা?

চোখ টিপিয়া যামিনী দেবী জানাইলেন, হাঁ।

বার্লি পান করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটা উদ্গার তুলিলেন; একটু আরাম পাইয়া কহিলেন,—আঃ!

আমি কহিলাম,—ভাগ্যে আপনার কাছে এ চূর্ণ ছিল!

পরের দিন সকালে উঠিয়া দেখি, যামিনী দেবী একটা সাজি হাতে লইয়া বাগানের গাছে ফুল তুলিতেছেন। আমি কহিলাম,—বাঃ!

তারপর…চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সন্ধ্যাহ্নিক সারা হইলে যামিনী দেবী পাথরের গ্লাসে মিছরীর সরবৎ ও রেকাবী-সাজানো ফল সামনে ধরিয়া দিলেন। বৃদ্ধ বয়সে এই সেবাটুকু… না পাইলে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে প্রাণ একেবারে তাতিয়া ওঠে! আর পাইলে…কৃপণ বুড়াও বোধ হয় উইল লিখিয়া বিষয় দান করিয়া যাইতে পারে!

আমাদের তূণ হইতে এটি দ্বিতীয় তীর—চক্রবর্ত্তীর হৃদয়ে

বেশ বিঁধিয়া বসিল! দু'রাত্রি বালি ও সোডা সেবন করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় সত্যই আরাম পাইলেন। পাইবার কথাই। চিকিৎসা-শাস্ত্রেও তাই বলে! কলিকটা অম্বলের। সোডা ও বার্লি তার অমোঘ ঔষধ—এ কথা আমি জানিতাম। দুই-একটা এমন কেশ ভাগ্যে দেখিয়াছিলাম! এখন আনন্দর অদৃষ্ট!

সেদিন ঠাকুরের পূজায় এমন একটা কি ছিল, যা দেখিয়া আমার মত নাস্তিকও অভিভূত হইল। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তো কথাই নাই! তিনি কহিলেন,—আজ আমার শ্যামসুন্দর যেন হাসচেন···কি গভীর তৃপ্তি ওঁর মুখে!

বিগ্রহের নাম শ্যামসুন্দর। ফুলের গন্ধে মন্দির ভরপুর। শ্যাম-সুন্দরের কণ্ঠে প্রকাণ্ড সুন্দর পুষ্পমাল্য—শ্রীরাধার কণ্ঠেও গন্ধমাল্য। আমি কহিলাম,—লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং পূজার পুষ্পপাত্র সাজিয়েচেন।

দুপুরবেলায় আচার-নিষ্ঠা সম্বন্ধে আবার আলোচনা চলিয়াছিল। আমি কহিলাম,—স্ত্রীলোকের পায়ে নাগরা থাকলে হিন্দুত্ব কি চিড় খায়? না। যেহেতু নাগরা সনাতন কালের; হিল-উঁচু জুতায় হিন্দুত্বের পা পিছ্‌লানো বরং সম্ভব; কিন্তু যে নাগরা সতী-কুলরাণী পদ্মিনী দেবী পায়ে দিতেন···তবে দেশাচার···

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—ঐ দেশাচার! নাহলে আমার মা-লক্ষ্মীকে পুত্রবধূ করতাম! কুমারী···তবে কিশোরী···

আমি কহিলাম,—তাতে শাস্ত্রে বাধে না। শাস্ত্র বলেচেন,—

ভাগ্যহীনে গৃহে যত্র শ্বশ্রূমাতা ন রাজতি
তৎগৃহে শোভতে লক্ষ্মী চার্ব্বঙ্গী তরুণী বধূ।

অর্থাৎ, যে গৃহে শাশুড়ী নাই, সে গৃহে চার্ব্বঙ্গী, কি না, সুন্দরী তরুণী বধূ লক্ষ্মীশ্রীতে শোভা পান্। তবে···? তাছাড়া শাস্ত্রীয় নজীর

—দ্রৌপদী, দময়ন্তী···স্বয়ং সাবিত্রী দেবীও তরুণী কুমারী ছিলেন এবং একটু বেশী বয়সেই তাঁদের বিবাহ হয়! বাল্যবিবাহ মুসলমান আমলের; সুতরাং ম্লেচ্ছ প্রথা।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন,—বটে! তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস·· সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল,—সমস্যা!

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিতরূপেই বিরাট্ আশার সূচনা জাগাইতেছিল। কিন্তু এক বিভ্রাট ঘটিল।

সন্ধ্যার পর আরতি সারা হইলে আমি বাগানে ঘুরিতেছিলাম। পূর্ণিমা রাত্রি। চাঁদের জ্যোৎস্না জলে-স্থলে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছিল। মন্দিরের পিছনে একরাশ হাশ্‌নাহানা ফুটিয়া গন্ধে চারিদিক মশ্‌গুল করিয়া তুলিয়াছে। গাছগুলার পাশে একটা পাথরে বাঁধানো বেদী···বেদীর উপর গিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এই জ্যোৎস্নার রূপালি পর্দ্দা ভেদ করিয়া একটা গল্পের প্লট যদি সংগ্রহ করিতে পারি··· হঠাৎ অদূরে বাড়ীর শুভ্র মহিমা চোখে পড়িয়া গেল। যামিনী দেবীর কথা মনে হইল। আনন্দকে গর্দ্দভ বলিয়াছিলাম! কিন্তু না, তার বুদ্ধি আছে! বিবেচনারও সীমা নাই! যামিনী দেবীকে যদি গৃহলক্ষ্মী করার ভাগ্য কারো হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে এ গৃহটিকেও প্রয়োজন —নহিলে জীবনকে ঠিক উপভোগ করা চলে না! এ গৃহে লক্ষ্মীর আসনে বসিবে কোথাকার কে অনঙ্গমঞ্জরী···ধেৎ!

চারিদিকের দৃশ্যে এমন আকুলতা···বাতাসেও তেমনি চঞ্চলতা! রবিবাবু কি কোনো কালে এমনি জ্যোৎস্না রাত্রে এ বেদীতে বসিয়া কবির চোখে চারিদিকে চাহিয়াছিলেন···? নহিলে এ গান লিখিলেন কি করিয়া···?

এ কি আকুলতা ভুবনে ! এ কি চঞ্চলতা পবনে !
এ কি মধুর মদির রসরাশি…

বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। চাঁদের জ্যোৎস্না, ফুলের গন্ধ, মত্ত হাওয়া যেন আমার কানের কাছে কেবলি হাঁকিতেছিল,—চলো, চলো…

আমার মাথার পরচুলার শিখাটাকে আকাশ-বাতাস ঠিক চিনিয়াছিল, আরো চিনিয়াছিল আমার যৌবনকে·· বুকের মধ্য দিয়া চব্বিশ বৎসরের যে যৌবন উছল স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে !

উঠিয়া অগ্রসর হইলাম। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বাগানে ফুলের রাশি জড়ো করিয়া ফুটাইয়াছেন ! চারিদিককার সবুজ শোভা আর এই ফুলের গন্ধ·· এ কি আচার-নিষ্ঠার কঠিন পাথরে কেহ রুখিয়া রাখিতে পারে !

সামনেই আতার কুঞ্জ ! তার পাশে ও কি ? কণ্ঠ-কাকলী ! পাখীর ? না·· তাই তো, এ যে যামিনী দেবী !·· আর পাশে · রাস্কেল আনন্দ ! কোথায় ডায়মণ্ড-হারবার, আর কোথায় এই মহেশমুণ্ডা ! সূক্ষ্ম শরীর·· ? না। এ যে স্থূল শরীরেই আনন্দ বিরাজ করিতেছে !.
·· হাতে হাত, কণ্ঠস্বরে আবেশ, চোখের দৃষ্টিতে আকুলতা…আকাশে চাঁদ হাসিতেছিল। · যদি চিত্রকর হইতাম, একটা ছবি আঁকিতাম ! যামিনী দেবীর মুখে-চোখে যে লজ্জা আর হর্ষের বিচিত্র মিকশ্চার—ছবিতে তা আঁকিবার মত ! ··

আনন্দ বলিতেছিল—ডায়মণ্ড-হারবার যাবো বলে বেরিয়েছিলুম ·· আমার ট্যাক্সি রাজাবাজারের মোড়ে এলে দেখি, একটা মস্ত ভিড় জমেচে। ট্যাক্সির ড্রাইভারটা ভয় পেয়ে এগুতে চাইলে না। তাকে বললুম, চল্ তবে হাওড়া ষ্টেশন। এলো। সেখান থেকে গিরিডি গেছলুম, গিরিডি থেকে এখানে…

একটা শব্দ ! মালীর গরুর একটা বাছুর হইয়াছে—গো-মাতার

অতি-চঞ্চল বৎস···এই রাত্রেও বুঝি, তার চাঞ্চল্যের সীমা নাই! জ্যোৎস্না দেখিয়া বেচারী গো বৎসও ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে! পরক্ষণেই দেখি, না, যে শুভ্র কেশগুচ্ছকে গো-বৎসের পুচ্ছ ভাবিতেছিলাম, সে তো পুচ্ছ নয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিখা! সর্ব্বনাশ! শিখা-সমেত চক্রচর্ত্তী মহাশয় দৃশ্যমধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন এবং প্রণয়িযুগল তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবে শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—এ উত্তম, রাত্রে এক তরুণীর সঙ্গে নির্জ্জন বনে এই বিশ্রম্ভালাপ···

আমার পায়ে হোঁচট লাগিল। বোধ হয়, পথ না দেখিয়া নুড়ির উপর পা দিয়াছিলাম!·· চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মুখে হঠাৎ নাটকের ভাষা শুনিয়া আমার বাহ্যজ্ঞান মুহূর্ত্তের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল!···

চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিলেন,—এর কি জবাব আছে?

আনন্দ! বেকুব আনাড়ি আনন্দ···একেবারে আমাদের জমাট উপন্যাস ফাঁসাইয়া বাপের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল,—বাবা, এঁর কথাই লিখেছিলুম আপনাকে। ইনিই সেই রায়-সাহেবের কন্যা, শ্রীমতী যামিনী দেবী ··

এত বয়সে বুড়ার চোখেও আগুন জ্বলে! ও কিসের আগুন? আচার-নিষ্ঠার! তাই। হায়রে, এই আগুনেই তরুণ প্রাণ দগ্ধ হয়··· রাজ্যের স্নেহ-মায়া-মমতা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যামিনী দেবীর পানে চাহিলেন, কহিলেন,—তোমার গিরিডির কথা তাহলে মিথ্যা···? এ সব ষড়যন্ত্র! পরামর্শ করে আমায় ভোলাতে এসেচো···!

শুভ্র-বসনা যামিনী দেবী! চাঁদের শুভ্র জ্যোৎস্না সর্ব্বাঙ্গে ঝরিয়া পড়িয়াছে···নির্ব্বাক্ নত মুখে দাঁড়াইয়া···আমার মনে হইল,—ধন্য

শিল্পী! অপূর্ব্ব তার শক্তি! কি দিয়া যে সে এই শ্বেত-পাথরের প্রতিমাখানিকে গড়িয়াছে!

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন,—আমার এত যত্নের শ্যামসুন্দর·· তার পর চুপ করিলেন। শ্যামসুন্দরের কথাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন··· কিন্তু কি কথা? পুষ্পমাল্যে আজ তাঁর কি শ্রীই ফুটিয়াছে,—তাই? না, শ্যামসুন্দরের জাতি-পাতের আশঙ্কা?···

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—আমার সামনে থেকে চলে যাও, আনন্দ! যেখানে খুশী···ছলনার প্রশ্রয় দেওয়া পাপ। আর তুমি···চক্রবর্ত্তী যামিনী দেবীর পানে চাহিলেন। চাহিবামাত্র তাঁর চোখের দৃষ্টিতে সে আগুনের তেজ যেন মিলাইয়া আসিল! তিনি কহিলেন,—তোমায় মা বলেচি···আমার বুকে স্নেহও ফুটিয়ে তুলেছিলে অনেকখানি··· অনেকখানি মায়া···শ্যামসুন্দরকে ছাপিয়ে সে মায়া গাঢ় হয়ে উঠেছিল! ···পাপ? বোধ হয়, তাই·· যাক্—তুমি নারী, তায় কুমারী—আশ্রয় দিছি! গৃহেই থাকো, যতদিন খুশী···তবে শ্যামসুন্দরের পূজার পুষ্প-পাত্রে কাল আর হাত দিয়ো না।

নাঃ···মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডি! আমার মাথা দপ্ দপ্ করিতেছিল। বেকুব আনন্দ! কত করিয়া প্লটটাকে গড়িয়া কমেডির পুষ্প-পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলাম, আর এমন অলক্ষিতে আমায় লুকাইয়া··· হাড় অবধি জ্বলিয়া উঠিল! বেকুব, বেকুব, বেকুব! এখন এর কর্ম্মফল ভোগ করো!···

রাত্রে আবার আচার-নিষ্ঠার কথা উঠিল। ফন্দী-ফিকির খুব দূষণীয়···তবে মানুষের মনে সে একটা ক্ষণিক উচ্ছ্বাস মাত্র···চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—কিন্তু এ উচ্ছ্বাস যে প্রাণের শিকড়কে গ্রাস করে···

নাঃ, উপায় নাই !···

সে-রাত্রে হরিদ্বারের বদরী-চূর্ণের তরল পানীয় আনিয়া কেহ চক্রবর্ত্তীর মুখে ধরিল না ! পানীয় প্রস্তুত ছিল ··যামিনী দেবী সেজন্য অধীরও হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি একান্তে পরামর্শ দিয়াছিলাম,—না, থাক্ !

সেজন্য চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বোধ হয় কেমন একটু অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। হঠাৎ তিনি কহিলেন,—রায়-সাহেব কথাটার কি অর্থ হতে পারে ?···

আমি কহিলাম,—সাহেব কথাটা বিলাত থেকে আসেনি··· মুসলমান যখন ভারতে আসে, তখন সাহেবকে তারাই সঙ্গে আনে। এবং সাহেব ভয়ঙ্কর ব্যাপারও নয়—শব্দের টঙ্কার মাত্র !

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—কিন্তু শব্দই ব্যোম !···

তাঁর কথা লুফিয়া লইয়া আমি কহিলাম,—আর ব্যোম কি ? না, মায়া·· শূন্য·· অর্থাৎ চক্রবর্ত্তীও যেন এই শূন্যটাকেই খুঁজিতেছিলেন ! সাহেব শূন্যে মিশাইলে রায়কে লইয়া কোনো কথা উঠিল না !—ভাবিলাম, এটা সুরাহা···সঙ্গে সঙ্গে রাগ ধরিল আনন্দর উপর ! লক্ষ্মী-ছাড়াটা যদি ডায়মণ্ড-হারবারেই থাকিত, তাহা হইলে ঐ চাঁদের জ্যোৎস্নায় বেদীর উপরই গড়াইয়া রাত্রি কাটাইতাম !···বেইমান !··· মন বলিল, না। এ প্রণয়ের অসহ্য আকুলতা···অদর্শনে প্রাণ তার ব্যাকুল হইয়াছিল···সাহিত্যে এর রাশি রাশি নজীর আছে !···

সে-রাত্রির মত আলোচনা চাপা রহিল। প্রত্যূষে চক্রবর্ত্তী ডাকিয়া পাঠাইলেন, কহিলেন,—ভালো ঘুম হয়নি কাল রাত্রে···সেই বেদনাটা···

আমি কহিলাম,—শ্যামসুন্দরের পূজার কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি তো ?

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—ঠিক! মাধব ভৃত্যের ডাক পড়িল। সে আসিলে আদেশ হইল,—মাকে ডেকে আন্ ·

যামিনী দেবী আসিলেন। তাঁর দুই চোখ ফুলিয়া তার দিব্য শ্রীটুকুকে ঢাকিয়া দিবার চেষ্টা পাইয়াছে বিলক্ষণ, তবু সে চোখ··· ফুলের গন্ধ কি কালো পর্দ্দায় ঢাকা পড়ে: ··

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—কাল তোমার সেই বদরী-চূর্ণ দাওনি তো মা!—শরীর কেমন বেজুৎ বোধ হচ্ছে···সেই বেদনাটা···

যামিনী দেবী কহিলেন,—আপনার পাছে কোনো অপমান হয়, এই ভয়ে···

আমি কহিলাম,—বদরী·চূর্ণে মান-অপমান তো নাই, লক্ষ্মী! তবে আজ সকালে শ্যামসুন্দরের পূজার পুষ্প সংগ্রহ করতে যাওনি যে!

যামিনী দেবী চক্রবর্ত্তীর পানে একবার চাহিলেন, বাষ্পার্দ্র স্বরে কহিলেন,—বাবার নিষেধ···

নিষেধ! আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম! কহিলাম,—কাল আরতির সময় অমন প্রীতির উচ্ছ্বাস দেখেচি বিগ্রহের মুখে ·· ঠিক! সেই জন্যই শ্যামসুন্দর কুপিত হয়েচেন! এ তো উচিত হয়নি চক্রবর্ত্তী মশায়!···

চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার পানে চাহিলেন, চোখে খুব অপ্রতিভ দৃষ্টি! তার পর যামিনী দেবীর পানে চাহিয়া কহিলেন,—যাও মা, সে নিষেধ প্রত্যাহার করলুম···পূজার পুষ্পপাত্র সাজাও গে···

যামিনী দেবী চলিয়া যাইতেছিলেন—চক্রবর্ত্তী মহাশয় ডাকিলেন, —মা

যামিনী দেবী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—আর সেই বদরী-চূর্ণটা···

আমি কহিলাম,—শ্যামসুন্দরের ইচ্ছা !...

যামিনী দেবী চলিয়া গেলেন।...

আমি কহিলাম,—যে কথা কাল রাত্রে হচ্ছিল · আচার-নিষ্ঠা !—এটা হলো বসন-ভূষণ...ভিতরের মানুষের সঙ্গে এ-সবের সম্পর্ক অল্পই। শ্যামসুন্দরের অঙ্গে যে বস্ত্রালঙ্কার চাপিয়েচেন, তা খুলে নিন্—তাতে কি শ্যামসুন্দরের মর্য্যাদা কম্‌বে ?...

চক্রবর্ত্তী কি ভাবিতেছিলেন, কহিলেন,—না।

আমি কহিলাম,—হিন্দুত্বও নাগরা জুতার মধ্যে নয়; হিন্দুত্ব মনে। যদি মনে খট্‌কা লাগে, বেশ, নাগরা পরা নিষেধ করে দিন্। তবে তাতে...এ পাহাড় দেশ...পায়ে চোট্ লাগতে পারে, আর সে চোট্ থেকে ক্ষত হওয়ারই সম্ভাবনা। এবং ক্ষত শরীরে পূজার আয়োজন করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ...

চক্রবর্ত্তী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন,—সমস্যা !...

আমি কহিলাম,—এ সমস্যার মীমাংসাও আছে। শাস্ত্রে বলেচে, বাসাংসি জীর্ণানি অর্থাৎ আচার-নিষ্ঠার বাস জীর্ণ হয়ে গেছে ! হবেই তো—কতকালের পুরাতন বাস !...এই জন্যই তো শাস্ত্রে বলেচে, বিগ্রহের বাস বদলে তাঁকে নব কলেবর ধারণ করাতে হয় !...তারপর ধরুন, এই লক্ষ্মীর কথা...নাগরা পায়ে দিয়ে এখানে এসেছিলেন, এখন আর পায়ে দেন না। যখন পায়ে দিতেন, তখন যে খাঁটি মানুষটি ওঁর মধ্যে ছিলেন, এখনো তিনি আছেন। কাজেই, দেখচেন—মানুষের অন্তরই আসল। নাগরা কিম্বা ঘাগ্‌রা, আর ঐ শাড়ী সাধারণভাবে পরা কি ঘুরিয়ে পরা.. এগুলো অতি-তুচ্ছ ব্যাপার। খাঁটী মানুষকে ও-সব স্পর্শও করতে পারে না। এই শ্যামসুন্দরকে কালো

কাপড়ই পরান, আর রাঙা কাপড়ই পরান, শ্যামসুন্দর শ্যামসুন্দরই থাকবেন!

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—ঠিক! তাহলে যা ভাবছিলাম, অর্থাৎ সেই শাস্ত্র-বাক্যটা কি? ...চার্ব্বঙ্গী শ্বশ্রূমাতা...

কহিলাম,—শ্বশ্রূমাতা চার্ব্বঙ্গী নন্। হতে পারেন না। চার্ব্বঙ্গী বধূ...আর এই বধূই লক্ষ্মীরিয়ং অমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ...

যেন অকূলে কূল পাইয়াছেন, এমনি ভাবে চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—আর ঐ বদরী-চূর্ণ.. ও না হলে শরীরও তো রক্ষা করা যাবে না! তাহলে আনন্দকে ডাকাই..?

আনন্দকে পাওয়া গেল না!...নিশ্চয় শ্যামসুন্দরের রোষ!

চক্রবর্ত্তী শ্যামসুন্দরের অনুগ্রহ-লাভের আশায় মন্দিরে চলিলেন। আজ যামিনী দেবী বিগ্রহের পুষ্পশয্যার আয়োজন করিয়াছেন। এ কি উপসংহারের পূর্ব্বাভাষ! বিগ্রহের চতুর্দ্দিকে রাশি রাশি ফুল... নানা রঙের! যে রঙের পর যে রঙ মানায়, তাই দিয়াছেন,...আমি বলিলাম,—নিপুণ শিল্পী.. শ্যামসুন্দরের মুখে কি মধুর হাসি!...

এ হাসির আরো প্রত্যক্ষ পরিচয় মিলিল। মন্দির হইতে ফিরিবা-মাত্র দেখি, স্নান সারিয়া আনন্দ একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া গীতা পড়িতেছে। গীতার মাহাত্ম্যের জন্যই গীতার উপর অনুরাগ? না, এ গীতাখানি যামিনী দেবীর বহি বলিয়া?...

তারপর প্লটের উপসংহারটুকু একেবারে মিলনান্তক হইয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—শাস্ত্রে বলেচে না, চার্ব্বঙ্গী শ্বশ্রূমাতা...?

আমি কহিলাম,—না। চার্ব্বঙ্গী তরুণী বধূ...

চক্রবর্ত্তীর দুই চোখ জলভারে আক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন,—গিন্নীর কথা মনে পড়চে, শাস্ত্রী।

আমি কহিলাম,—শুভ লক্ষণ! শুভ কর্ম্মে তাঁর অদৃশ্য নেত্রের প্রসন্ন দৃষ্টিপাত হচ্ছে, তাই···তা ছাড়া স্বয়ং বিধাতা প্রজাপতির লেখা এ ভাগ্য-কাহিনী···এ তো ঐ আনাড়ি পরাগ মুখুয্যে, কিম্বা ঝর্ণা দেবীর দলের লেখা মাসিক-পত্রের গল্প নয়, তাই এর উপসংহারে এমন নিবিড় আনন্দ! পরাগ-ঝর্ণার দল হলে এ অবস্থায় নায়ককে রাণীগঞ্জের কয়লার খনিতে কুলিগিরি করতে পাঠাতো; আর নায়িকাকে ষ্টেজে তুলে জীবন-নাটকে নৈরাশ্যের দীর্ঘনিশ্বাসের ঝড় তুলে দিত!···এ বিধাতার পাকা হাতের প্লট—তাই নায়ক ওধারে গীতা পড়চেন; আর নায়িকা শ্যামসুন্দরের মন্দিরে পূজার আয়োজন করচেন···

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—তাঁহার পায়ে নাগরা জুতো যখন দেখেছিলাম, তখন মনে বিরূপতা জেগেছিল খুবই। কিন্তু হিন্দু হয়ে হিন্দু নারীকে আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করতে পারি না তো···

আমি কহিলাম,—ওঁকে যখন নাগরা থেকে বঞ্চিত করেচেন, তখন আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করবেন না···এত প্রচুর বঞ্চনায় মানুষের প্রাণ বাঁচতে পারে না···

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—কিন্তু মা লক্ষ্মীর যে ভক্তি আর মমতার পরিচয় পেয়েচি, তাতে আমায় দেখার জন্য যে ওঁকে আজীবন আমার গৃহেই রাখতে চাই···

আমি কহিলাম,—তাহলে আশ্রিতা সম্পর্কের চেয়ে আর একটু স্নেহের সম্পর্ক-বন্ধন ওঁকে দিতে হয়, অর্থাৎ যে বন্ধন উনি কোনো কালে ছেদন করতে পারবেন না! আর তা না হলে ওঁর সঙ্কোচও কাটবে না···

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—আমি তা ভেবেচি,—তাই স্থির করেচি···কি সেই শাস্ত্র-বাক্য?···চাব

তাড়াতাড়ি বলিলাম,—তরুণী বধূ…

চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—তাই হোক! তার উপর যখন শাস্ত্রী মশায় বলচেন, আচার-নিষ্ঠা বহির্বসন মাত্র…

আমি কহিলাম,—এবং শাস্ত্র আরো বলেচে, সে বসন বহু পুরাতন বলে জীর্ণ হয়েচে, তাই বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়,—অর্থাৎ সে জীর্ণ বসন যথারীতি বিহায়…কি না, ত্যাগ কর…

চক্রবর্ত্তী একবার আনন্দর পানে চাহিলেন, পরক্ষণেই যামিনী দেবীর পানে…তারপর ডাকিলেন,—মাধব…

'মাধব খাস ভৃত্য—সে আসিল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—পাঁজিখানা নিয়ে আয়…

পাঁজিও আসিল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন,—ছাখো তো শাস্ত্রী, শুভ-দিনের নির্ঘণ্ট……

বিবাহের পর সেই আতা-কুঞ্জের ধারে বেদীর উপর বসিয়া-ছিলাম,—তিনজনে…যামিনী দেবী, আনন্দ আর আমি। জ্যোৎস্না রাত্রি। আলোর ফিনিক ফুটিয়াছে! চাণক্যর স-শিখ পরচুলাটা খুলিয়া পাশে রাখিয়াছিলাম—স্নিগ্ধ বাতাসে মাথাটা আরাম পাইয়া বাঁচিয়াছিল!

তর্ক চলিতেছিল। আনন্দ কহিল,—কিন্তু এই ব্যাপারই যদি গল্পচ্ছলে লিখতে তো পাঠক-পাঠিকা বলতো, আজগুবি!

আমি কহিলাম,—বলুক! তারা অতি-বেচারী! গতানুগতিকের অন্ধ দাস তারা। জানে না যে, মানুষের কল্পনার চেয়ে বিধাতার কল্পনার দৌড় কত বেশী! জীবনের ঘটনা কাল্পনিক ঘটনার চেয়ে কত বেশী আশ্চর্য্য…

আনন্দ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল,—ঠিক! এই জন্যই সেক্‌স্‌পীয়র বলে গেছেন—there are more things…

সবলে আনন্দর ঠোঁট চাপিয়া কহিলাম,—চুপ্‌! জীবনে সব আমি সহ্য করতে পারি, শুধু পারি না সহ্য করতে যেখানে-সেখানে এই কোটেশনের বুলি!…

হাসি

আর যে সইতে পারিনা গো!

স্বামী! যতদিন কাছে ছিলেন, আমার তিনি কেউ ছিলেন না! ততদিন নিজের মনকে বুঝতে পারিনি, বোঝবার চেষ্টাও করিনি! গল্প শুনেছিলুম, এক মস্ত যোদ্ধা তলোয়ারের ঘায় সার-সার গাছ এমনি কেটেছিলেন যে, যারা দেখেছিল, প্রথমটা তারা ভেবেছিল, গাছ যেমন আস্ত তেমনি আছে, কাটেনি; তার পর নাড়া দিতেই ধুপ্‌ধাপ করে সব কাটা মাথাগুলো পড়ে গেল! আমারও সেই দশা। যতদিন তিনি কাছে ছিলেন, আমারও অলক্ষ্যে এমন নিঃশব্দে মনের গোড়ায় কোপটি দিয়েছিলেন যে, আমি তা বুঝতেও পারিনি। তাই না আজ প্রাণটা জ্বলে খাক্ হয়ে যাচ্ছে! কেন তখন তাঁকে বুঝিনি? তাঁর শত লাঞ্ছনায় আমিও একদিন আমোদ পেয়েছি! হায়রে! আর আজ তিনি নেই, তাঁর স্মৃতির এতটুকু লাঞ্ছনাও প্রাণে আমার বিষ ছিটুচ্ছে—এ কষ্ট কি অসহ্য গো! সেই কথাই বলি।

চার ভাইয়ের পর যখন আমার জন্ম হলো, শুনেচি, তখন চাকর-দাসীদের ডেকে ডেকে কে কি চায় জিজ্ঞেস করে সব বখশিস্ দেওয়া হয়েছিল। মা হেসে বলেছিল,—মেয়ের যত্ন বাঙালীর বাড়ীতে কেমন করে করতে হয়, সবাইকে এবার দেখাবো। সবার মুখে হাসি ফুটিয়েছিলুম বলে আমার নাম রাখা হয়েছিল, হাসি! হাসি, হাসি-

মুখী ! হায়রে, তখন যদি কেউ বিধাতা-পুরুষের মুখে পরিহাসের নিষ্ঠুর হাসিটুকু দেখতে পেতো !

জ্ঞান হলে অর্থাৎ ছেলেবেলাকার কথা যতদূর মনে পড়ে আর কি, এটা বেশ বুঝেছিলুম, দাদাদের চেয়ে আমার আদর মা-বাপের কাছে কম তো ছিলই না, ছিল বরং ঢের-বেশী। লেসে-রেশমে আমায় যেন পাতায়-ঢাকা ফুলটির মত করেই রাখা হতো ! কি আদর ! বাবার সঙ্গে ছুটির দিনে গড়ের মাঠে, ইডেন গার্ডনে, মিউজিয়মে ফিটনে চড়ে বেড়াতে যাওয়া,—তবে গে ঐ বায়োস্কোপে, কি সার্কাসে—বাবার আমি নিত্য-সঙ্গী ছিলুম। হাস্‌তে হাস্‌তে বায়োস্কোপ থেকে ফিরে যখন দাদাদের ঘরে ঢুকতুম, দাদারা তখন মাষ্টার মশায়ের পড়ার চাপ ঠেলে আমার মুখের পানে কি সে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে দেখতো ! দাদারা কোনোদিন আড়ালে মার কাছে আব্দার তুললে মা বল্‌তো,—"ও মেয়ে, ছ'দিন পরে পরের ঘরে চলে যাবে। সেখানে যত্ন-আদর মিলবে কি না, কে জানে ! তোরা হলি বেটা ছেলে, সবই তো তোদের থাকবে, আমোদ-আহ্লাদও পালাচ্ছে না,—তাছাড়া এখন তোদের লেখাপড়ার সময়, আমোদ-আহ্লাদ বড় হয়ে করিস্ তখন। এখন পড়্‌গে যা।

আমার বেশ মনে আছে, সেবারে কি একটা মস্ত ব্যাপারে গড়ের মাঠে বাজি পোড়াবার ভারী ধূম বেধেছিল। দাদারা কাগজের নৌকো দোয়াত তৈরী করে পুতুল কিনে দিয়ে আমার মন জুগিয়ে আমায় সুপারিশ ধরেছিল,—"লক্ষ্মী ভাই হাসি, আমাদের যাতে বাজি দেখতে যাওয়া হয়, করিয়ে দে, ভাই। কাল স্কুল থেকে আসবার সময় তোর জন্যে খুব ভালো জেলি লজঞ্জুস কিনে আনবো। এ আর কি বড় কথা ! বাবাকে বলে দাদাদের এমন কত আব্দার কত দিন যে রেখেছি—সেই ছেলেবেলায় !

দাদাদের কাছেই আদরটা কি কম ছিল! ভালো খেলনা, ভালো ছবিটি কোথাও দেখলে তখনি হাসির জন্যে নিয়ে আসতো। দাদারা ব্যাডমিণ্টন খেলবার আয়োজন করলে আমিও বায়না নিলুম, আমি খেলবো। অমনি পরদিন আমার জন্যে ব্যাট-ট্যাট্ এসে হাজির। পাড়া-পড়সীরা দেখে জ্বলে উঠতো, আড়ালে এ-ওর গা টিপে বলতো, দেখে আর বাঁচিনে—কলির চিত্রাঙ্গদা জন্মেচেন! এর পর কি হাল হয়, তাও দেখবো'খন।

সত্যি, আজ কেবলি মনে হচ্ছে, কেন এমন সোনার শৈশব ফুরিয়ে যায়,—কেন মানুষ বড় হয়, চিরদিন তেমনি ছোট কেন থাকে না—তার সেই ছোট গণ্ডীটির মধ্যে? সেই আনন্দের লহর,—হাওয়ার মত সেই অবাধ গতিতে ভেসে বেড়ানো—সে কি সুখ!

মা-বাপের কাছে জন্ম-জন্ম ঋণী আমি! এমন মা-বাপ কি কেউ পেয়েচে কখনো! তবে একটা কথা আজ মনে হয়, মা-বাপের মনে স্নেহ-মমতা বিধাতা যতটা ঢেলে দিয়েচেন, মেয়েকে সুখী করবার শক্তি যদি তার সিকির সিকিও দিতেন!

ন'বছর বয়সে আমার খুব অসুখ হয়, একবার। বাড়ী-শুদ্ধ সকলে কি-রকম যে অস্থির হয়ে উঠলো! ডাক্তারে-নার্শে বাড়ী ভরে গেল। ক'দিন যেন বাড়ীতে টাকার ছিনিমিনি খেলে গেল। ডাক্তারের দল যেদিন আরোগ্য আর আশ্বাস দিয়ে বাড়ী থেকে চলে গেলেন, বাড়ীতে সেদিন একটা আরামের বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌লো! আমার মুখে-চোখে চুমু দিয়ে গায়ে নতুন গহনা চড়িয়েও বাবার মার সাধ আর মেটে না!

তারপর আমার শরীর সারাবার জন্যে বাড়ী শুদ্ধ সকলে পশ্চিমে চললুম। কোথায় রইল, দাদাদের পড়াশোনা !

... ...

একদিন দাদাদের পড়বার ঘরে বসেছিলুম—দাদারা কলর-বক্স নিয়ে ছবি আঁকছিল, বন-জঙ্গল, নদী-পাহাড়, কত-কি ! আমি বসে বসে ফরমাস করছিলুম—আর আব্দার তুলছিলুম, ঐ গাছতলায় একটা হরিণ আঁকো না, বড়-দা। জলে নৌকো কোথায় ? বা রে, পাহাড়ের উপর বরফ কৈ ? এমন সময় গম্ভীর আওয়াজ তুলে এক প্রকাণ্ড ভারী গাড়ী এসে আমাদের বাড়ীর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমি উঠে খড়খড়ির ধারে এলুম। এমন গাড়ী এ রাস্তায় ঢোকে,—কি গাড়ী ? দেখি, একপাল মেয়ে গাড়ীর মধ্যে বসে,—কেমন একটা দীপ্তি তাদের মুখে-চোখে, কি প্রসন্ন হাসি ঠোঁটের আগায় উথলে উঠেচে ! কাপড়-চোপড় বেশ সরল ছাঁদে সুশ্রী ভঙ্গীতে পরা ! কারো মাথার উপর লাল ফিতের বো বাঁধা, কারো পিঠ বয়ে ছোট্ট বেণী দুলচে, কারো বা মাথায় খোঁপা। তাদের দেখে মনে হলো, এরা যেন কোন্ এক অজানা আনন্দ-লোকের জীব ! দাদাদের বললুম,—এ কি গাড়ী ভাই ?

দাদারা বললে,—মেয়েস্কুলের গাড়ী—বোকা মেয়ে, তা জানোনা ! মেয়েরা ওতে করে স্কুলে যায়।

দিব্যি দলটি ! আমি একেবারে নেচে উঠে বললুম, আমিও স্কুলে যাবো। বাবাকে বলে মাকে বলে সেই দিনই বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললুম; স্কুলে ভর্ত্তি হলুম। রোজ রোজ একদল সঙ্গীর সঙ্গে সমস্ত পথ হাসিতে গল্পে চকিত করে দিয়ে গাড়ী চড়ে স্কুলে যেতে লাগলুম—পথে নানা আকারের বাড়ী-ঘর, লোকজন বিদ্যুতের মতই কি সে বৈচিত্র্যের

হল্‌কা নিয়ে সরে সরে যেতো। স্কুলে নানান্ দেশের নানান্ লোকের গল্প-কথা আমার প্রাণের তারে কেমন-এক ঝঙ্কার তুলে দিত। আমি তন্ময় বিভোর হয়ে এক নতুন আনন্দ উপভোগ করতুম!

দিনগুলো দিব্যি কেটে যাচ্ছিল। পৃথিবীটাকে ভারী সুন্দর, আরামের জায়গা বলেই বুঝছিলুম! বইয়ে দেখতুম, দুঃখ বলে কি একটা কথা তুলে বইওয়ালারা কত পাতা তারি বর্ণনায় হা-হুতাশে ভরে দিয়েচে! আমি ভাবতুম, দুঃখ, সে আবার কি? অভাব—তারই বা মানে কি? দুঃখী তো ঐ গরিব ভিখিরীরা—যাদের মুখে অন্ন, পরণে একখানা কাপড় জোটে না! তাছাড়া পৃথিবীতে আবার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব থাকতে পারে! ভাবতে বসলেই মাথাটা কেমন চন্-চন্ করে উঠত! দুঃখের কথা দুঃখের প্রসঙ্গ ছেড়ে একেবারে দাদাদের ঘরে, নয় তো মার কাছে, কি বাবার কাছে ছুটে যেতুম। মনটা আবার তার সহজ স্বর ফিরে পেত!

সুখ আর দুঃখ, এই নিয়েই বিধাতার সৃষ্টি। আজীবন দুঃখের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, এমন কি কেউ আছে, এ জগতে? যদি থাকে, না জানি, পূর্ব্বজন্মে কি অসীম তপস্যাই সে করেছিল! আকণ্ঠ সুখ ভোগ করে আমি তখন ভাবতুম, আমিও সেইদলের একজন, আর আজ…?

সুখ আর দুঃখ, কিছু-কিছু যে ভোগ করেচে তার ভাগ্যেরও তুলনা নেই! কিন্তু ছেলেবেলা একটি দিনের জন্যও দুঃখ যার গায়ে হুল্ এতটুকু ফোটায়নি, পরে যখন তাকে একেবারে অসংখ্য শরে জর্জ্জরিত করে ফেলে, তখন তার কি কষ্ট, কি যাতনা—উঃ! ভগবান, অতি-বড় শত্রুকেও যেন সে যাতনা কখনো ভোগ করতে না হয়!

আমার সুখের মাত্রা কাণায় কাণায় ভরে উঠেছিল—আর ধরছিল

না, তাই একদিন সেই পাত্রটা হঠাৎ উল্টে দিয়ে সমস্ত সুখের জায়গাটুকু দুঃখ এসে অধিকার করে বস্‌লো। আজও সে পাত্র কাণায় কাণায় ভরে আছে, শুধু দুঃখে আর দুঃখে! এ পাত্র কবে ওল্টাবে—কবে চূর্ণ হবে, ভগবান!

আমার বিয়ের বয়স হয়ে এসেছিল। বিয়ে না দিলে নয়! বাবা মা বিষম ভাবনায় পড়লো! এত আদরের মেয়েকে এবার পরের ঘরে পাঠাতে হবে! বাড়ীতে কেমন একটা অস্বস্তি জাগলো। বরের দরের জন্য কোন কাতরতা ছিল না—আসল কাতরতা আমায় পরের ঘরে পাঠাতে হবে, তাই নিয়ে!

বাবা বললে,—মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইটিকে কাছে রাখতে চাই!

তাও কি হয়?—বলে পাত্রের দল হেসে চলে গেল।

শেষে একজনকে পাওয়া গেল। পনেরো বছরের এক মস্ত আইবুড়ো বোন, বুড়া মা আর দারিদ্র্য নিয়ে একটি পাত্র কোন্ অজ পাড়াগাঁয় বসে হিম্‌সিম্ খাচ্ছিল,—দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে সে বললে, আমি রাজী।

অর্থাৎ পাত্রটির লেখাপড়ায় চাড় ছিল খুব, অথচ অবস্থায় কিছুতেই কুলিয়ে উঠছিল না। তার উপর ঘরে বুড়ো মা আর ঐ আইবুড়ো বোন্! বাবার টাকায় বোনের বিয়ে দিয়ে বোনকে বাড়ী থেকে বিদায় করে, মাকে কাশী পাঠিয়ে তিনি আমায় বিয়ে করে আমাদের বাড়ীতে এসে কায়েমিভাবে বসে গেলেন।

তাঁর চাল-চলনটা প্রথমে আমাদের বাড়ীতে সকলের প্রাণে কি যে কৌতুকের উৎস খুলে দিলে! সকলে ভারী মজা পেতে লাগলো।

আমিও! জামাইবাবু স্নানের ঘরে না ঢুকে বাইরের খোলা কলতলায় স্নান করতে নেমে যান—কোঁচানো কাপড়টাকে আয়ত্ত করে পরতে পারেন না, অনেক সময় খোলা গায়ে চটি পায়েই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন, সাবান চাকররা হুঁস করিয়ে দিলে কোনোদিন গায়ে পড়ে, নয়তো পড়েই না! বেরুবার সময় কোঁচার খুঁট দিয়েই জুতোটা ঝাড়তে বসে যান্। চাকর বাকররা মুখ টিপে হেসে সরে আসে—সময় সময় আত্ম-রক্ষার উদ্দেশে মার কাছে এসে তারা নানা অনুযোগ তোলে। মা চোখ রাঙিয়ে বলে, তোরা দিস্ কেন? আগে থাকতে হুঁসিয়ার থাকতে পারিস্ না! ফের যদি অমন হয়, তোদের সবাইকে তাড়িয়ে দেবো, নয় জরিমানা করবো।

আমার আমোদ হতো, রাগ হতো, অভিমান হতো। ঐ যে ও-বাড়ীর শৈল, রাণু, শেফালি—ওরা যে মুখ টিপে হাসে! কেন? ওরা কেমন শ্বশুরবাড়ী যায়—কত তত্ত্ব-তাবাস আসে—কেমন মানুষের মত তাদের বর! পরিচয় দিতে বুক অমনি তাদের গর্ব্বে উথলে ওঠে!

দাদারা তাঁকে ভালবাসতো। বড়-দা বলতো,—গিরীন এমন অঙ্ক কষতে পারে—মাষ্টার মশায় তেমন পারেন না।

যাই হোক্ অঙ্কশাস্ত্রে প্রচণ্ড নৈপুণ্য আর পাণ্ডিত্যে আমার মন প্রসন্ন হলো না! আমি কি যেন চাইতুম তাঁর কাছে—কি, তা নিজেও বুঝিনি কোনোদিন—তবে যা চাইতুম, তা কিন্তু পেতুম না! তার উপর তাঁর এই আমাদের বাড়ী পড়ে থাকা, এটা আমার এক-এক সময় কেমন বিশ্রী ঠেকত। যখন ঐ রাণু শৈল তাদের শ্বশুরবাড়ীর কথা পাড়তো—বিশেষ করে তখনই। আরো মনে হতো, তাঁকে দাদাদের সঙ্গে এক-রকম করে কেউ দেখচে না, একটু তফাৎ করচে! আবার

ভাবতুম, কেনই বা করবে না! আজ মনে হচ্ছে, কেন তখনকার তাঁর সে-সব তাচ্ছল্য আমিও তাঁর সঙ্গে মাথা পেতে নিই নি!

আমায় তিনি ভাল বাসতেন কি? কে জানে! তবে একদিন বড় আনন্দ, বড় তৃপ্তি পেয়েছিলুম। রাঙা কালির অক্ষরে টক্‌টকে ফুলের মতই সে স্মৃতি আমার বুকে ফুটে আছে। সেদিন রাত্রে মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছিলুম। বড় কষ্ট হচ্ছিল। উনি সারারাত্রি শিয়রে বসে মাথায় পটি বেঁধে অডিকলোন দিয়েছিলেন। আর সারারাত্রি কি সে ব্যাকুলতা—একটু ঘুমোও, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো দিকি, লক্ষ্মীটি!…আহা, সে স্বর জীবনে ভুলবো না!

কিন্তু ঐ কি সব! কিশোরী নারীর প্রাণের শত সহস্র কামনা, বিচিত্র সাধ—তার কোন্‌টা মিটেচে আমার! মনটা গুম্‌রে গুম্‌রে উঠতো—কিন্তু কেন? কেন? কি যে চায় মন, তাও কি ছাই বুঝেছিলুম!

এমনি ভাবেই দিনগুলো গড়িয়ে চলেছিল। থেকে থেকে মনে হতো, বৈচিত্র্য আর আনন্দের আলো-ভরা পথ ছেড়ে এ যেন কোন্‌ নিরানন্দময় গলির পথে জীবনটা ঢুকে পড়েচে! যাত্রার শেষ কি হয় না, এ পথে? হয়,—তবে ওরি মধ্যে একটু রকম-ফের আছে তো!

মা বাবা আমায় সাজে পোষাকে গহনার ভারে ঢেকে ফেলছিল। কিন্তু তবুও মা বোধ হয় সে গহনা আর কাপড়-চোপড়ের ভার ঠেলে ভিতরটাও দেখতে পেতো। মার চোখ তো! তা ছাড়া মা যে মেয়েমানুষ!

সেদিন একখানা বই হাতে নিয়ে পিঠের উপর এলো চুলের রাশ ছড়িয়ে দিয়ে চুল শুকোচ্ছিলুম—মা এসে চুলগুলি কুলিয়ে দিতে দিতে বললে,—তোর সে হাসি-খুসি কোথায় গেল রে সব? আজ যা না, সবাই বায়োস্কোপে যাচ্ছে—

আমি বললুম,—না।

মা বললে,—আগে অত যে বায়োস্কোপ দেখতে ভালোবাসতিস্, তা—

আমি বললুম,—ভালো লাগে না।

তবু যেতে হলো। বাবার কথায় 'না' বলতে পারলুম না।

বায়োস্কোপ থেকে ফিরে এসে শুনলুম, বাড়ীতে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। আমার সেই ননদটির খুব অসুখ হয়েছে, নন্দাই রোগের ভার বইতে পারবে না বলে স্ত্রীকে ওঁদের দেশের বাড়ীতে ফেলে দিয়ে গেছে। শাশুড়ী কাশী থেকে ফিরেছিলেন—তিনি বুড়ো মানুষ, রোগের ভার নেন কি করে—তাই উনি আমায় সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মা বলেচে, ও কি করে যাবে? ছেলেমানুষ, ও কি জানে রোগীর সেবা করতে! তার চেয়ে তোমার বোনকে মাকে এখানে নিয়ে এসো বরং। আমরা ডাক্তার দেখাবো'খন খরচ-পত্র করে।

এ কথা শুনেই তিনি একটা উড়ুনি কাঁধে ফেলে চটি পায়ে বেরিয়ে গেছেন।

শুনে আমার আপাদ-মস্তক কেঁপে উঠলো।

চলে গেছেন! মার উপর রাগ হলো একটু। মনে হলো, কথাটা ভালো করে বলা হয়নি, নিশ্চয়! আমি বড়লোকের মেয়ে, পাড়াগাঁয়ে কষ্ট হবে—তাই আমার যাওয়া হবে না! আর তাঁর বোনকে এখানে আনা হবে—সেটা খুবই কৃপা করে! ঠিক এভাবে কথাটা না বলে অন্য ভাবে কি বলা যেতো না? এমন কিছু দরদ ছিল না সত্যি, তবু আমার কেবলি মনে হতে লাগলো, নিশ্চয় সে কথা থেকে তাঁর অবস্থা, তাঁর দারিদ্র্যের প্রতি ইঙ্গিতটাই বেশী ফুটেছিল! নাহলে ওরকম করে তাঁর তো যাবার কথা নয়। হঠাৎ আমার মনের মধ্যে এ কি

হলো, নিজেই বুঝলুম না! এক-বাড়ী দাসী-চাকরের সামনে তাঁকে ও কথা বলা! আমার সম্পর্কেই তো তিনি এখানকার কেউ একজন!—মনে হলো, তাদের চোখে আমিও আজ কত কৃপার পাত্রী! আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না—তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে বসে পড়লুম।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া ভালো লাগলো না! মা ডাকলে। বললুম, খাবো না। তবু জেদ, তবু পীড়াপীড়ি। অসহ্য লাগলো। বললুম, দাও দুধ! রাগে জ্বলতে জ্বলতে একবাটি দুধ গিলে ঘরের আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। কৃত্রিম আলোটা সরে যেতে আকাশের চাঁদ অমনি তার অজস্র হাসির ধারায় ঘরটাকে ভরিয়ে দিলে। আকাশের দিকে চোখ পড়লো—নীল নির্ম্মল আকাশ—চাঁদ হাসতে হাসতে ভেসে চলেছে! সে হাসি এমন বিশ্রী ঠেকলো যে, কি বলবো! চোখ বুজলুম।

অমনি কত কথা—ক'দিনেরই বা?—ভিড় করে মনের দোরে এসে হাজির হলো। আমাকে কতদিন আদর করে তিনি বলেচেন, পাশটাশ করে দু'পয়সা রোজগার করতে পারলেই তোমায় নিয়ে যাবো। দু'জনে সুখের ঘর বাঁধবো, হাসি! সে কথা শুনে তখন হাসি পেতো। আজ মনে হলো, আহা, সে কথায় প্রাণের কতখানি ব্যাকুল আশা জেগে উঠেছিল, কি রকম কেঁপে উঠেছিল সে স্বর! শ্বশুরবাড়ী, স্বামীর ঘর! শুনেচি, বাঙালীর মেয়ের স্বর্গ!

তারপর মনে পড়লো, নিধে চাকরটা ওঁর একটা চিঠি ডাকে দিতে নিয়ে গিয়ে দেয়নি একদিন, ভাঁড়ার ঘরে ফেলে রেখেছিল! সে বলেছিল, ভুলে গেছে। তিনি মলিন মুখে বলেছিলেন, বড্ড দরকারী চিঠিখানা ছিল। আমি বলেছিলুম, তা ভুল কি মানুষের হয় না? ভুল করেচে—কি হবে? তিনি আর কোন কথা কন্ নি! আজ

মনে হল, নিধে সে মিছে কথা বলেছিল—কেন ভুল হলো তার? কেন সে ভুলের কৈফিয়ৎ চাইনি? নিশ্চয় এ তার অগ্রাহ্য করা। বাড়ীর জামাইবাবু কি না! কৈ, দাদাদের কোনো কাজে কোনোদিন তো এতটুকু ভুল হয়না! সেই তুচ্ছ ব্যাপারটাই আমার প্রাণে এমন বাজলো আজ, নতুন বেদনা নিয়ে! তারপর একদিন কি করে রাত্রের দুধ নষ্ট হয়ে যায়—বামুনদি' সবার জন্য এক-এক বাটী দুধ ঠিক করে রাখে—তাঁর সে রাত্রে দুধ জোটেনি! মা জানতে পেরে বামুনদি'কে ধমক দিতে বামুনদি' বললে,—দাদাবাবুদের দিদিমণির দুধ খাওয়া চিরদিনের অভ্যাস—জামাইবাবুর একদিন—

একদিন···কি···? ফাঁক পড়লেও চলে! বটে? কেন, কেন, কেন? তোমাদের বাড়ী পড়ে আছেন বলে! কেন রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ তখন জ্বলে ওঠেনি? মুখ ফুটে কেন সেদিন বলিনি, দূর করে দাও ঐ বাম্‌নীকে—এত বড় আস্পর্দ্ধা ওর! হায়রে, তখন যদি বুঝতুম—যদি বলতে পারতুম, তাহলে আজ এ সোনার সিংহাসনে বসেও চোখের জলে সারা হতুম না! এমনি নানা কথা—খুব ছোট, খুব তুচ্ছ—সেগুলোও আজ মনের দোরে বড় জোরে চীৎকার করছিল। কবেকার তাঁর এতটুকু তাচ্ছিল্য—এতখানি বড় হয়ে ফুটে উঠতে লাগলো।

আমি তাঁকে ভালোবাসি? কে জানে—কোনোদিন ত সেটা ভেবে দেখিনি! আজ তাঁর অভাবে চেয়ে দেখলুম, আমার মনের মধ্যিখানটা একেবারে ফাঁক হয়ে গেছে—খালি হয়ে গেছে!

দু'দিন পরে তাঁর এক চিঠি এলো—বাবাকে লিখেচেন, রুগ্ন বোনকে নিয়ে তিনি বিপন্ন—আমাকে পাঠালে ভালো হয়। বোনটির জীবনের আশা অল্পই। সে বেচারী বৌকে একবার দেখতে চায়। একবেলার জন্যও যদি দয়া করে—

বাবা বললে,—তা হয় কি করে? সেখানে ভারী ম্যালেরিয়া। শেষে কি—

প্রাণটা গেলেই ভালো হতো! তিনি সেখানে পড়ে আছেন—তাঁকে ম্যালেরিয়া ধরবে না? আমার বেলায় যত সাবধান! পোড়ারমুখী আমি, কেন তখন শুধু ঘরের কোণে মুখ বুজে পড়ে ছিলুম? কেন বলিনি, না—যাবো—আমি যাবো—ওগো সে আমার ঘর, শ্বশুরের ঘর, স্বামীর ঘর, নিজের ঘর!

সাতদিন পরে খবর এলো—তাঁর সে বোনটি মারা গেছে। বৌয়ের সঙ্গে দেখা করবো বলে শেষ শয্যায় পড়ে বেচারী কেবলি মিনতি করেছিল। যাক্, সে আপশোষ নিয়েই সে মরেচে, আমাদের আর দুর্ভাবনার কারণ নেই! হতভাগী আমি, তখনো কোনো কথা যদি মুখ ফুটে বলি!

বাবা লোক পাঠালে তাঁকে আনতে—নিধে গেল—ফিরে এসে বললে, তিনি আসতে পারবেন না। তাঁর বুড়ো মা মেয়ে হারিয়ে অত্যন্ত কাতর। মাকে ফেলে শ্বশুরবাড়ী রাজভোগ গিলতে তিনি আসতে পারবেন না। বাবা বললে, আহাম্মক!

আমি শিউরে উঠলুম।

মা বললে,—কথায় বলে, জন-জামাই-ভাগ্না, তিন নয় আপনা!

আমার আদরের মাত্রা বেড়ে গেল খুবই। তাতে কি হবে—সে কি ভালো লাগে! সবার অনুগৃহীত হয়ে, সবার কৃপাদৃষ্টির সাম্‌নে একটা জড়পিণ্ড হয়ে পড়ে থাকা—উঃ, অসহ্য সে জ্বালা! আমার মনে হতো, এ যেন শুকনো গাছের গোড়ায় জল ঢালা হচ্ছে। খাঁচায় আমার একটা পোষা ময়না ছিল—কত কথা বলতো, বড় আদরে অনেকদিন ধরে পুষে আসচি। তার আরামের জন্য কত বন্দোবস্ত ছিল। সেটার

পানে চেয়ে মনে হলো, আমারি মত সুখ-সৌভাগ্য ওর! সোনার খাঁচায় বসে দিব্যি রাজভোগ খাচ্ছে—না? খাঁচা খুলে পাখীটাকে উড়িয়ে দিলুম, বললুম, তোর এ সুখের মাত্রা আজ আমি বুঝেচি রে—আর নয়, তুই উড়ে যা।

তারপর আরো ক'খানা চিঠি এলো, আমায় পাঠাবার জন্য মিনতি ভরে—বুড়ো শাশুড়ী শোকে অন্ধ হয়েছেন। একবার যদি···আমি গেলে—

বাবা রেগে বললে,—হুঁঃ, আমার অত আদরের মেয়ে—

মা বললে,—বেয়াড়া গোঁ! একটা ছোলা কেনবার সামর্থ্য নেই, এখানে এলেই তো পারে! আমার এত লোক-জন—তাদের দুজনের ভার কি আর নিতে পারতুম না?

আমি তখন ঘরের কোণে বসে বসেই চোখের জল ফেললুম। পোড়ারমুখী আমি, কেন তখনও হেঁকে বললুম না, দাও, আমাকে পাঠিয়ে দাও, ওগো পাঠিয়ে দাও আমার স্বামীর ঘরে?

এমনি করেই পড়ে রইলুম—সোনার পালঙ্কে শুয়ে সোনার অন্ন মুখে তুলে—বাপ-মা-ভাইদের সর্ব্ব-সোহাগে সোহাগিনী হয়ে। আর ওখানে তিনি কোথায় জীর্ণ কুঁড়েয় ছিন্ন শয্যায় অন্ধ মাকে নিয়ে অস্থির! চিঠি তিনি আর কোনোদিন লেখেননি। আমার সব চেয়ে বাজতো এইটে যে, আমার মা-বাপের জন্য আমার সঙ্গেও তিনি সম্পর্ক তুলে দিলেন, কোন্ বিচারে! আমি একটা চিঠি লিখেছিলুম একদিন। ঝীকে দিয়েছিলুম ডাকে দিতে। মা জানতে পেরে এসে বললে, তোর লজ্জা হয় না এতটুকু? এত আদর, এত এ—এ তার পছন্দ হলো না!

ত্যাখ্ না, নিজেই সে আসবে'খন। চিঠি দিলে আরো গুমর বেড়ে যাবে তার!

মুখের সামনে দুধের বাটী ধরে মা আমায় বুকের মধ্যে টেনে নিলে। আমার প্রাণটা ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো। এ আদর চাইনে গো আমি, চাইনে আর! এ সোনার শিকলে কেন আমায় পাকে-পাকে বাঁধচো তোমরা? মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, এ সোনার শিকল ছিঁড়ে দাও তোমাদের। আমি উড়ে যাই সেই দূরে, বনের মাঝে, তাঁর সেই জীর্ণ কুঁড়ে-ঘরে।

... ...

তারপর বহুদিন পরে লোকের মুখে-মুখে খবর এসে পৌছুল, জামাইবাবু গোল্লায় গেছেন—তাঁর অন্ধ মা মারা গেছে—একটা দাসীর মেয়েকে নিয়ে তিনি পড়ে আছেন। হাজার কুৎসার কালি তাঁর গায়ে মাখিয়ে জনরব আমার দুই কাণের কাছে বিষম সোরগোল বাধিয়ে তুললে। অসহ্য বোধ হওয়ায় একদিন মাকে আড়ালে ডেকে বললুম, —আমায় পাঠিয়ে দাও সেখানে।

সেখানে? তোকে? মা যেন আকাশ থেকে পড়লো! বললে, —শুনেচিস্ তো কেলেঙ্কারী কাণ্ড!

শুনেচি। গম্ভীর স্বরে আমি বললুম,—এ তো তোমাদেরই দোষে।

—আমাদের! মা অবাক্ হয়ে আমার পানে চেয়ে রইলো। আমি আবার বললুম,—পাঠিয়ে দাও আমাকে!

মা ধিক্কার দিয়ে বললে,—প্রাণ থাকতে নয়। আমি মলে যা-খুসী করো তখন। একটা বওয়াটে গেঁয়ো জানোয়ারের কাছে তোমায় পাঠাতে পারবো না আমি, মা হয়ে।

ব্যস্! সব চুকে গেল।

টুক্‌রো-টুক্‌রো কোলাহলের বিরাম নেই! দিনে দিনে সে ভেসে আসতে লাগলো। এই দার্সার মেয়েটা নাকি তাঁর অন্ধ মায়ের সেবায় জীবন পণ করেছিল—তাঁর অসুখে সে অন্ন-জল ত্যাগ করেছিল। তবে ··তবে···? বাবা বললে,—তার নাম যেন এ বাড়ীতে কারো মুখে না শুনি। খবর্দ্দার!

মা বললে,—মেয়েটা যে হেদিয়ে মরে এদিকে! তাকে ধরে-বেঁধে নিয়ে এসোগে!

বাবা বললে,—আমার মেয়ের এমন নীচ প্রবৃত্তি হতে পারে না। বাবা আমায় কোলে টেনে নিয়ে বললে,—আমাদের বড় মাথা হেঁট করেচে! এক হতভাগার জন্যে এত-বড় অপমান!

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনলুম—পাষাণের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ অচল হয়ে।

জড়োয়া গহনায় বাবা আমার অঙ্গ ভরিয়ে দিলে—কাপড়ে-চোপড়ে আলমারির পর আলমারি ভরে উঠ্‌তে লাগলো। একেই বলে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা!

দাদারা বললে,—রাস্কেলটার জন্যে মুখ দেখানো ভার। জিতেন সেদিন এমনি ঠাট্টা করছিল। কি লো-টেষ্ট্‌!

সারাদিন কি অসহ্য জ্বালায় জ্বলতুম, তা শুধু অন্তর্য্যামীই জানতেন! মা সর্ব্বক্ষণ বুকে বুকে রাখতো। তাতে জ্বালা যে কত বেশী বেড়ে উঠতো!

একটু শান্তি পেতুম—রাত্রে নির্জ্জন ঘরে, তাঁর সেই বিয়ের-সময়কার ছবিটিকে বুকে চেপে ধরে! চোখে নির্ম্মল প্রশান্ত দৃষ্টি—কেন আমার উপর থেকে সে দৃষ্টি সরে গেল!···কেন? আমারই অপরাধে!

তারপর একদিন চূড়ান্ত ঘটনা ঘটে গেল। দেশে দেশে খবরের কাগজে মহা বার্ত্তা রটে উঠলো! ঝড়ের রাত্রে এক ডুবোন্ত নৌকোর মরণোন্মুখ যাত্রীদের উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি আর সেই দাসীর মেয়েটা দুজনেই স্রোতের মুখে নিজেদের প্রাণ ভাসিয়ে দেছেন। তাঁর সমস্ত পরিচয় কোথা থেকে জেনে কাগজওয়ালারা একেবারে ছেপে দেছে, জয়-গানে কাগজগুলোকে ভরিয়ে তুলেচে!

বাবা বললে,—আমার মুখ পুড়িয়ে দিয়েচে একেবারে।

দাদারা বললে,—ব্রুট্!

কারো চোখে একফোঁটা জল তো নেইই, মুখে দারুণ বিরক্তি! আমি সরে' যাচ্ছিলুম—একধারে, একটু চোখের জল ফেলবার জন্য! বাবা বুকে জড়িয়ে ধরে বললে,—তোর দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে হাসি, আজ থেকে তুই মুক্ত! মা আমার, মনে করিস্, তুই আমার সেই ছোট্ট মেয়েটিই আছিস্—সেই ছেলেবেলাকার হাসি আমার। তোর বিয়ে-থা কিছু হয়নি! একটা দুঃস্বপ্ন শুধু কোথা থেকে এসে হঠাৎ যেন তোর জীবনের উপর দিয়ে ভেসে গেছে!

প্রাণ কি সে কথা মানে গো! আমি যে প্রাণে প্রাণে জান্‌চি, তাঁর প্রাণ কি দিয়ে গড়া—ভিতরে তার কি রত্নের রাশি ছিল! ওগো, এ কথা মানবো না, মানবো না, আমি মানবো না। বাবা গুরুজন। আর তিনি? তিনি স্বামী—আমার দেবতা।

বাবা বললে,—সে হতভাগার জন্যে এক-ফোঁটা চোখের জল ফেলিস্‌নে, খবর্দ্দার! তাহলে জান্‌বি, সে জল তোর বাবার বুকে ছুরির মত বিঁধবে! একটা বেয়াড়া জানোয়ার······

মনে হলো, এক বিরাট তেজে জ্বলে উঠে বলি,—চুপ করো। তোমাদের মুখে ও-কথা সাজে না! বিলাসের পুতুল হয়ে বসে আছো

সব, ঐশ্বর্য্যের দর্পে দর্পী! কেন তোমরা তাঁর পাশ থেকে আমার সে ঠাঁইটুকু কেড়ে নিলে? কেন তাঁর পাশে দাঁড়াতে দাওনি আমায়? কেন? কেন? কেন…?

সেই দাসীর মেয়ের উপর শ্রদ্ধা হলো, হিংসাও হলো! তাঁর অন্ধ মায়ের সেবায় সে তাঁর ডান হাত ছিল—তারপর এই এত বড় ব্যাপার, এতেও সে তাঁর সঙ্গিনী! এত বড় সৌভাগ্যের একটা কণা যদি আমার ভাগ্যে মিলত, তবে এই হারানো জীবনে যে মস্ত পাথেয় পেতুম আমি! কোনো ক্ষোভ থাকতো না!

নিজের ঘরে গিয়ে তাঁর ছবিটা নিলুম। ছবির পায়ে মাথা রেখে শ্রদ্ধার অঞ্জলি বর্ষণ করতে লাগলুম! আজ জগতের লোক বুঝবে না, কতখানি মহত্ত্ব সে বুকে ছিল! কিছুই বুঝলে না,—শুধু জেনে রইলো, একটা দাসীর মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিশ্রী সম্পর্কটুকু—এইটুকুই জ্বল্‌জ্বল্ করবে চিরকাল! আমি কেউ নই, তাঁর কেউ নই, এ-কথা মনে হতে দুই চোখে অজস্র জল ছাপিয়ে উঠলো।

হঠাৎ ঝঙ্কার শুনলুম,—হাসি-

চম্‌কে ফিরে দেখি, বাবা।

—ও কি হচ্ছে?

বাবা এগিয়ে এলো। আমি স্তম্ভিত বসে রইলুম। চোখের জল সে হুঙ্কারে কোথায় উবে গেল!

বাবা বললে,—দেখি, ও কার ছবি।

ছবিটা বাবা কেড়ে নিলে। বললে,—তার জন্যে কান্না হচ্ছে? মানা করে দিছি না?

একটুমাত্র সম্বল রে, শুধু এতটুকু স্মৃতি—তাও হারালুম।

বাবার কড়া হুকুম জাহির হলো, মনে রাখিস্, হাসি, যার জন্যে

আমার মাথা হেঁট, বংশের মাথা হেঁট হয়েছে, তার স্মৃতিও এ-বাড়ীতে থাকবে না।

বাবা ছবি নিয়ে চলে গেল।

মা এসে বুকে জড়িয়ে ধরে ডাকলে,—মা—

মার চোখে জল! সেদিন আর কোনো লজ্জা রইলো না, মুখ ফুটলো। স্পষ্ট বললুম,—আমি এ বাড়ীতে থাকতে পারবো না মা। চোখের জল তোমাদের শাসন মানবে না—মানতে পারবে না, মানতে দেবো না আমি। কিছু তো চাইনে আমি তোমাদের কাছে—গহনা, কাপড় যা-কিছু দিয়েচো, সব ফিরিয়ে নাও—শুধু আমায় কাঁদতে দাও মা। আমার ইহকাল নষ্ট করেচো তোমরা, পরকালটা আর হারাতে পারবো না।

মার মুখে কোনো কথা ফুটলো না। মা আমার পানে চেয়ে রইলো, আর মার দুই চোখ দিয়ে ঝর্ঝর্ করে জল ঝরে পড়তে লাগলো……

পাঁচ অঙ্ক

বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে ট্রেন থামিবামাত্র যতীশ প্লাটফর্ম্মের দেওয়ালে-আঁটা ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখে, এগারোটা বাজিয়া সতেরো মিনিট। মনে মনে সতেরো মিনিটের সঙ্গে আরো চব্বিশ মিনিট যোগ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! বারোটা বাজিতে আর ক' মিনিটই বা বাকী! অফিসে পৌছিতে···ওঃ, সে কথা আর ভাবা যায় না!

চট্‌পট্‌ প্লাটফর্ম্মের বাহিরে আসিয়া একখানা ট্যাক্সিতে সে চাপিয়া বসিল; এবং ট্যাক্সি আসিয়া লালবাজারে তার অফিসের সাম্‌নে পৌছিলে ভাড়া চুকাইয়া এক-লাফে টপাটপ তিন-চারিটা সিঁড়ি টপকাইয়া তেতলায় নিজের ঘরে আসিয়া চেয়ার টানিয়া বসিবে, এমন সময় তার নজর পড়িল, ডেস্কের উপর লেখা একখণ্ড কাগজের উপর। মনিবের নিজের হাতে লেখা, ইংরাজী অক্ষরে—

Jyotis Chandra Sen to see me immediately.

P. R.

যতীশের চোখের সামনে হইতে সমস্ত পৃথিবীটা এক মুহূর্ত্তে যেন বিলুপ্ত হইয়া গেল! কাগজখানা সে হাতে তুলিয়া লইল। হাত কাঁপিয়া উঠিল। কাঁপুক! সেই পত্র হাতে লইয়া, আশে-পাশে কাহারো পানে না চাহিয়া সে একেবারে মনিব পি, আর-এর খাস্‌-কামরার দিকে ছুটিল।

মনিব বাঙালী। P. R. কথাটার অর্থ পরেশ রায়। বাঙালী হইলেও তিনি বিলাত-ফেরত। মেজাজ খাসা। মজলিসী লোক, মায়া-মমতা আছে। মনিব হইলেও অফিসের কর্ম্মচারীদের সুখ-দুঃখে

উদাসীন নন্, অফিসের বাহিরে সকলের সঙ্গে বন্ধুর মত সদালাপ করেন। তবে কাজ আদায় সম্বন্ধে ভারী কড়া। অফিসে তাঁর মেজাজ পুরাদস্তুর খাস-ইংরাজের মতই—কর্ম্মচারীদের হাজিরার দিকে লক্ষ্য তাঁর ভারী তীক্ষ্ণ।

পরেশ রায়ের খাস কামরার সামনে দাঁড়াইতে চাপরাশি জগা কহিল—এই যে, আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলুম। হুজুর তলব করেচেন। যান্—কথাটা বলিয়া জগা দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। আর সেই দ্বার খুলিয়া যতীশ সেন গিয়া প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। তার বুকের মধ্যে তখন মুগুরের ঘা পড়িতেছিল। আজ·· বারে বার তৃতীয় বার তার উপর দেরি করার দরুণ কৈফিয়ৎ তলব হইয়াছে! কৈফিয়ৎ তলব ছাড়া এ চিঠিটুকুর অপর কি অর্থ ই বা থাকিতে পারে?

মনিবের মুখ গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি আরো গম্ভীর। যতীশের মুখে সেই গম্ভীর-দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তিনি কহিলেন,—ক'টা বেজেচে, যতীশবাবু?

যতীশকে মনিব যতীশ বলিয়াই ডাকেন। নামের সঙ্গে সহসা বাবুর যোগ হইয়াছে দেখিয়া যতীশ ভড়কাইয়া গেল। সে মাথা নত করিয়া নীরব রহিল।

মনিব কহিলেন,—ঘড়িটা দেওয়ালে; মেঝেয় নয়। ঘড়ির দিকে চেয়ে বলুন···

যতীশকে ঘড়ির দিকে চোখ তুলিয়া চাহিতে হইল। মনিব কহিলেন,—ক'টা বেজেচে?

যতীশ কহিল,—বারোটা বেজে সাত মিনিট।

মনিব কহিলেন,—ঘড়িটা বোধ হয় ফাষ্ট নয়?

জবাব দিতেই হইবে। যতীশ কহিল,—আজ্ঞে, না।

মনিব কহিলেন,—অফিসে আপনাদের পৌছুনো উচিত বেলা সাড়ে দশটায়। নয় কি ?

যতীশ কহিল,—আজ্ঞে হাঁ! এই অবধি বলিয়া সে মুহূর্ত্ত স্তব্ধ রহিল, পরক্ষণে কহিল,—কিন্তু···

মনিব কহিলেন,—আমি তা জানি। আরো দু'বার দুটো কৈফিয়ৎ হয়ে গেছে। পাড়ায় কাদের বাড়ী হঠাৎ কি দুর্ঘটনা ঘটেছিল···সেটা প্রথমবারের কথা। দ্বিতীয়বার, বর্ষার জলে পথ ডুবে গেছলো বলে ঘোরা-পথে ষ্টেশনে আসতে ট্রেণ ফেল হয়ে যায়···এই না···?

যতীশ কহিল,—কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বানিয়ে বলিনি···

মনিব কহিলেন—আমি তো সে বিষয়ে সন্দেহ করিনি। কিন্তু কি জানেন, যতীশবাবু, অফিসের কাজ তো তা বলে বসে থাকতে পারে না···অফিসের যে তাতে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়! সে ক্ষতি-পূরণের ব্যবস্থাও তো আপনি কিছু করতে পারেন নি!···যাক, আজ কি আবার পাড়ায় কারো বাড়ী কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছিল? কলেরা? না, ডেলিভারী-কেশ্?···

এ বিদ্রূপ যতীশের গায়ে যেন কাঁটার চাবুক মারিল! মনে হইল, হায় রে, গোলামির এতই মায়া···এ টিট্‌কারীর পরও এখানে মুখ গুঁজড়াইয়া চাকরি করিতে হইবে! এর চেয়ে লোটা-কম্বল লইয়া জঙ্গলে বাহির হওয়াতেও যে ঢের সুখ, ঢের আরাম! কিন্তু ঘরে বিধবা মা, আইবুড়ো বোন্, ছোট ভাই···সে যে কতখানি নিরুপায়!··· যতীশ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

মনিব কহিলেন,—এবারে এত দেরী হলো কেন? পাড়ায় ব্রাহ্মণ-ভোজন ছিল না কি ?

যতীশ বাধা দিয়া কহিল,—আপনার কাছে কোনো দিন কোনো মিথ্যা ওজুহাত তুলিনি আমি। যে কারণে দেরী হয়েচে, তা এখনি অকপটে বলচি। আজ…

মনিব কহিলেন,—হাঁ, বলুন। আমার শোনা দরকার, কারণ অফিসে একটা discipline রাখতে হবে তো…

যতীশ কহিল,—আজ ষ্টেশনে এসে দেখি, একটি ভদ্রলোক ব্যায়রামে ভুগছিলেন—তাঁকে নিয়ে তাঁর ছেলে-মেয়েরা ট্রেণে করে ডায়মণ্ড-হারবার থেকে কলকাতায় আসছিলেন চিকিৎসার জন্য…তা, ভদ্রলোক ভিরমি যান্—তাঁর লোকজন ভয় পেয়ে বারুইপুর ষ্টেশনে তাঁকে নামান। বিপন্ন দেখে আমি একজন ডাক্তার ডেকে এনে তাঁর পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করতে যাই। তাই…

মনিব কহিলেন,—সকলের প্রতি আপনার এত দরদ, শুধু আমার বেলা সেটার কার্পণ্য দেখলে আমার পক্ষে তা সহ্য করা একটু শক্ত হয় না কি যতীশবাবু…?

যতীশ মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ রহিল। কি যে করিবে সে ? এই বিদ্রূপের পর বিদ্রূপ…চাকরি কি আর কোথাও মিলিবে না ? কিন্তু তখনই মনে পড়িয়া গেল, পাঁচ মাস পূর্ব্বেকার কথা ! ছোট ভাইটির টাইফয়েড হইয়াছিল, ঔষধ-পথ্য ও ডাক্তারের ভাবনায় সে কতখানি কাতর—মা'র চোখে জল…সে সময় এই মনিবই তাঁর মোটরে করিয়া দু'বেলা বড় ডাক্তার পাঠাইয়া ভাইকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছেন…অফিসের দিকে তাকে ঘেঁষিতেও দেন নাই ! এত বড় ঋণে যাঁর কাছে সে ঋণী—তাঁর একটা কঠিন কথার ঘায়ে সে ঋণ অস্বীকার করিয়া, সে ঋণের দায় এড়াইয়া সে পলাইয়া যাইবে, তা'ও অন্যায় করিয়া, দোষ করিয়া…! মন ধিক্কারে ভরিয়া আপন হইতেই বলিয়া উঠিল, এঁর পায়ে এমনিতেই তো মাথা

বিকাইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়, দোষ করিয়া আবার তর্ক তুলিবার স্পর্দ্ধা রাখো! ছি!

যতীশ কাতর কণ্ঠে কহিল,—এবারটি মাপ করুন, আর কখনো দেরী হবে না!

মনিব কহিলেন—ব্যস্, ব্যস্, খুশী হলুম। এখন নিজের কাজে যাও,—আর দেরী করো না।

যতীশ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মনিব আপনি ছাড়িয়া তুমি বলিয়া কথা কহিয়াছেন, তাহা হইলে এবারও মাপ! আঃ!

যতীশ নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

তারপর দু'দিন···সাড়ে দশটার পূর্ব্বেই সে অফিসে হাজিরা দিল।

যতীশের বাড়ী বারুইপুরে। ডেলি প্যাশেঞ্জারি করিয়া তাকে অফিসে চাকরি রাখিতে হয়! ৮।৪৮এর ট্রেণে বারুইপুরে ট্রেণে চাপিয়া বেলিয়াঘাটায় আসিয়া সে নামে ঠিক ন'টা বিয়াল্লিশ মিনিটে। তারপর ট্রাম···দেহ-মন এ দু'দিন বেশ স্বচ্ছন্দ!

কিন্তু আবার গোল বাধিল তৃতীয় দিনে। ষ্টেশনের কাছাকাছি সে আসিয়াছে,—একটা ভাড়াটিয়া গাড়ীর মাথায় বিস্তর মোট-ঘাট চাপাইয়া এক গৃহস্থ তাঁর স্ত্রী-পুত্র লইয়া ষ্টেশনে আসিতেছিলেন। বারুইপুরের গাড়ী···তার জীর্ণতার কথা আজো কেন গেজেটিয়ার-বহিতে ছাপা হয় নাই, ইহা ভাবিয়া যতীশ বহুবার বহু বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে —সেই তো গাড়ী···হঠাৎ একটা মোড় বাঁকিতে গিয়া পিছনের চাকা ভাঙ্গিয়া গাড়ী আরোহীদের পথের উপর উল্টাইয়া দিল। একটি ক্ষুদ্র শিশু গড়াইয়া পাশের ডোবায় গিয়া পড়িল। ধর্-ধর্ চীৎকার···কিন্তু কে ধরিবে? চাকরি-গতপ্রাণ চাকরি-জীবীরা তখন চাকরি রাখিতে ব্যস্ত

হইয়া ষ্টেশনে ছুটিয়াছে! যতীশ সরিতে পারিল না—সে গিয়া পরিচর্য্যায় নামিল। একজন স্ত্রীলোকের জখম কিছু বেশী, তা ছাড়া কর্ত্তাটির মাথা কাটিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে। সে কি আর্ত্ত কোলাহল! দু'জন চাষাকে বহু সাধনায় সঙ্গে আনিয়া তাদের সাহায্যে গৃহস্থ-পরিবারকে পরের ট্রেণে তুলিয়া যতীশ তাদের ক্যাম্বেল হাসপাতালে আনিয়া হাজির করিয়া দিল। সেখানে দেখানো, দেখা-শুনা; তারপর তাদের গাড়ীতে চাপাইয়া যথাস্থানে পৌছাইয়া দেওয়া—ঘড়ি নির্ম্মম তালে নিজের পথে সমান চলিয়াছে। কাজেই, যতীশ আসিয়া অফিসে পৌছিল বেলা সাড়ে এগারোটায়। আবার ডেস্কের উপর মনিবের সেই দু' ছত্র লেখা পত্র···এবং যতীশের কম্পিত বুকে মনিবের ঘরে আসিয়া দাঁড়ানো!

পরেশ রায় কহিলেন—কবে আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যতীশবাবু, যে আর দেরী হবে না!?···

যতীশের বুক ফাটিয়া যেন অশ্রুর জোয়ার বহিয়া গেল। সত্যই তো তার আর বলিবার কি আছে? বেলা সাড়ে দশটা হইতে পাঁচটা অবধি সময়টুকু·· সে যে বিক্রীত হইয়া আছে!

পরেশ রায় কহিলেন—আজ কি পরোপকার-ব্রত সফল হলো, যতীশবাবু?

যতীশ কোনো মতে বিলম্বের কারণ বিবৃত করিল।

শুনিয়া পরেশ রায় কহিলেন—এত বড় দরাজ ছাতি নিয়ে আপনার পক্ষে চাকরি করতে আসা উচিত হয় নি। রামকৃষ্ণ মিশনের নাম শুনেচেন? সেখানে যান্···

হায়রে, সে উপায় যদি থাকিত! কিন্তু ঐ মা, বোন্, ভাই···তারা যে দু' মুঠা অন্নের জন্য তারি মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে! তাদের উপায়? কাজেই···

যতীশ কহিল—এবারের মতও মাপ করুন, দয়া করে···

পরেশ রায় কহিলেন—আজ-কাল কোনো কোনো নাটক তিন অঙ্কের হচ্ছে— নয় কি? তা, আপনার এ পরোপকার-নাটক যে চার অঙ্ক ছাপিয়ে চললো! কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, পঞ্চম অঙ্কের পর আর অঙ্ক মিলবে না···পঞ্চম অঙ্কেই যবনিকা···বুঝলেন?

যতীশ এ-কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিল না! না বুঝিয়া সে হতভম্বের মত পরেশ রায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পরেশ রায় হাসিয়া কহিলেন,—একটু সাহিত্য হয়ে পড়চে, না? অর্থাৎ, ফের এ-রকম কারণ ঘটলে আর কৈফিয়ৎ তলব হবে না! অফিসের কাজে তোমায় ইস্তফা দিতে হবে···বুঝলে?

এবার যতীশ অর্থ বুঝিল। অতি সরল ও স্পষ্ট অর্থটুকু! বুঝিয়া সে বিদায় লইতেছিল; পরেশ রায় ডাকিলেন—যতীশ···

যতীশ ফিরিল।

পরেশ রায় কহিলেন—তোমার উপর আমার বিশ্বাস বড় বেশী··· তোমার উপর অনেকখানি নির্ভর করি। তুমিও তা জানো। আর তুমি কেরাণীগিরি করবার লোক নও···তা বুঝেই আমি তোমায় একটা ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা করে রেখেচি। কিন্তু নিত্য তোমার লেট্ হলে তোমার অধীনের লোকেরা তোমায় মানবে না, তারাও লেট্ করবে ···আর তাতে আমার কাজ অচল হয়ে দাঁড়াবে।···যাঁরা অফিসে কাজ করেন, তাঁরাও পরোপকার করে থাকেন···তবে নিজেকে কোনো কৈফিয়তের মধ্যে নিক্ষেপ করে পরোপকার করতে ছোটা বুদ্ধিমান লোকের কাজ নয়! এগুলো থেকে তোমার মনের পরিচয় যা পাই, তা ভালোই,—তবে, একজনের উপকার করতে গিয়ে অপরের অপকার যদি করে ফ্যালো, সেটা কি ঠিক logical হয়?—যাক্, মনে রেখো—

এবার হুঁশিয়ার···কারণ আমার যা কথা, তাই কাজ। তোমায় ছাড়তে আমার কষ্ট হবে—কিন্তু তবু নিরুপায় হয়েই···

পরেশ রায় কথা কন্ কম, সত্য। এই কম কথাটুকুই যথেষ্ট! যতীশ আসিয়া আপনার চেয়ারে বসিল। মুখ তার বিশুষ্ক; মনের মধ্যে একটা প্রবল যুদ্ধ চলিতেছিল। সাম্‌নে অত-বড় কাণ্ড,—মানুষের প্রাণ লইয়া টানাটানি, আর এধারে অফিসের হাজিরা! কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য কোন্‌টা কম? মানুষের অতখানি অমর্য্যাদা··· সেটা করিলেই কি বড় কর্ত্তব্য করা হইত? সমস্যা! পাঁচজনে আসিয়া পাঁচ কথা কহিল,—কিন্তু মনের এ মেঘ সে-সব কথার ফুৎকারে মিলাইবার নয়! কাজেই, মনের মধ্যে সে মেঘ ক্রমেই দীর্ঘ ছায়া মেলিয়া ধরিল।

তারপর এক সপ্তাহ নিরাপদে কাটিল। চমৎকার! কোনো কোলাহল নাই! সমস্যার কোনো খোঁচ্ কোথাও উঠিল না!

সেদিন সোমবার। মাথার উপর নির্ম্মল নীল আকাশ, পথের ধারে ঝোপে-ঝাপে নানা পাখীর কল-কাকলী, রৌদ্র-স্নিগ্ধ প্রকৃতির বুকে বেশ নিবিড় আরাম! যতীশ সাইক্‌ল্ চড়িয়া ষ্টেশনে আসিতেছিল। এটা বে-মেরামতে খড়ের গাদার কাছে পড়িয়াছিল; সম্প্রতি সে সারাইয়া লইয়াছে। ট্রেণ ফেল করার আশঙ্কা ইহাতে কম। ষ্টেশনে সাইক্‌ল্ রাখিয়া সে কলিকাতায় যায়, আবার ফিরিয়া সাইক্‌ল্ চড়িয়া গৃহে ফিরে।

পথের উপর একটা মস্ত ষ্টীম-রোলার; রাস্তা মেরামত হইতেছে। নীচে তাহারি পাশ দিয়া একটা আইলের উপর পায়ে-চলা-পথ তৈয়ার হইয়া উঠিয়াছে। সাইক্‌ল্ লইয়া সে সেই পথে আসিল। হঠাৎ

সাম্‌নে দেখে, নব্য কেতায় শাড়ী পরা এক তরুণী…আইল ভাঙ্গিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন। যতীশ ভাবিল, বেল্ দিয়া তাঁকে সতর্ক করিবে? না, সাইক্‌ল্ হইতে নামিয়া পড়িবে? এক মুহূর্ত্তের দ্বিধা! পরক্ষণেই ওদিক হইতে একপাল গোরু ভয়-চকিত ত্রস্ত গতিতে ছুটিয়া আসিল, এবং তরুণী ভয় পাইয়া ফিরিয়া পিছন দিকে ছুটিলেন। এটা এমন অকস্মাৎ ঘটিল…যে, যতীশের কিছু করিবার পূর্ব্বক্ষণেই সে সাইক্‌ল্-সমেত একেবারে তাঁকে সজোরে ধাক্কা দিল। তরুণী আইল্ হইতে ছিট্‌কাইয়া নীচের খাদে গড়াইয়া পড়িলেন—যতীশও সাইক্‌ল্-শুদ্ধ গড়াইয়া তাঁর পাশে!

চট্‌পট্ উঠিয়া যতীশ দেখে, তরুণী তখনো কাতরভাবে পড়িয়া… কুণ্ঠায়, লজ্জায়, সে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল! সে এখন কি করিবে?…তরুণী কথা কহিলেন,—আমি উঠতে পারচি না। পা'টা মচ্‌কে গেছে…দয়া করে আমার হাতটা ধরুন…

যতীশের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। একে এই নির্ম্মম আঘাত… তার উপর…কোনোমতে তরুণীর হাত ধরিয়া তাঁকে সে তুলিল। এত বিপদের মধ্যেও সমস্ত দেহে কেমন একটা শিহরণ বহিয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে হইতে সমস্ত দুনিয়া যেন মুছিয়া গেল! কাণে বাজিতেছিল, শুধু একটা পাখীর কাকলী—পাখীটা কাছেই কোনো গাছের ডালে বসিয়া প্রভাতের এই স্নিগ্ধ দৃশ্য উপভোগ করিতেছিল, বুঝি!

তরুণী যতীশের কাঁধে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যতীশ অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বেদনার্ত্ত স্বরে কহিল,—আমায় ক্ষমা করুন…

তরুণী হাসিলেন…ঘন কালো মেঘে ভরা আকাশের বুকে সে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক! ভয়ার্ত্ত প্রাণ এ-বিদ্যুতের আভায় আশায়

ভরিয়া ওঠে! তরুণী হাসিয়া কহিলেন,—আপনার তো কোনো দোষ নেই,—দোষ আমারি! গোরুগুলো দেখে আচম্‌কা আমিই যে উল্টো মুখে ছুটেছিলুম···আপনি কি করে বুঝবেন যে···

যতীশ ততক্ষণে পাষাণ-মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে! তার মুখে কোনো কথা নাই!

তরুণী কহিলেন,—যাক্, আমায় একটু সাহায্য করুন—ডাক বাংলায় যদি দয়া করে পৌঁছে দেন! সেখানে আমার গাড়ী আছে, লোকজন আছে···

যতীশ কহিল,—কিন্তু এখন একজন ভালো ডাক্তার···

তরুণী কহিলেন,—বেশ, সেখানে আগে পৌঁছে দিয়ে পরে যা কর্ত্তব্য বুঝবেন, করবেন···

তাহাই হইল। ষ্টেশন হইতে ডাক-বাংলা বেশী দূরে নয়। তরুণীকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া যতীশ কহিল,—লোকজন কাকেও দেখচি না তো···আপনার ড্রাইভার?

ফটকের ধারে একখানি ছোট বেবি-অষ্টিন্ মোটর গাড়ী। তরুণী কহিলেন,—বামুন গেছে ঘর তো লাঙল তুলে ধর্! ড্রাইভার ছিল না; নিজেই গাড়ী চালিয়ে এসেচি—তবে ক্লীনার ছিল, আর একজন বেয়ারা ছিল--বাবুরা কোথাও বেড়াতে গেছেন, বোধ হয়! তাহলে ···তরুণী যতীশের পানে চাহিলেন। এ চাহনির সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া এমন মোহ ঝরিতেছিল যে, যতীশের সাধ্য কি, অফিসের কথা মনে করিয়া সরিয়া পড়ে! তা'ছাড়া এঁর পায়ের জখমও বেশ গুরুতর! তরুণী খোঁড়াইতেছেন!

যতীশ কহিল,—আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন, তাহলে যে ডাক্তার পাই···

তরুণী কহিলেন,—কিন্তু যাবেন কিসে? আপনার সাইক্‌ল্‌···তরুণী হাসিলেন।

ঠিক! সাইক্‌ল্‌টা সেইখানেই পড়িয়া আছে! আনা হয় নাই।

তরুণী কহিলেন,—সাইক্‌ল্‌ ঠিক আছে কি?

যতীশ কহিল,—ঠিক করে নেবো এখনি। ও ভারী মজবুত গাড়ী···বলিয়া আর তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া সে সরিয়া পড়িল। তার কপাল আর কপোল দুই তখন রীতিমত ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। খানিকটা হাঁটিয়া আসার পর মনে হইল, বেশ বাতাস বহিতেছে তো! বাঃ! বহিঃপ্রকৃতি বলিয়া যে-কিছু আছে, এতক্ষণ সে খেয়ালও যেন তার ছিল না!

বিশ মিনিটের মধ্যে ও-পাড়ার বিচক্ষণ ডাক্তার ধনবল্লভকে আনিয়া সে ডাক-বাংলায় হাজির করিয়া দিল। ধনবল্লভ পা দেখিয়া একটা ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, কহিলেন—ওষুধ তো সঙ্গে আনিনি!

তরুণী কহিলেন,—তার জন্য ভাববেন না···আমি গাড়ীতে বসে এখনি তো কলকাতায় ফিরচি··· সেইখানে গিয়ে যে ব্যবস্থা হয়, করবো···এই অবধি বলিয়া যতীশের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন—এঁর ফী?···

ধনবল্লভ কহিলেন,—ফীয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ো না, মা-লক্ষ্মী···আমরা পাড়া-গাঁয়ের লোক, মোটর চড়ে ডাক্তারী করি না তো, কাজেই পয়সার অত কদর জানি না।

তরুণী ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন, কহিলেন,—আমায় ক্ষমা করবেন। তবে professional man বুঝেই···

ধনবল্লভ কহিলেন,—কিছু না, কিছু না,—এটা মানুষের কর্ত্তব্য।

তা ছাড়া ওষুধ-পত্তর তো কিছুই দিলুম না। কি বলো ভায়া যতীশ…?

ভায়া-যতীশের বলিবার কিছু ছিল না! সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যেন পাথরের ষ্টাচু!

তরুণী কহিলেন,—দেখুন দিকি, আমার লোকগুলো কি বদ্…এ সময় কোথায় গিয়ে বসে রইলো!

যতীশ কহিল—একটু খুঁজে দেখি…

যতীশ বাহির হইয়া গেল। তবে তাকে বেশীদূর যাইতে হইল না। অদূরে এক পুকুরে নামিয়া দুজন লোক সালুক ফুল তুলিতেছিল লোক দুইটার বেশ-ভূষায় পাড়াগেঁয়ে ভাব নাই! ইহারাই…?

তাই বটে! যতীশ কহিল,—তোমরা কলকাতা থেকে আসচো তো ওঁর সঙ্গে…? মানে, ডাক-বাংলায় যে মোটর গাড়ী রয়েচে…

—জ্বী! বলিয়া দুজনেই সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

যতীশ কহিল,—শীগ্‌গির এসো…তোমাদের মনিবের পায়ে চোট্ লেগেচে…

লোক দুইটা ছুটিল; ছুটিবার সময় সালুক ফুলগুলা ফেলিয়া গেল। যতীশ সেগুলা কুড়াইয়া লইয়া ডাঁক-বাংলায় ফিরিল। তরুণী তখন কোনোমতে মোটরে উঠিয়া বসিয়াছেন। লোক দুইটা গাড়ীর হুড উঠাইতে ব্যস্ত। যতীশ ফুলগুলা লইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে তরুণী হাসিয়া কহিলেন,—বাঃ, বেশ তো…দেবেন আমায় ফুলগুলি?

যতীশ সানন্দে হাত বাড়াইয়া ফুলগুলা আগাইয়া ধরিল। তরুণী কহিলেন,—**In remembrance…!** বলিয়া তিনি হাসিলেন…সেই হাসি—যে-হাসির স্পর্শে সারা দুনিয়া তার দুঃখ ভুলিয়া আনন্দে দুলিয়া ওঠে!

সেল্‌ফ্‌-ষ্টার্ট গাড়ী। গাড়ীতে ষ্টার্ট দেওয়া হইল। তরুণী নিজের হাতখানি প্রসারিত করিয়া দিলেন,—যতীশ মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তরুণী কহিলেন,—অশেষ ধন্যবাদ···আপাততঃ তাহলে বিদায়। আজকের এ উপকার কখনো ভুলবো না···

গাড়ী চলিয়া গেল। এক ঝলক বাতাস, আর তার পিছনে খানিকটা ধূলা···

যতীশ যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতেছিল! স্বপ্ন টুটিতে তার খেয়াল হইল—অফিস আছে·· তাই তো!···হাতে রিষ্ট-ওয়াচ ছিল। চাহিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ···যে সময়টুকুকে নিমেষমাত্র বলিয়া মনে হইতেছিল, তাহা চকিত নিমেষ নয়, দশটা বাজিয়া গিয়াছে!···ইহারি মধ্যে দশটা?···ঘড়ি বন্ধ নয় তো? না—এই যে চলিতেছে! ফাষ্ট? তাই কি? সাইক্লে করিয়া সে দ্রুত ষ্টেশনে ছুটিল।

ঘড়ি ঠিক আছে। সাইক্‌ল্‌ রাখিবামাত্র সে শুনিল ষ্টেশনের ঘড়ি বাজিতেছে, এক, দুই, তিন, চার···বাজিয়াই চলিয়াছে, অবিরাম! সর্ব্বনাশ, দশটা! তাহা হইলে, যোগ করো আরো চব্বিশ মিনিট—অর্থাৎ প্রায় সাড়ে দশটা! আর বারো মিনিট পরে সেই ট্রেণ···যেটা কলিকাতায় পৌছিবে এগারোটা সাতচল্লিশ মিনিটে! এবং অফিসে পৌছিতে···আবার গিয়া ডেস্কে দেখিবে, সেই চিঠি·· সমস্ত অফিস-বাড়ীটা তার চোখের সামনে চাকার বেগে যেন ঘুরিতে লাগিল!··· মনিবের সেই বিদ্রূপ-ভরা কথা, সেই টিটকারী···তার ইচ্ছা হইল, ঐ ট্রেণের লাইনে বুক পাতিয়া পড়িয়া থাকে, আর ট্রেণ আসিয়া মড়-মড় শব্দে তার হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া বাক্য-যন্ত্রণার দায় হইতে তাকে চিরদিনের জন্য অব্যাহতি দেয়!···

ট্রেণ আসিল; কিন্তু তার তলায় না পড়িয়া একটা কামরার মধ্যে

উঠিয়া বসিয়া যতীশ আসিয়া বেলিয়াঘাটায় পৌঁছিল। সেখান হইতে ট্যাক্সি ধরিয়া অফিস!…অফিসে সেই পরেশ রায়ের কামরা!

কামরায় ঢুকিয়া যতীশ অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিল,—আবার দেরী করে ফেলেচি, স্যর!

কঠিন স্থির দৃষ্টিতে পরেশ রায় যতীশের পানে চাহিলেন। তাঁর কথা কহিবার পূর্ব্বেই যতীশ ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিবার বাসনায় কহিল,—আমার অত্যন্ত অনুশোচনা হচ্ছে…কিন্তু একটি মহিলা·· বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণী মহিলা…অত্যন্ত বিপন্ন হয়েছিলেন বলেই…

বাধা দিয়া পরেশ রায় কহিলেন,—ব্যস, যথেষ্ট হয়েচে। এমনি কথাই আমি শুনবো, ভেবেছিলুম। কেবলি হৃদয়-মাহাত্ম্যের পরিচয়! সাহিত্য-চর্চ্চা আমিও একটু-আধটু করে থাকি, যতীশবাবু…বিশেষ আমাদের এই বাঙলা সাহিত্য। ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস মাসিকে বেরোয়, জানি,—কিন্তু তারো শেষ আছে। আপনার এ ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসের মোদ্দা শেষ আর কোনোদিন দেখবো না! তাছাড়া বাংলা নাটক পঞ্চাঙ্কে শেষ হয়…আপনারো পঞ্চম অঙ্ক হলো আজ। এর পর ষষ্ঠাঙ্ক চলতে পারে না—কারণ, সংস্কৃত নাটকের সে রীতি বাংলাদেশে আজ অচল! পঞ্চম অঙ্কেই যবনিকা! তা, আমি বলেও রেখেছিলুম,—পঞ্চম অঙ্কেই এ নাটকের পরিসমাপ্তি! আপনার কৈফিয়তের আর দরকার হবে না। আজ ২৩শে জুন—জুনের বাকী ক'টা দিন থাকতে হয় থাকুন, যেতে ইচ্ছা হয় যেতে পারেন…জুনের পুরো মাহিনা, তাছাড়া জুলাইয়ের মাহিনাও ১লা জুলাই তারিখে পাবেন…। তবে ১লা জুলাই থেকে এ অফিসের সঙ্গে আপনার আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অন্যত্র চাকরি দেখতে পারেন। যান…

জবাব হইয়া গেল। যতীশ টলিতে টলিতে আপনার চেয়ারে আসিয়া বসিল। অফিসের মেঝেটা তার পায়ের তলায় দুলিতেছিল। সারা পৃথিবী বুঝি এই দোলে দুলিতে দুলিতে রসাতলে তলাইয়া যাইবে! যাক তলাইয়া·· যতীশ ভাবিল, তা বলিয়া চাকরির মায়ায় যদি তরুণীকে সে ও-ভাবে বিপন্ন রাখিয়া নির্ঝঞ্ঝাটে আসিয়া অফিসে চাকরি বজায় রাখিত তো আজ আর তার মর্ম্মদাহের সীমা থাকিত না! আইনের চোখে আজ তার অপরাধ যত বড়ই হোক, বিবেক তাকে বেকসুর খালাস দিবে। কি তুচ্ছ এই অফিস এই চাকরি, এই মনিব! আজ সে যে আনন্দ পাইয়াছে আর্ত্তের সেবায়,—সে আনন্দের কাছে দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিবার মত শক্তি তার বিলক্ষণ আছে!—কিন্তু, তাইতো · তরুণীর নাম-ঠিকানা কিছুই সে জানে না! জীবনের এই দীর্ঘ পথ কি ভাবে যে চলিতে হইবে—এ পথে আর কখনো তার দেখা মিলিবে কি না, কে জানে! . পথ বড় দীর্ঘ, এ পথে ভিড়ও বড় বেশী···মন তার বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। আজ যদি এখনি ছুটিয়া গিয়া সে সেই তরুণীকে বলিতে পারিত,—তোমায় আঘাত দিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, সে অপরাধের কত বড় প্রায়শ্চিত্ত করিলাম, তা'ও ছাখো···

কিন্তু এ-কথা বলিয়া লাভ? তরুণীর কাছে কিসের বা প্রত্যাশী সে···?

মনের কোণে তার প্রত্যাশার কোনো সন্ধান মিলিল না! না মিলিলেও মন বলিতে লাগিল, আহা, আর একটু সঙ্গ,·· সে মুখের আর দুটো প্রসন্ন বাণী·· স্বতঃ-উৎসারিত ঝর্ণার তানের মত সেই স্বর-লহরী···

তিনি থাকেন কলিকাতায়—কলিকাতা হইতে বারুইপুরে গিয়াছিলেন। কেন? এত দেশ থাকিতে ঐ বারুইপুরে···? আর

ও-ভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়া—ষ্টীম-রোলার, আইলের সরু পথ, গোরুর দলে সেই অকস্মাৎ ভীতি···সবগুলা মিলিয়া কেমন যেন একটা শৃঙ্খল রচিয়া রাখিতেছিল···কিন্তু সে গরীব কেরাণী মাত্র! তা'ও আজ সে-কেরাণীগিরিতে জবাব হইয়া গিয়াছে·· আর তরুণী? আকাশের চাঁদ···'গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা!' কবি ঠিক কথা লিখিয়াছেন···! সে এ কি দুরাশার স্বপ্ন দেখিতেছে! ওরে ভিখারী, কি স্পর্দ্ধার বশে তুই বাদশাহী মশনদের পানে তাকাইতে চাস্! ওরে মূঢ়, ওরে নির্ব্বোধ, ওরে হতভাগ্য·· তরুণ বয়সের এ কি তোর দুর্ম্মদ খেয়াল!·· জবাব পাকা! সম্মুখে বিপদের ঘন অন্ধকার,—তবু আকাশের সেই পাখীর গান, স্নিগ্ধ রৌদ্র, পুকুরের কালো জল, সেই মেঠো পথ, আর তরুণীর সেই মিষ্ট কথা, মিষ্ট হাসি মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া উঠিতেছিল, তাই···নহিলে ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তার তাড়নায় যতীশ চলন্ত বাসের সম্মুখে গিয়া শুইয়া পড়িত, কি, গঙ্গার জলে গিয়া ডুব দিত,—তার বিধাতাও বুঝি তেমন কিছু আশঙ্কা করিয়া থ হইয়া যাইতেন!···

আর ক'টা দিন মাত্র। হাতীর দাঁত, আর পরেশ রায়ের বাত্··· এর মধ্যে কালোর কারচুপি নাই।

মঙ্গলবারে ভারী মন লইয়া যতীশ অফিসে আসিল। দেরী হয় নাই। দেরী করিয়া দিবার জন্য আজ কোনো তরুণী মোটর ছাড়িয়া আইলের পথে নামেন নাই! ভীত-ত্রস্ত পল্লী-গাভীর দলও···ষ্টেশনে আসিতে একটা গাভীরও দেখা মিলে নাই! তবে কি কালিকার সে ব্যাপার স্বপ্ন? না। বাইসিক্লের মোচড়ানো হ্যাণ্ডেলটা যতীশকে বারবার সচেতন করিয়া দিতেছিল, সে স্বপ্ন নয়, স্বপ্ন নয়·· সত্য—তবে অতি-কোমল সত্য, এই যা!

আর তার সঙ্গে একটা অতি-কঠিন সত্য এই—চাকরিতে তার জবাব হইয়া গিয়াছে ! মন বেদনায় লুটাইয়া পড়িল।

বেলা বারোটা। লেজার খুলিয়া যতীশ কি-একটা অঙ্ক মিলাইতেছিল, জগা চাপরাশি আসিয়া জানাইল, হুজুরের তলব !

মনের সংস্কার ! এ-আহ্বানে যতীশ একবার চমকাইল ; পর-ক্ষণেই আরাম পাইয়া ভাবিল, আজ তো লেট্ নয়—কিসের ভয় তবে ! হয়তো···

মনিব পরেশ রায় কহিলেন,—তোমার কালকের দেরীর কারণটা আনুপূর্ব্বিক শোনা হয়নি, যতীশ। কাহিনীটায় একটু আর্টিষ্টিক্ টচ্ দিতে যাচ্ছিলে তুমি, আমি থামিয়ে দিয়েছিলুম·· না ? তা···

যতীশের বিরক্তি ধরিল। মনের একটা অতি-কোমল বৃত্তি লইয়া এ-ভাবে বিদ্রূপ ! বিশেষ একজন ভদ্র মহিলার প্রসঙ্গ ধরিয়া···! তবু উনি মনিব·· আর সে···ওঁরই মাহিনা-ভোগী দীন কর্ম্মচারী মাত্র! তা বলিয়া···

পরেশ রায় হাসিয়া কহিলেন,—একটি তরুণী মহিলাকে কি বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলে না ?

যতীশ কহিল,—হাঁ।

পরেশ রায় কহিলেন,—ঘটনাটা শুনি···পরেশ রায় আগ্রহের ভরে যতীশের পানে চাহিলেন।

যতীশ কোনো অলঙ্কার যোজনা না করিয়া সরলভাবে কাহিনীটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। তার নিজের মনে যে-সব ভাবের উদয় হইয়াছিল, সে-সবের উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না ; উল্লেখও সে করিল না ! বৃত্তান্ত শুনিয়া পরেশ রায় মৃদু হাস্য করিলেন, এবং সহাস কণ্ঠেই কহিলেন,—সে মহিলাটি বেবি-অষ্টিন্ কার্ হাঁকিয়ে চলে গেলেন ? নিজে হাঁকিয়ে···?

যতীশ কহিল,—হাঁ।

পরেশ রায় কহিলেন,—খুব সম্ভ্রান্ত মহিলা…?

যতীশ কহিল,—চেহারায়, আচরণে, সকল দিক দিয়েই খুব সম্ভ্রান্ত।

—হুঁ! বলিয়া পরেশ রায় চুপ করিলেন। পরক্ষণেই কহিলেন,—কাদের বাড়ীর মেয়ে?

যতীশ কহিল,—তা বলতে পারি না।

পরেশ রায় কহিলেন,—পরিচয় নাও নি? আশ্চর্য্য! তাঁর পায়ে জখম হলো·· তার পর তাঁর খবর নেওয়াটাও তো একবার দরকার ছিল—কারণ সে তোমার কর্ত্তব্য। নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করোনি?

যতীশ কহিল,—আজ্ঞে না…

পরেশ রায় কহিলেন,—কারণ?

যতীশ কহিল,—নিজের অপরাধের বেদনা মনে তখন এমন প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, পরিচয় নেবার স্পর্দ্ধা হয় নি…

—বটে! বলিয়া পরেশ রায় আবার চুপ করিলেন,—তার পর টেবিলের উপর হইতে একটা কাগজ টানিয়া তার উপর চক্ষু রাখিয়া কহিলেন,—আচ্ছা…তা নোটিশ যখন হয়ে গেছে, তখন তার নড়চড় হতে পারে না! তবে আশ্চর্য্য এর মধ্যে এই যে, অফিসে এত ছোকৃরা কাজ করচে, তাদের কারো জীবনে পরোপকারের এমন সুযোগ মোটে ঘটে না, আর তোমারি ভাগ্যে কি যত…তা, আমি যে এ-সব অবিশ্বাস করচি, তা নয়—তবু…অর্থাৎ, তা—বেশ, অন্যত্র চাকরি করতে হলে আমার কাছ থেকে কোনো সার্টিফিকেট যদি চাও তো বলো, দেবো—a really good testimonial that ought to count for something. আর অন্যত্র চাকরি নেবার ঠিকঠাক কিছু হলে পারো

তো আমায় একবার জানিয়ো—I should likc to hear about it. তা এসো এখন।

যতীশ চলিয়া আসিল। এত দুঃখে তার হাসিও একটু পাইল এই ভাবিয়া যে, প্রভুর মন একটু যেন নরম হইয়াছে, তবে, গোঁ নাকি ছাড়িবার নয়,...তাই—না হইলে কি প্রয়োজন ছিল,এই বেলা বারোটায় তাকে ডাকিয়া কালিকার সে পুরানো কাহিনী শুনিবার !...

জবাবের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। মনের ভার বাড়িয়া চলিল। গৃহে মার কাছে, বোনের কাছে এ বিপদের কথা কি করিয়া সে বলিবে ? এতখানি নিশ্চিন্ত আরামে তাঁরা আছেন, তার মধ্যে কি করিয়া এত বড় দুঃসংবাদ...বাজের মতই যে তাঁদের বুকে বাজিবে।

শনিবার অত্যন্ত কাতর মন লইয়া অফিসে আসিয়া সে দেখে, টেবিলের উপর খামে একখানা চিঠি ; তারি নামে। খামখানার গায়ে বেশ বনিয়াদি ধনী-ঘরের ছাপ...নামটাও ইংরাজীতে পরিষ্কার ছাঁদে লেখা—মেয়েলি হাতের বলিয়া মনে হয়! দ্বিধার সহিত খাম ছিঁড়িয়া সে চিঠি বাহির করিল। তাই তো · এ যেন এক ঝলক দক্ষিণ বাতাস ...খাম খুলিতেই একরাশ ফোটা ফুলের খোশ্‌বু...! চিঠির তলায় নাম-সই...মীনাক্ষী দেবী। মীনাক্ষী দেবী—কে? চিঠিতে লেখা আছে—

মান্যবরেষু

সেদিনকার উপকার ভুলি নাই। আসিবার সময় পরিচয়ও দিয়া আসি নাই, সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন। পায়ের চোট বেশ গুরুতর হইয়াছিল। তবে ভগবানের আশীর্ব্বাদে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছি। তাই ধন্যবাদ দিবার এ তুচ্ছ প্রয়াস।

চেষ্টা করিয়া আপনার নাম ও অফিসের ঠিকানা সংগ্রহ করিয়াছি।

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। ডাক্তার বাবু আপনার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলেন; তাহা হইতে বারুইপুর ষ্টেশনে সন্ধান লওয়া হয়। অফিসের ঠিকানায় পত্র লিখিবার কারণ, শীঘ্র পাইবেন, তাই···

যাহা হৌক, আমারি বে-হুঁসিয়ারীতে আপনার গাড়ীখানি জখম হইয়াছে। সেজন্য ক্ষমা চাহিতেছি। আপনার করুণার কথা আমার বাপ-মার কাছে বলিয়াছি। তাঁরা আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

যদি অসুবিধা না হয় তো কাল শনিবার অফিসের ছুটীর পর আমাদের বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণে আসিলে কৃতার্থ হইব। আমার বাবা এবং মা-ও আপনাকে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছেন। আশা করি, আমাদের নিরাশ করিবেন না। ইতি

কৃতজ্ঞ-চিত্তা

মীনাক্ষী দেবী

এ যেন আরব্য-উপন্যাসের বিস্ময়-ভরা একটি কাহিনী! সঙ্গে সঙ্গে বিদুষী নারীর প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠিল। কি-বা সে করিয়াছে ···অথচ সেটুকুর জন্য কতখানি কৃতজ্ঞতা! পায়ে জুতা-মোজা-পরা, মোটর-চালানো বাঙালী মেয়েদের উপর তার কি ঘৃণাই না ছিল! বিলাস আর আমোদ লইয়াই এঁরা দিবারাত্র মত্ত থাকেন—দুনিয়ায় দুঃখী-গরীবের পানে ফিরিয়া চাওয়া তো দূরের কথা·· পায়ে-চলা গৃহস্থ পথিককে যেন তাঁরা মানুষ বলিয়াও মনে করেন না! নিজেদের সখ, হাসি-খুসী গল্প-গুজব, আর যারা গরীব তাদের প্রতি অসহ্য তাচ্ছল্য—দাম্ভিক জীব!···এই ছিল তার চিরদিনের বিশ্বাস আর সংস্কার! কিন্তু এই মীনাক্ষী দেবী···? যতীশ এত বড় অর্ব্বাচীন···না জানিয়া এই মহিলা জাতিটাকেই অপমান, অসম্ভ্রম করিয়া আসিয়াছে!·· পদে-পদে

ভুলের বোঝাই সে জড়ো করিয়াছে! অথচ নিজের মনে কি বিরাট্ দম্ভ, যেন তার মত বিবেচনা-বোধ আর কাহারো নাই! যেন সে কত বড় ওস্তাদ, সবজান্তা···সব জানিয়া-শুনিয়া দুনিয়ার প্রত্যেক জীবের প্রত্যেক ব্যাপারের বিচার করিবার কি স্পর্দ্ধাই না সে বুকে বহিয়া আসিতেছে, এতদিন!···হারে মূঢ়!

চকিতে তার মনে পড়িল, আজ ২৮শে জুন। কাল-বাদে পরশু ৩০শে। তার পরই এখানকার সঙ্গে সব সম্পর্ক ফুরাইবে! এই চিঠিখানি কি আনন্দ বহিয়া আনিয়াছে·· কিন্তু দু'দিন বাদে ৩০ তারিখে যে-বিপদ আসন্ন, তার ভারে বুক যে টন্-টন্ করিতেছে! তবু যা হয় হইবে, আজিকার এ আনন্দ-মিলনের মাঝখানে সে দুশ্চিন্তা টানিয়া আনিয়া বিঘ্ন-ব্যথার সৃষ্টি করা ঠিক নয়!

ঠিকানা? চিঠির উপরে এই যে নীল হরফে বাঙলায় ছাপা,—কুঞ্জ কুটীর। ৭৪ নং গড়িয়া হাট রোড, বালিগঞ্জ।

বালিগঞ্জ! ঠিক হইয়াছে! সেইখান হইতেই বালিগঞ্জ ষ্টেশনে গিয়া সে ট্রেণে উঠিবে। কিন্তু এই পোষাক! উপায় কি? সে যে গরীব, এ কথা গোপন করিতে সে চাহে না তো! গরীব হোক—তবু মানুষ তো সে! তবে···?

বারোটার পর পরেশ রায়ের ঘরে সহসা তলব পড়িল। পরেশ রায় কহিলেন,— আজ তো ২৮শে। কোনো কাজের জোগাড় হলো যতীশ?

যতীশ সবিনয়ে কহিল,—আজ্ঞে না।

পরেশ রায় কহিলেন,—বড় দুঃখের কথা তো তা'হলে! তা' জুলাই মাসের মাহিনাটা এখান থেকে পুরা পাবে—জুলাইয়ে একটা জোগাড় করে ফ্যালো!···ভালো কথা, তোমার ছোট ভাইটি এখন ভালো আছে বেশ?

যতীক কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পরেশ রায় কহিলেন,—সে বারুইপুরের স্কুলেই পড়চে?

ঘাড় নাড়িয়া যতীশ জানাইল, হাঁ। তারপর কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া ধাঁ করিয়া সে একেবারে বলিয়া ফেলিল,—এ হপ্তায় আমার একদিনও লেট্ হয়নি···আমায় আর একবার সুযোগ দিতে পারেন না দয়া করে?·· মানে···

পরেশ রায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যতীশের পানে চাহিলেন।

যতীশ কহিল—মানে, আমার মা এখনো এ খপর জানেন না··· তিনি এ খপর পেলে···যতীশের চোখে জল ঠেলিয়া আসিল; কথাটা সে আর শেষ করিতে পারিল না।

মুখখানা ঈষৎ বিকৃত করিয়া পরেশ রায় কহিলেন—জানোই তো, তোমাদের কবি রবির কথায় বলতে গেলে একটু উল্টে বলতে হয়, অমোঘ আমার দণ্ড, কঠিন বিধান···! তাছাড়া তোমার কাজে এক জনকে আমি ইতিমধ্যে বাহাল করে ফেলেচি···লোকটি ভালো। সে পয়লা থেকে জয়েন করবে!

বড়-মুখ করিয়াই যতীশ মিনতি জানাইয়াছিল। বড় আশায় বড় আঘাত পাইয়া মুখ তার এতটুকু হইয়া গেল! পরেশ রায় কহিলেন,—আচ্ছা। তা ৩০ তারিখে দেখবো ভেবে, তোমায় অন্য কোনো জানা অফিসে পাঠানো যায় কি না·· এখন যাও। আমি আজ একটু সকাল সকাল চলে যাচ্ছি—কাজেই একটু ব্যস্ত আছি···

যতীশ চলিয়া আসিল; আসিয়া নিজের চেয়ারে বহুক্ষণ চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল। সত্যই তো···আর দুটো দিন! তারপর ··মাকে নয় এখন কিছু বলিবে না।···আর একটা চাকরির জোগাড় হইলে তখন বলা চলিতে পারে! কিন্তু চাকরি তো গাছের ফল নয় যে,

ইচ্ছামত পাড়িয়া আয়ত্ত করিয়া লইবে! কত বেকার কি মিথ্যা আশা লইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছে, আর তার এমন কি ভাগ্য হইবে যে···

যতীশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ভাগ্যই যদি তেমন হইবে, তাহা হইলে কি আর এত বড় ইজ্জতের চাকরি এভাবে হস্তস্খলিত হয়!

পাচটায় অফিসের ছুটী। ছুটীর পর যতীশ বেড়াইতে বেড়াইতে এসপ্লানেডে আসিয়া কার্জ্জন পার্কে গিয়া ঢুকিল। অফিস ফেরত বাবুর দল, সাহেবের দল ট্রামে চড়িয়া মোটরে চড়িয়া গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে, —কি স্বচ্ছন্দ লঘু মন! সে?···মিছা ভাবা! ভাবিয়া যে-সমস্যার মীমাংসা হয় না, হইবার নয়, সে ভাবনায় ফল! তার চেয়ে যাওয়া যাক্ বালিগঞ্জে··! সেই হাসি, সেই মিষ্ট আলাপ,·· বুকটা কতক হাল্কা থাকিবে তবু! এ দুর্ভাবনা যে বুকে ক্রমেই ভারী পাথরের মত চাপিয়া বসিতেছে! যতীশ গিয়া ট্রামে চাপিল। মনোহরপুকুরের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিয়া সে পূর্ব্বমুখে চলিল। দীর্ঘ পথ·· গাছের ছায়ায় ছায়া-করা, স্নিগ্ধ! তেমন ভিড় নাই। চলিয়া চলিয়া বালিগঞ্জের ধারে সে আসিয়া পৌছিল···

গড়িয়া হাট রোড? এই যে, সামনেই! কিন্তু ৭৪ নং বাড়ীটা ·· কোন্‌দিকে···? এধার ওধার ঘুরিয়া সে দক্ষিণে ফিরিল। মাঠ ফুঁড়িয়া, বাগান ছিঁড়িয়া, কত বাড়ী-ঘর ভাঙ্গিয়া চারিদিকে নূতন নূতন রাস্তা বাহির হইয়াছে · মুক্ত প্রান্তরে সহর যেন দশ হাত মেলিয়া শুইয়া প্রচুর আলোয়, প্রচুর হাওয়ায় প্রচুর আরাম উপভোগ করিতেছে!···

এই পথ ধরিয়া যতীশ অনেকখানি আগাইয়া চলিল। অদূরে রেল-লাইন,—এবং রেল-লাইনের বেড়ার এধারে পথের বাঁ-দিকে সদ্য-নূতন-তৈয়ারী বাড়ীর ফটক। ফটকের পর ফুলের বাগান—অজস্র রঙীন ফুলে ভরা। ফটকের একধারে কালো পাথরের গায়ে সোনালি হরফে লেখা,—কুঞ্জ কুটীর।

এই বাড়ী! যতীশের বুকটা একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল! এখন বেকুবের মত এই প্রাসাদের কোন্‌খানে গিয়া সে দাঁড়াইবে!···

ফটকের ভিতরে সেই ছোট্ট মোটর গাড়ীখানি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! তার নম্বরটা···ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া যতীশ বার বার পড়িতে লাগিল, 18604. গাড়ীর কাছে জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই! ভিতরে সে ঢুকিবে? কিন্তু দুই পা যে থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে!

হঠাৎ প্রকাণ্ড এক ভারী সাদা পাগড়ী মাথায় উড়ে বেয়ারা আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল,—সাহেবের কাছে এসেচেন আপনি? তা, সাহেব তো বেরিয়েচেন·· ভিতরে বসবেন?

যতীশ কি জবাব দিবে? সাহেব···? কিন্তু কোনো সাহেবের কাছে সে আসে নাই তো! সে আসিয়াছে, মীনাক্ষী দেবীর নিমন্ত্রণে! তা · এদিকে বেয়ারা দাঁড়াইয়া আছে, তাকে একটা জবাব দেওয়া চাই···বেহারাটা কি যে ভাবিতেছে!···যতীশ কহিল,—মীনাক্ষী দেবী ·· মানে, আমায় তিনি এখানে আসতে বলেছিলেন কি না·· এইটুকু বলিয়াই সে পকেট হইতে মীনাক্ষী দেবীর পত্র বাহির করিল এবং খামে-মোড়া পত্রখানা বেয়ারাকে দেখাইয়া আবার কহিল,—এই তো কুঞ্জ কুটীর···ঠিকই···তা···

বেয়ারা কহিল,—ওঃ, দিদিমণি···তা, আসুন, দিদিমণি বাড়ী আছেন···

এ সমাজের সঙ্গে যতীশের কোনো দিনই কোনো পরিচয় নাই! ইহাদের লোক-জনের সঙ্গে কথা কহিবার রীতিও যে স্বতন্ত্র, আজ এখন তা সে প্রথম বুঝিল। আদব-কায়দায় কোথায় কি ত্রুটি হইবে···এগুলা শিক্ষা করা যে ভারী দরকার···বি-এ পাশ করার মতই! এই যে, বাড়ীর মালিক সাহেব জানেন না— অথচ দিদিমণির নিমন্ত্রণে সে আসিয়া হাজির হইয়াছে···তাই তো···কোনো গোল বাধিবে না তো? কাশিয়া গলা সাফ করিয়া লইয়া সে বলিল,—তোমার দিদিমণির পায়ে সেই চোট্ লেগেছিল না·? সেই যে সেদিন মোটরে বেরিয়েছিলেন···বারুইপুরের ওদিকে ·· মানে···অর্থাৎ···

সে নিজেই বুঝিতেছিল, একটা তুচ্ছ উড়ে বেয়ারা···ইহার সঙ্গে কথা কহিতেই তার পদে পদে এমন বাধিতেছে···সহসা সে এমন জানোয়ার বনিয়া উঠিল · অথচ খোদ মালিক যিনি···

—ওঃ! বলিয়া বেয়ারা কহিল,—আপনি সেখানে ছিলেন, বুঝি!···বেয়ারার কৃষ্ণ অধরপ্রান্তে দন্তরুচিকৌমুদী বিকশিত হইল! বিচিত্র তার শোভা!

উড়িয়া হইলেও বিলাত-ফেরতের বাড়ীর বেয়ারা সে, কাজেই চালাক তো! সব খপরই সে জানে। যতীশ কহিল,—হ্যাঁ, তাই তোমাদের দিদিমণি, মানে···

—আসুন। বলিয়া বেয়ারা অভ্যর্থনা করিল। যতীশ ফটকের মধ্যে পা দিল,—অতিশয় সঙ্কোচে! কয়েক পা অগ্রসর হইতেই একটা স্বর তার কাণে গেল—এই যে আপনি এসেচেন! বয়···

—হুজুর।

অলক্ষিতে স্বর-কাকলী ভাসিয়া উঠিল। এ যেন রূপ-কথায়-পড়া

সেই স্বপ্নপুরীর মতই ! সে-গল্পের নায়ক যেমন মায়াপুরীর মধ্যে পা দিবামাত্র অন্তরীক্ষে পাখীর গান ভাসিয়া উঠিয়াছিল, এ-ও ঠিক সেই রকম ! যতীশ ভড়কাইয়া গেল—কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র ! পরক্ষণেই ক্ষিপ্র পায়ে সেই তরুণী স্বয়ং আসিয়া হাসির ধারায় তাকে অভিবাদন করিলেন ! তরুণী কহিলেন,—আমি জানতুম, আপনি আসবেন ! তা আসুন···

যতীশ বিবশ, বিহ্বল ! এ স্বপ্ন, না মায়া ? না···

যতীশ তরুণীর সহিত আসিয়া এক সজ্জিত কামরায় বসিল। কি তার সজ্জা ! মোটা চিত্র-বিচিত্র-করা কার্পেটে ঘরের মেঝে আগাগোড়া মোড়া। তার পথে-চলা কাদামাখা জুতাজোড়া লইয়া এ কার্পেটের উপর·· তাইতো, এ যে মহাবিপদে পড়া গেল ! কিন্তু ভাবিয়া জুতা-জোড়ার গতি করার আর অবসর মিলিল না, কাজেই···

তরুণী কহিলেন,—আপনি অবাক্ হয়ে গেছলেন আমার চিঠি পেয়ে···না ? সত্যি, বলুন তো ! তা দেখুন, আমি নেহাৎ অকৃতজ্ঞ নই। কিন্তু আপনি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন তো·· লোকটার পাখানা গেল কি রইলো, তার কোনো খোঁজ নিলেন না·· বেশ মজার তো ! কথার পরে সেই হাসির ঝর্ণাধারা !

কিন্তু যতীশ নিশ্চিন্ত ছিল কি ? এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও এই তরুণীর চিন্তাই যে তাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে ! কিন্তু সে-কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে কেমন যেন বাধিতেছিল ! তরুণীর আবার সেই এক কথা···এবারে যতীশ কহিল,—আজ্ঞে না, ক'দিন আমার ভারী ভাবনায় কেটেচে ! আমার দোষে আপনার পায়ে চোট্ লাগলো, অথচ নাম-ঠিকানা কিছুই জানিনা···আমি বহু সন্ধান করে-ছিলুম···

তরুণী কহিলেন,—তাহলে তো আপনার কাজের ক্ষতি হয়েচে অনেকখানি…

যতীশ চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তরুণীর চোখে হাসির সেই বিদ্যুৎ! যতীশ মৃদু হাসিয়া কহিল,—আমার সে-চাকরিতে জবাব হয়ে গেছে।

তরুণী বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে যতীশের পানে চাহিয়া কহিলেন,—আমার সন্ধান করে বেড়ানোর জন্য, এঁ্যা…? বলেন কি!

যতীশ কহিল,—না। মানে, তা ঠিক নয়…তবে ‥

তরুণী কহিল,—দেখুন তো, আমি তো মহা অপরাধ করেচি তাহলে…

যতীশ কহিল,—আজ্ঞে না—তা নয়…অর্থাৎ আমার আর ও চাকরি পোষাচ্ছিল না…

তরুণী কহিলেন,—তবে বুঝি আর-কোথাও ভালো চাকরি পেয়েচেন…?

যতীশ কহিল,—তা ঠিক পাইনি বটে, তবে ‥মানে, এক রকম সে পাওয়াই বটে!

তরুণী কহিলেন,—আচ্ছা দেখুন, আমার বাবা একজন লোক খুঁজছিলেন, খুব দায়িত্বপূর্ণ এক কাজের জন্য—আমি তাই ভাবছিলুম… তা বাবাকে আপনার কথা বলবো? আপনি আমায় সেদিন যে-রকম বাঁচিয়েছিলেন—আপনি না থাকলে খোঁড়া পায়ে সেই মাঠেই হয়তো পড়ে থাকতুম…কি যে হতো, জানি না! ভাবতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! তা, বাবাও তো সে-কথা শুনেচেন…আমি বললে বাবা নিশ্চয়…

যতীশ কহিল,—কিন্তু আমার কি সে কাজের কোনো যোগ্যতা আছে যে…

তরুণী কহিলেন,—বাবার সঙ্গে সে-সম্বন্ধে কথা কবেন একবার? তা হলে খুব ভালো হয় কিন্তু…

তা যে হয় সে-সম্বন্ধে যতীশের মনেও তিলমাত্র সন্দেহ ছিল না। এই তরুণীর স্নেহ-প্রীতির পরশ পাইয়া… তাঁর এই হাসির আলোর পাশটিতে…আঃ!

হঠাৎ বাহিরে একটা মোটর আসিয়া থামিল। তরুণী কহিলেন,—বাবা এসেচে

যতীশের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—এবং আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইবার পূর্ব্বে তার বুকে তীব্রতর স্পন্দন জাগাইয়া সে-ঘরে প্রবেশ করিলেন…পরেশ রায় এবং তাঁর সঙ্গে এক প্রৌঢ়া মহিলা।

পরেশ রায় কহিলেন,—হ্যালো যতীশ ··তুমি!…এখানে…? কি, testimonial নিতে…? তা…

পৃথিবীটা বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিয়া উঠিল। যতীশও সেই সঙ্গে… দেওয়াল, ছবি, সোফা, চেয়ার সমস্তই সেই ঘূর্ণির চক্রে ঘুরিতেছিল! পৃথিবীর কি নেশা লাগিয়া গেল নাকি? যতীশ হতভম্ব!

পরেশ রায় কহিলেন,—মীনা·· যতীশকে তুমি চেনো ?

কথাটা যেন কোন্ বহুদূরের স্বপ্নলোক হইতে ভাসিয়া আসিল, তবে যতীশের কাণে তা পৌঁছিল! সঙ্গে সঙ্গে তরুণীর জবাবটুকুও!

পরেশ রায় কহিলেন,—তোমার উপর আমার লক্ষ্য যেদিন প্রথম তুমি চাকরির দরখাস্ত নিয়ে আমার কাছে আসো, সেই দিন থেকেই। দরখাস্তে তোমার পিতৃ-পরিচয় তুমি দিয়েছিলে…জগদীশ সেনের ছেলে তুমি! জগদীশ আর আমি এক স্কুলে পড়েচি এক সঙ্গে—নাইন্‌থ ক্লাশ থেকে এন্‌ট্রান্স ক্লাশ অবধি! তার পর আমি বিলাত

গেলুম ব্যবসা শিখতে,—আর সে গেল মফঃস্বলে স্কুল-মাষ্টারী করতে! জীবনে দুজনের আর দেখা হয় নি! তার পর হঠাৎ তুমি এলে…বারুই-পুরে বাড়ী, বাপ গবর্ণমেণ্ট স্কুলের টীচার ছিলেন, ঐ নাম। তার উপর, তোমার মুখে তার ছায়া, আশ্চর্য্য মিল! বুঝলুম, আমার বাল্যবন্ধু জগদীশেরই ছেলে যতীশ! চাকরি তুমি অনায়াসে পেলে,—কিন্তু আসল কারণ জানলে না…জগদীশের ছেলে তুমি, এর চেয়ে বড় প্রশংসাপত্র আর কারো ছিল না তো! তোমার উপর নজর রাখলুম। তোমার বুদ্ধি দেখে আমি খুশীও হলুম…অল্প দিনের মধ্যে তোমায় একটা ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা করে দিলুম…তোমার সে যোগ্যতাও ছিল—তা ছাড়া জগদীশের ছেলে তুমি,·· এই জন্য! আরো প্ল্যান আমার মাথায় জাগ্‌ছিল · ভগবানও তাতে সায় দিলেন! আমার এই মেয়েটি ভারী খেয়ালী ··মোটর চালাতে শেখার বাতিক খুব। মানা করলুম,—বাঙালীর মেয়ে…কাকে, কোন্ দিন চাপা দিয়ে কি কোর্টে দাঁড়াবি? তা শুনলেন না…কত কান্নাকাটি, মান-অভিমান! বললুম, শেখো তবে। শিখলেন—আর ঐ মোটর হাঁকিয়ে লম্বা পাড়ি দেওয়া হলো ওঁর সকালের কাজ! পল্লী-দর্শন করচেন। তার পর সেদিনকার ঘটনা…ভাগ্যে তুমি ছিলে। চাকরির মায়া ছেড়ে হৃদয়-মাহাত্ম্য-চর্চ্চার দিকে ঝোঁক তোমার বেশী…অফিস থেকে ফিরে সোমবার মীনার কাছে সব শুনলুম…সে বললে, ভদ্রলোকটির নাম যতীশ…অবাক্ হয়ে গেলুম…তুমিও অফিসে বলেছিলে, এক সম্ভ্রান্ত মহিলার বিপদের কথা! তখন ভাবিনি, সে মহিলা মীনা, আর মীনাকে সে-বিপদে রক্ষা করেচো তুমি! তাই পরের দিন আবার তোমায় ডেকে কথাটা পাড়ি, মনে আছে? সেটা অহেতুক কৌতূহল-পরিতৃপ্তি মাত্র নয়… তার পর আজ এই চায়ের নিমন্ত্রণ…গিন্নীর সঙ্গে তোমার পরিচয়

করিয়ে দেবো বলে।···তা-ছাড়া ১লা জুলাই থেকে তোমার চাকরি নেই, তারো একটা কিনারা করা চাই তো!···

এই অবধি বলিয়া পরেশ রায় তাঁর পার্শ্ববর্ত্তিনী মহিলার পানে চাহিলেন, চাহিয়া কহিলেন,—এই ছেলেটিই যতীশ,—এরই কথা তোমায় বলতুম, হিরণ···আমার প্ল্যানে বিধাতারো যে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, তা মীনার সোমবার সে-বিপদে পড়া, আর তা থেকে ও-ভাবে উদ্ধার পাওয়ার ব্যাপারেই বেশ বোঝা যাচ্ছে···নয়? কি বলো··· তোমার কি মত?

মহিলাটি—অর্থাৎ শ্রীমতী হিরণবালা দেবী কহিলেন,—তোমার মতেই আমার মত···!

যতীশের সর্ব্বাঙ্গ তখন ঘামিয়া উঠিয়াছে! ফ্যানের প্রচুর হাওয়া, তা সত্ত্বেও! তার কথা কহিবার বা নড়িবার শক্তি পর্য্যন্ত অন্তর্হিত!

পরেশ রায় কহিলেন,—কাল তোমার মার সঙ্গেও দেখা করবো··· অর্থাৎ আমার মত কি, জানো যতীশ···? এই দুরন্ত মেয়েটিকে তোমার হাতে দিয়ে তোমায় দায়িত্ব-বোধ শেখাতে চাই! আর আমার হাতে নতুন একটি অফিস এসেছে—সেটা তোমার চার্জ্জে রাখতে চাই···মাহিনা বেশ···তবে পাঁচ-ছ মাস পরে একবার বিলেতটাও ঘুরে আসতে হবে··· তোমার মার কি অমত হবে তাতে?···মীনা···

আর মীনা! তার মচ্‌কানো পা বেশ আরাম হইয়া গিয়াছে, তাছাড়া এই-সব কথাবার্ত্তা···তার কেমন লজ্জা হইতেছিল। ক্ষিপ্র গতিতে মীনাক্ষী দেবী সে-ঘর হইতে কোথায় তখন সরিয়া পড়িয়াছে! হাসিয়া পরেশ রায় কহিলেন,—আমার মীনার এতে আপত্তি নেই,— ভাবে, ভঙ্গীতে তার গর্ভধারিণীকেও সে-কথা সে এক রকম জানিয়েচে··· এখন তোমার মার মত, আর তোমার মত···

যতীশ নির্ব্বাক্! বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় সে পরেশ রায়ের পায়ের কাছে পড়িয়া তাঁকে প্রণাম করিল। বেকুব ছোকরা···রোমান্সের সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নাই! এমন গর্দ্দভও এ-কালে এই রোমান্সের আব্-হাওয়ার যুগে থাকে!

মুক্তি

বাপ-মায়ের আদরের মেয়ে আমি। বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর বিয়ে হলো। স্বামী দেখতে যেমন, গুণও তাঁর তেমনি! পয়সা-কড়ি বেশ আছে, তবে তিনি একা; সংসারে আত্মীয়-স্বজন তেমন-কেউ নেই।

ফুল-শয্যার রাত্রে আমার ব্যবহারটা তাঁর অত্যন্ত রূঢ় ঠেকেছিল, সেটা বেশ বুঝতে পেরেছিলুম। তিনি যখন আদর করে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন,—কনক, এই শূন্য সংসারটিকে সব দিক দিয়ে তুমি পূর্ণ করে তোলো—তখন সে-কথা শুনে কোনোমতে আমি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখতে পারলুম না। আমার সমস্ত অতীত বুকের উপর এমন পাষাণ-ভার চেপে ধরলে যে, সহস্র চেষ্টাতেও আমার মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুল না। দুনিয়াকে তখন এমন বিশ্রী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছিলুম যে, আমার স্বামী, আমার দেবতা,—তাঁর এই মধুর আদর-টুকুকে বুকের মধ্যে ইষ্টমন্ত্রের মত গ্রহণ করতে পারলুম না—এমনি অভাগী আমি! স্বামী আমায় বললেন,—কনক, আমি অত্যন্ত লক্ষ্মীছাড়া, যখন খুব ছোট, তখন মা-বাপ দু-ই হারিয়েছি। আরাম পাবো বলে সংসার পেতে বসবো, এ-কথা কোনোদিন আমার মনে হয় নি। লোকের কথায় একটা অত্যন্ত হাল্কা কৌতূহল নিয়েই তোমায় দেখতে গেছলুম। দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম, তাই স্বার্থপর আমি তোমায় এই শ্মশানে এনে প্রতিষ্ঠা করেছি। লক্ষ্মী তুমি, তোমার রূপ আর লাবণ্যের জ্যোৎস্নায় এ শ্মশানে আলো জাগিয়ে তোলো, তোমার প্রেমের স্নিগ্ধ কোমল সৌরভে চারিধার ভরপুর করে দাও, আমি মুগ্ধ হয়ে তাই দেখি।

রূপ আর লাবণ্য! পুরুষ কি এই দুটোকেই চিনেছে শুধু রে! নারীর এই যে মন—ওগো, সেই মনটাকে কেন তোমরা অবহেলা করো? কি তুচ্ছ রূপ আর লাবণ্যের কথা তোলো,—শুনে আমাদের লজ্জা হয়! সে তো দেহের উপর একটা পালিশ মাত্র, রোগে তা ঝরে যায়, একটু তাপেই তা ম্লান হয়ে পড়ে! কিন্তু এই মন? এ যে রাজার ঐশ্বর্য্যের চেয়েও ঢের দামী, ঢের বেশী যে তার শোভা!

স্বামীকে মুগ্ধ করবার মত রূপ আর লাবণ্য আমার অঙ্গে প্রচুর ছিল, আমি তা জানতুম,—তাই তার উল্লেখে একটুও গলে গেলুম না! স্বামী মুগ্ধ চিত্তে মুখে চুম্বন করলেন; আমি পাথরে-গড়া মূর্ত্তির মতই অচঞ্চল বসে রইলুম। স্বামী যেন একটু ব্যথিত হলেন, বুঝলুম,—একটা নিশ্বাস চেপে তিনি বললেন,—শুয়ে পড়ো।

... ...

আমায় সুখে রাখবার জন্ম স্বামীর সে কি চেষ্টা পড়ে গেল! দাসী-চাকরের উপর ঘন-ঘন নিয়ম জারী হতে লাগলো,—নিজেও তিনি তদ্বিরের ঘটা বাধিয়ে দিলেন। তাঁর উপর দামী গহনায় আমার সর্ব্বাঙ্গ তিনি মুড়ে ফেললেন,—হীরে-পান্না-চুনি-মুক্তোর ভারে আমি নুয়ে পড়লুম! পাথরের মেজেয় চলে বেড়ালে পাছে পায়ে ব্যথা লাগে, তাই অর্ডার দিয়ে পায়ের জন্ম জুতো-মোজা আনিয়ে দিলেন,—কোন্ কাপড়খানি, কোন্ জামাটি কখন্ পরলে আমাকে ভালো মানায়, হরেক রকম কাপড়-জামা আনিয়ে আমায় তা পরিয়ে ঠাউরে দেখে-দেখে কাপড়ে-ব্লাউসে তোরঙ্গ আমার ঠেসে ফেললেন। একটু যদি চুপ করে আকাশের পানে কখনো চেয়ে বসে থাকতুম, তো তিনি অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন, বলতেন,—তোমার মনটা একটু খারাপ দেখছি,—যাও, দুদিন তোমার বাবার ওখানে বেড়িয়ে এসোগে! সত্যি,

এত আদর আমি কখনো পাইনি! আমার লজ্জা হতো! আমি কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়তুম। কৃতজ্ঞতায় বুক আমার ভরে উঠ্‌তো, তবু একটু মুখের হাসি দিয়েও তাঁর কাছে সে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারতুম না, এ কি কম আপশোষ! অত আদরে প্রাণে আমার বেদনা বাজতো! কিন্তু উপায় ছিল না, উপায় ছিল না! আমার বুকের মধ্যে কি কাঁটা যে দিবারাত্রি খচ্‌খচ্‌ করছিল! আমি শুধু মর্ম্মে মর্ম্মে তাঁর সে ভালোবাসা অনুভব করতুম! আমার সমস্ত অতীত তখন নিষ্ঠুর ব্যাধের মত আমার বুকে অজস্র শর নিক্ষেপ করতো। তাই যখন স্বামীর সে আদরের আতিশয্যে আনন্দের উত্তেজনায় আমার অভিভূত মূর্চ্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়বার কথা, তখন সেই ব্যাধের তীক্ষ্ণ শরের বিষে ভিতরটা আমার জ্বলে খাক্‌ হয়ে উঠ্‌তো! আমি চুপ করে পড়ে থাকতুম! নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আস্‌তো,—চোখের সামনে থেকে সমস্ত পৃথিবী তার রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সব অনুভূতি নিয়ে কোথায় মিলিয়ে যেতো!

* * * *

এমনি করেই দিন কাটছিল। সেদিন বিজয়া-দশমী। সন্ধ্যার সময় আমি একখানা সাদা কাপড় পরে ঘরের কোণে কি একটা বই নিয়ে বসে ছিলুম। স্বামী ঘরে এলেন, পিছনে চাকর; চাকরের ঘাড়ে প্রকাণ্ড এক প্যাৎলা টিনের বাক্স। সেটা ঘরে রেখে চাকর চলে গেলে স্বামী বাক্সটা খুল্‌তে খুল্‌তে বললেন,—এতে তোমার কাপড় আছে, বোম্বাই থেকে আনিয়েছি, আর এই নাও, এক ছড়া হার। সুন্দর একছড়া মুক্তোর মালা। মালাটা নিজের হাতে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে স্বামী বললেন,—তোমার পছন্দ হয়েছে?

হাঁ-কি না, কোনো কথাই মুখ দিয়ে বেরুলো না। আমি শুধু

একবার তাঁর পানে চোখ তুলে চেয়ে দেখলুম—আহা, তাঁর চোখে-মুখে কি সে আগ্রহ! কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁর পানে চেয়ে থাকতেও পারলুম না—কে যেন মাথা আমার জোর করে ধরে নুইয়ে দিলে। তিনি কি বুঝলেন, জানি না,—শুধু ভারী রকমের একটা নিশ্বাস ফেলে চলে গেলেন। আমার সর্ব্বশরীরে কে যেন কাঁটার চাবুক মারতে লাগলো। ভিতরটা অসহ্য হাহাকারে ভরে উঠলো। আমি তখন সেই হারটিকে বুকের উপর মুঠি ভরে চেপে ধরে মেজেয় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম, ওগো দেবতা আমার, স্বামী আমার, এসো, এসো, তুমি ফিরে এসো। আমি তোমার এত আদর সহ্য করতে পারচি না। কেন তুমি এ অভাগীকে এমন করে আদর করো গো? তুমি জানো না, আমি যে মহাপাতকিনী, আমার পাপের সীমা নেই! আমি এখানে তোমার এই ঘরে বসে আছি, এতে আমার নিশ্বাসের হাওয়ায় তোমার ঘর বিষিয়ে উঠচে, পবিত্র মন্দির কলুষিত হচ্ছে! তোমায় যে এই ফিরিয়ে দিচ্ছি, ওগো, সে অহঙ্কারের জন্য নয়, তেজের জন্য নয়,—আমার আবার কিসের তেজ, কিসের অহঙ্কার! তা নয় গো, তা নয়!

ভাবলুম, না, সব কথাই বলবো! কিসের ভয়! অনর্থক আর এ কৃতজ্ঞতার ভার বাড়িয়ে তুলবো না! আমায় যদি ভিখারিণী হয়ে পথে দাঁড়াতে হয়, তাতেও ক্ষোভ নেই, কিন্তু তাঁর কোমল চিত্তে আর এমন আঘাত দেবো না, কখনো না!

উঠে ভাল করে চুল বাঁধলুম, সাবান মেখে গা ধুয়ে এলুম, স্বামীর-দেওয়া নতুন কাপড়খানি বাক্স থেকে বার করে পরলুম, বাছা-বাছা গহনায় গা সাজালুম, তারপর সুইচ্ টেনে দশ-বাতির ঝাড়টা জ্বেলে দিলুম। দিয়ে আয়নার সামনে একবার এসে দাঁড়ালুম—হাঁ, ঠিক!

আজ বিদায়ের পূর্ব্বে দেহের রূপকে ষোল কলায় ফুটিয়ে তুলে স্বামীর পায়ে পাপের ভার নামিয়ে দেবো! তারপর তাঁর পায়ের ধূলো সর্ব্বাঙ্গে মেখে যেদিকে দু'চোখ যায়, চলে যাব। গঙ্গায় অতল জল আছে, আশ্রয়ের অভাব কি!

রাত্রি তখন ন'টা। দাসী এসে বললে,—বাবু আজ গাড়ী করে তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাবেন বলেছিলেন না? তা সোফার দু'ঘণ্টা হলো, গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাই বাবু বলে দিলেন, তোর মাঠাকরুণকে জিজ্ঞেস করে আয়, গাড়ী চলে যাবে, না, তিনি বাগবাজারে বেড়িয়ে আসবেন?

বাগবাজারে আমার বাপের বাড়ী।

আমি বললুম,—তোর বাবু কোথায় রে?

দাসী বললে,—দোতলার বৈঠকখানায়।

—কিঁ করচেন?

—কেদারায় শুয়ে কি বই পড়চেন।

আমি বললুম,—কাছে আর-কেউ আছে?

—না।

আমি বললুম,—তোর বাবুকে একবার ডেকে দিতে পারিস্?

দাসী চলে গেল।

আমি মনটাকে বেঁধে নিলুম। সব কথা খুলে বলবো বলেই স্থির করেছিলুম—কিন্তু তবু সেই-সময়টা যখন একেবারে এত-নিকট হয়ে এলো, তখন বুকখানা কেঁপে উঠলো—তাইতো! এখনি যদি উনি তাড়িয়ে দেন? এত আদর, এত ভালোবাসা, এ যে জন্ম-জন্ম সাধনা করলেও কোনো নারীর ভাগ্যে মেলে না! এই সব ফেলে—মনকে চোখ

রাঙিয়ে উঠলুম, খবর্দ্দার—তোর এতে কিসের অধিকার রে! জানিস্ না, রাক্ষসী তুই, রাণীর সাজ পরে কত-বড় হৃদয়-রাজ্য গ্রাস কর্‌চিস! লজ্জা করে না তোর?

স্বামী এলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন,—আমায় ডেকেচো? কি শান্ত মিষ্ট সে স্বর! তাঁর পানে চেয়ে দেখলুম, মুখে সেই মৃদু হাসির রেখাটি তেমনি সুন্দর ফুটে আছে! মনে একটু দুর্ব্বলতা এলো বললুম,—এ সাজ পছন্দ হয়েচে তোমার?

তিনি বললেন,—বেড়াতে যাবে?

আমি বললুম,- গেলে তুমি সুখী হও?

তিনি বললেন.—মানে, সকলেই যাচ্ছে। আজ বিজয়ার রাত্রি! তা তুমি যদি বাগবাজারে যেতে চাও—

মন আরো নুয়ে পড়ছিল; জোর করে তাকে খাড়া করলুম। মুখ নীচু করে বললুম,—সেখানে যাবো না। যেতেও চাইনা কোনোদিন।

বলেই তাঁর পায়ে প্রণাম করলুম, একেবারে দুটি পা আঁক্‌ড়ে ধরে মুখ গুঁজে সেই পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লুম। চোখ দিয়ে হু-হু করে জল ঝরে পড়লো।

তিনি বললেন,—ও কি করচো কনক?

আমি কোনো কথা না বলে সেই দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম। তিনি আমার দু'হাত ধরে আমায় টেনে তুললেন।

বললেন.—হঠাৎ আজ এমন করচো কেন?

—আমার বুক কেমন করচে।

—বাগবাজারে যাবে?

—না, না।

—তবে কি চাও, বলো?

—আমি কত-বড় পাতকিনী—তুমি তা জানো না!...আমি... আমি শুধু তোমার পায়ের তলায় পড়ে মরতে চাই!

বাধা দিয়ে তিনি বললেন,—পাগলের মত এ কি বকৃচো?

—না। আমি পাগল নই, পাগলের মত কিছুই বকি-নি। আজ আমি সব কথা খুলে বলবো, তুমি শোনো। শুনে আমায় তাড়িয়ে দাও, এই রাত্রে লাথি মেরে তাড়িয়ে দাও, তাতেও আমি এতটুকু দুঃখিত হবো না। তুমি জানো না, এতদিন তোমার অসীম অগাধ ভালোবাসার কি ভয়ঙ্কর অমর্য্যাদা আমি করে এসেচি। তুমি যখন অত আদর করেচো, তখন আমি পাষাণের মত শক্ত হয়েচি, তা গ্রহণ করতে পারিনি। সে আদর আমার প্রাণে কি আগুন জ্বেলে দিয়েচে, তা তুমি জানো না! কেন দিয়েচে, তা তুমি শোনো। শুনে বিচার করো, দণ্ড দাও। যত কঠিন দণ্ডই সে হোক, আমি তা অম্লান বদনে মাথা পেতে নেবো।

স্বামী কি বলতে যাচ্ছিলেন, আমি বাধা দিয়ে বললুম,—তুমি আমার অতীত জানো না। আমি আজ সব কথা খুলে বলবো, তুমি শোনো—

—তুমি জানো, বাবার সখ ছিল, আমায় খুব ভালো করে লেখাপড়া শেখাবেন। বাড়ীতে মাষ্টার-পণ্ডিত রেখেই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না, নিজেও দুবেলা আমার লেখাপড়ার তদ্বির করতেন। অর্থাৎ সে দিকটায় তিনি এমনি ঝোঁক দিয়ে ফেলেছিলেন যে, আমার বয়স পনেরো পার হতে চললেও আমার বিয়ে দেবার কথাটা তাঁর খেয়ালেই আসেনি। ভাগ্যে সমাজ-দেবতা তার বিরাট লগুড় ঘাড়ে নিয়ে ধর্ম্মরক্ষা করছিলেন! তাই তাঁর দূতদলের অন্তরালের কাণাঘুষোগুলো একদিন যখন প্রচণ্ড রূপ ধরে প্রকাশ্য আসরে অবতীর্ণ হলো, তখন বাবা একটু চঞ্চল হলেন। সেদিন বাবা খেতে বসে আমার পানে বারবার

চেয়ে-চেয়ে দেখে মাকে বললেন, তাইতো, কনকটা মাথাঝাড়া দিয়ে উঠেচে, ওর বিয়ে না দিলে আর চলছে না। কি বলো ?

মা পাখা নিয়ে কাছে বসে বাতাস করছিলেন ; পাখা রেখে দুধের বাটিটা বাবার পাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, —তোমায় ত বলে-বলে পারলুম না। মেয়ে নিয়ে পাড়ায় কারো বাড়ী পা দেবার জো নেই আমার।

বাবা বললেন,—কিন্তু এইটে আমি বুঝতে পারিনে, মেয়ে আমার — তার বিয়ে কবে দি না দি, তাতে পাড়ার পাঁচজনের এত মাথা-ব্যথা কেন ?

মা দুধের বাটিতে চিনি ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে বললেন,—কথার শ্রী ছাখো! সমাজ বলে একটা জিনিষ আছে তো—সে চুপ করে থাকবে কেন ?

বাবা গম্ভীর স্বরে বললেন,—তা ঠিক !

তখন সুযোগ পেয়ে বিস্তর ঘটক-ঘটকী এসে বাবাকে একেবারে ছেঁকে ধরলে। ফলে আমার শাস্তি সুরু হলো ! সময় নেই, অসময় নেই, যখন-তখন হুট্ বলতেই মাথায় ভিজে গামছা চেপে পাতা কেটে চুল বেঁধে, নানা ধাঁচে সেজে-গুজে আড়ষ্ট কাঠের পুতুলটির মত আমায় বৈঠকখানায় গিয়ে বসতে হতো. বিচিত্র পাত্রের দল আর তাদের অভিভাবকদের মন ভোলাবার জন্য। সেখানে হতো সেই মামুলি ব্যাপারের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ,—আমার রূপের তারিফ, নাম-জিজ্ঞাসা, গৃহিণীপনায় কতখানি মুন্সিয়ানা জন্মেচে, তারি পরিচয় নেওয়া,—ব্যস্ ! হাড় আমার জলে উঠ্‌তো। আমি কি কচি খুকী যে আমাকে এই সব উদ্ভট প্রশ্ন ! মানুষের মধ্যে যে-জিনিষটা আসল, যেটা আছে বলেই মানুষ মানুষ, সেই জিনিস—এই মনটার সম্বন্ধে এত লোক

আসে যায়, কই, কোনো রকম খবরাখবর তো কেউ চায় না—সেটাতে কারো নজরই নেই! হায়রে, এরা চায় শুধু নারীর এই দেহখানা…! কেউ দেখবে, কতখানি রূপ আছে! বিলাসের বিচিত্র উপকরণ, রঙীন খেলনা,—সেটি নিয়ে আলমারিতে সাজিয়ে রাখবে, ইচ্ছা হলে পেড়ে নানা ভাবে সেটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখে অলস উদ্দেশ্যহীন সখ মেটাবে! নয় কেউ চাইবে, সুস্থ, সবল পেশী,—যার জোরে সংসারের জাঁতা কলটাকে আচ্ছা করে ঘুরিয়ে নেওয়াবে! ছি, এই পুরুষ! এরই সঙ্গে নারীর জীবন-মরণের সকল সম্পর্ক, কত জন্ম-জন্মান্তরের কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা!

আমার ঘৃণা ধরে যাচ্ছিল। এ তো বিয়ে নয়, এ যেন এক লটারির খেলা চলেছে! নেবো-নেবো করে বিস্তর লোক এসে নাকটা কানটা মাপছিল আর হাত বাড়াচ্ছিল, আবার ফিরছিল,—ভাবছিল, তাইতো যদি ঠকে যাই! এর চেয়ে আরো-ভালো তো মিল্‌তে পারে! সকলেরই মনের ভাব, লাভটা ষোল গণ্ডায় খতিয়ে নেওয়া চাই! জানিনা, আমার মধ্যে কোন্ পদার্থটির অভাব তারা লক্ষ্য কর্‌ছিল; কিন্তু তাদের এই কুণ্ঠিত ভাব দেখে বাবা সাহস পাচ্ছিলেন না—কাজেই এইভাবে ঢেউ খেতে খেতে আমার নাকে-মুখে জল ঢুকে দম আটকে গেলেও এই স্রোতেই গা ভাসিয়ে আমি চলেছিলুম।

সেদিন পাত্রের দল দেখা দেয়নি,—সন্ধ্যার একটু আগে আমি রাস্তার দিকের বড় ঘরের খড়খড়িটার ধারে দাঁড়িয়েছিলুম, রাস্তা দিয়ে খুব ঘটা করে এক বর যাচ্ছিল। দাঁড়িয়ে তাই দেখছিলুম, পাশে ছিল কিরণ-দি। আমার এক পিসিমা আছেন; কিরণ-দি, তাঁরই মেয়ে। সে তার শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী যাবে পুরীতে, তাই সেদিনটা আমাদের ওখানেই এসে উঠেছিল। পরের দিন তার পুরী যাবার কথা।

আমরা দুজনে বরের সাজসজ্জার সমালোচনা করছিলুম। বরটি দেখতে কালো, মোটা-সোটা, সাটিনের জামার উপর গোড়ে মালা আর গার্ড-চেন ঝুলিয়ে গম্ভীর হয়ে গাড়ীতে বসে আছে ;—পাশে কনে, তারও রঙ ময়লা, বেঁটে মোটা চেহারা। কিরণ-দি বললে,—কি বেহায়া বর, মাগো,—লজ্জা করলে না ওর,—ধেড়ে মিন্সে—এমনি সেজে-গুজে খোকার মত বাজনা-বাদ্যি করে যেতে !

আমি বললুম,—এ তোমার অন্যায়। ওর যদি ঐ রকম সখ্ হয় !

কিরণ-দি বললে,—এ যে সৃষ্টিছাড়া সখ, ভাই !

এমন সময় হঠাৎ আমার নজর পড়লো ও-ধারকার ফুটপাথের উপর। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে,—পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে, রঙ খুব ফরসা, চোখে সোনার চশমা, মুখে একটু দুষ্টু হাসি মিট্‌মিট্ করচে। একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে সে বর-কনে দেখছিল। আমি কোনো কথা লুকোব না। সেই ছেলেটির চেহারাখানি আমার দেখতে খুব ভালো লাগছিল, চকিতে কেমন নেশা লেগে গেলো। আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকে দেখছিলুম, এমন সময় কিরণ-দি বললে,—"দ্যাখ্ ভাই, কি সুন্দর ছেলেটি।

আমি বললুম,—কৈ ··? যেন দেখিনি এমনি ভাবেই কথাটা বললুম। ওকেই যে আমি দেখছিলুম, সে-কথাটা প্রকাশ করতে আমার কেমন লজ্জা হলো !

কিরণ-দি বললে,—ঐ যে লো—ঐ সামনেই, ও ফুটপাথে।

আমি বললুম,—হ্যাঁ, মন্দ নয়।

কিরণ-দি বললে,—ঐ ছেলেরই বর সেজে বসলে মানায়, তা না, মাগো, এই ধেড়েকেষ্ট বর ! সত্যি ভাই, তোর অমনি বরটি হয় !

আমি তাকে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে বললুম,—যাঃ !

কিরণ-দি বললে,—আচ্ছা, ওরই সঙ্গে যদি তোর বিয়ে হয় ?

আমি রাগের ভাণ করে তার পিঠে ছোট একটা কিল বসিয়ে বললুম,—ছ্যাখো, ভালো হবেনা, বলচি। ও-সব কি কথা !

আমার চোখ ছলছলিয়ে এলো। কিরণ-দি বললে,—ও৷ বাবা, এ ঠাট্টাটুকু গায়ে সইলো না ! অমনি আমার মানময়ী রাধার চোখে জল এলো !

তারপর কিরণ-দি বললে,—"সরে আয়লো, ছেলেটা আমাদের দেখচে। ঐ ছ্যাখ্ না !

আমি চেয়ে দেখলুম,—ছেলেটি একদৃষ্টে আমাদের জানলার পানে তাকিয়ে আছে !

আমাদের সরে আসতে হলো। কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল—কেবলই তাকে দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিলো। কেন, তার কোনো কারণ আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারি না।

পরের দিনও তার চেহারাখানা মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল,—এমন সময় শূন্যমনে সেই খড়খড়ির ধারে এসে দাঁড়ালুম।

হঠাৎ চোখ পড়লো ওদিককার ফুটপাথে। দেখি, সেই ছেলেটি ! একগোছা বই নিয়ে ফুটপাথ দিয়ে যাচ্ছে, আমাদের বাড়ীর সামনে এসে তার গতি একটু মন্থর হয়ে গেল। তার উৎসুক দৃষ্টি এক ব্যাকুল সন্ধানে আমাদের খড়খড়ির উপর ছুটে এসে পড়লো ! তাকে দেখবো, এ কল্পনাও আমার ছিল না। দেখে মনটা কি যে হলো! প্রাণের মধ্যে একটা মিষ্টি হাওয়া বয়ে গেল। আমি শাসির পিছনে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছিলুম। কেবলই মনে জাগছিল, কিরণ-দির কথাটুকু। ঠিক, চমৎকার চেহারাই বটে ! হঠাৎ কিরণ-দি পিছন থেকে বলে উঠলো,—কিগো, কি দেখা হচ্ছে অত-গোপনে ?

আমি রেগে বলে উঠলুম,—যাও কিরণ-দি, আবার ঐ রকম ঠাট্টা! রাগের আমার কোনো কারণ ছিল না, কথাটা বলেই তা বুঝতে পারলুম এবং লজ্জিত হলুম যখন কিরণ-দি বললে,—সত্যি ভাই, আমি তো কিছু মনে করে তোকে ও-কথা বলিনি। তুই কি দেখছিস্, তা জানি-ও না।···ও কে রে? সেই ছেলেটি না?

কথাটা বলেই কিরণ-দি এসে সার্শির ধারে দাঁড়ালো। সেই ছেলেটিরও তখন, জানিনা কি কারণে, জুতোর ফিতে হঠাৎ আল্‌গা হয়ে গেল, সে দিব্যি জুতোর ফিতে বাঁধতে দাঁড়িয়ে পড়লো। আমার গা-টা শির্‌-শির্‌ করে উঠলো। কিরণ-দি হেসে বললে,—ওঃ!

আমি বললুম,—ওঃ কি! না, ও-সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না, বল্‌চি!

কিরণ-দি বললে, —কি লো,—ধরা পড়ে গেলি নাকি? সেই যে বলে,—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে!

আমি বেশ তীব্র স্বরেই বললুম,—কিরণ-দি—

—না হলে তোর এত দরদ কেন ভাই? বলে, ঠাকুরঘরে কে, না, কলা খাইনি! আচ্ছা, বল্‌ না, খুলে। মামাবাবুকে তাহলে বলে খপরটা নি। আমার কেমন মনে হচ্ছে,—দেখ্‌চিস্‌ না, ওরও ঠিক এইখানটিতে এসে জুতোর ফিতে খুলে গেল! ঐ তোর বর, নিশ্চয়!

—যাওঃ! বলে আমি সেখান থেকে সটান্‌ একেবারে ছাদে উঠে চিলের ছাদের পাশে এসে বসলুম। আল্‌সের ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখা যাচ্ছিলো। চেয়ে দেখলুম, সে চলেছে, কেমন আপনা-ভোলা-ভাবে! তার পাঞ্জাবির পকেটে রুমালের কোণটুকু শুধু দেখা যাচ্ছিলো! আর

পায়ের রঙ টুকু সকালের সেই রৌদ্রের আলোয় যেন চাঁপা ফুলের মত মনে হচ্ছিলো। আমি গোপন করচি না—আমার তখন সত্যই মনে জাগছিলো, কিরণ-দির কথা—'ঐ তোর বর'। ঠিক! তাই, নিশ্চয় তাই! নাহলে দু'দুবার এমন করে দেখা হবে কেন? কাল হঠাৎ চোখ পড়লো—আজও সকালে দেখতে পাবো, সে আশা একবারও মনে হয়নি,—তবু এমন মেঘ না চাইতে জল এলো! এমন তো কতদিন সকালে সন্ধ্যায় খড়খড়ির ধারে দাঁড়াই, কৈ, কোনো দিন তো চোখে পড়েনি ও মূর্ত্তি, ঐ রূপ! মনে মনে তখন কত কি গড়তে লাগলুম। বাড়ীতে যেন খুব ধুম বেধে গেছে, আমার বিয়ে! ভারী ঘটা করে বর এলো—শুভদৃষ্টির সময় চোখ তুলে চেয়ে দেখি, এ-ই বর!

আমার কেবলি মনে হচ্ছিলো, স্বামী, ঐ আমার স্বামী! নাহলে আবার এমনভাবে দেখা হবে কেন?

এ কল্পনা দেখতে দেখতে আমায় একেবারে কেমন নাচিয়ে তুললে—সমস্ত শরীরে মনে আগুন ধরে গেল! আমার আর বসে-দাঁড়িয়ে চলে-ফিরে সোয়াস্তি রইলো না! দুপুর-বেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই সাশির আড়ালে একখানা বই নিয়ে একটা ইজিচেয়ার টেনে তার উপর বসে পড়লুম! খড়খড়ির সাশি খোলা রইলো, কাকেও আশঙ্কা করবার কিছু ছিল না। কারণ এমন আমি হামেশাই বসে থাকি। বসে বই খুলে কেবলই ভাবছিলুম, কিরণ-দির কথা! তার চোখে ধূলো দেওয়া শক্ত! সে সন্দেহ করে ফেলেচে! প্রথমটা রাগ দেখিয়েছিলুম, কিন্তু এখন কিরণ-দির সে ঠাট্টাটুকুও ভারী আরামের বোধ হচ্ছিলো। ভাবছিলুম, কিরণ-দিকে কেন বকলুম! কেবলি মনে হচ্ছিলো, কিরণ-দি কখন্ আসবে! এখানে এসে আমায় এ অবস্থায় দেখলে ঠাট্টা যে করবে নিশ্চয়, তা বুঝছিলুম—তবু মনে হচ্ছিলো, করুক

ঠাট্টা, সে বেশ লাগবে ! সে যে সন্দেহ করেচে,—তাতেও আমার আরাম বোধ হচ্ছিলো। বসে বসে আরো ভাবছিলুম, বই নিয়ে সে যাচ্ছিলো—নিশ্চয় স্কুলে কি কলেজে,—নাহলে এ-বেলায় বই নিয়ে ও-বয়সের মানুষ আর কোথায় যাবে? যখন গিয়েচে, তখন ফিরবেও ঠিক! কিন্তু কখন্, কখন্ ফিরবে? আবার মনে হচ্ছিলো, তাই বা ভাবি কেন! এমন তো হতে পাবে, কোনো বন্ধুর বাড়ী থেকে হয়তো বই নিয়ে বাড়ী যাচ্ছে, তাহলে আজ বিকেলে এ পথে আসবার সম্ভাবনা কোথায়? দেখাই বা আবার হবে কি করে?

বই খুলে এমনি সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় কিরণ-দি এলো, এসে বললে,—কি বই পড়চিস্ রে?

হাতে বই একখানা ছিল বটে, কি বই তাও কি দেখেছিলুম? না। মলাটটা দেখে আমি বললুম,—ভূধর চক্রবর্ত্তীর 'মনোরমা'।

—কেমন বই?

—জানি না, তবে মন্দ লাগচে না।

—ভূধর চক্রবর্ত্তী লেখে ভালো। ও কোন্ বইটা রে? সেই নরেন্দ্রনাথ পাহাড়ের উপর থেকে সাগরে ঝাঁপ খাচ্ছে গোড়াতেই?

—হ্যাঁ।

—দেখি, ও বইটা সত্যি আমার ভারি ভালো লেগেছিল। পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে যায়; না? গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! দেখি—বলে বইটা হাতে তুলে নিলে। দু'চার পাতা উল্টে-পাল্ট বললে,—দূর, সেটা ত 'প্রণয় না হলাহল' উপন্যাসে আছে। এটাতে তো সেই যমপুরী থেকে পালানোর ব্যাপারটা! তুই তো তবে খুব পড়ছিস্?

আমি একটা নিশ্বাস ফেললুম। কিরণ-দি আমার কপালের উপর নিজের মাথার ভর রেখে বললে—ভাই কনক, আমার আজ সারাদিন জানি

না কেন, কেবলই মনে হচ্ছে, ঐ ছেলেটির সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে। তাহলে হয়ও বেশ। চমৎকার দেখতে কিন্তু ভাই! আমি তাই এ-ঘরে এলুম। আজ সকালে সে বই নিয়ে যাচ্ছিলো, আমি ছাদে চুল শুকোতে শুকোতে দেখছিলুম। ও নিশ্চয় কলেজে যাচ্ছিলো।—আমি মামীমাকে বলে এলুম, এ ঘরে আসতে। বলেচি—তোমার মেয়ের বিয়ের ঘটকালি করবো। পাত্র চাও? আজই পাত্র দেখাবো। মামীমা বললে,—পাণটা খেয়ে আমি যাচ্ছি।

আমি বললুম,—ছি ভাই কিরণ-দি, এ কি করচো তুমি?

কিরণ-দি বললে,—কি আর করেছি! মানুষটা যাবে, মামীমাকে দেখাবো।

—যাবে যে ঠিকই, তা তুমি জানলে কি করে?

—আমার মন বলচে, সে যাবেই এ পথে। তুই তো ওবেলা ঘর ছেড়ে চলে গেলি, আমি ওকে লক্ষ্য করছিলুম—ও দু'পা করে যায়, আর নানা ছলে এই খড়খড়িটির পানে ফিরে-ফিরে তাকায়...!

ঘণ্টাখানেক পরেই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটলো। সেই ফুটপাথে তারই দর্শন মিললো। বেশ জোরে জোরে সে আসছিলো, কিন্তু এবারও দেখলুম, আমাদের বাড়ীর কাছ-বরাবর গতি তার মন্থর হলো। মা পাশে দাঁড়িয়েছিল, কাজেই আমি খড়খড়ির পাখির ফাঁক দিয়েই দেখছিলুম, মা না টের পায়! মা বললে,—বেশ ছেলেটি! আহা, জামাই করে বুকে তুলে নিতে সাধ হয় বটে!

ছেলেটিও লক্ষ্য করলে, যে, আমাদের খড়খড়ির পাশ থেকে তাকে দেখা হচ্ছে—তার মুখখানা সস্মিত হয়ে উঠলো। সে চলে গেল! মাও অন্য ঘরে গেল।

কিরণ-দি বললে,—কনক, আয় দেখি, ছাদে যাই—ও কোন্ দিকে যায়, দেখবো।

আমি বললুম,— তুমি ক্ষেপেচো !

—হ্যাঁ, ক্ষেপেচি। বেশ, তুই না যাস, আমিই দেখিগে—

কিরণ-দি ছাদে দৌড়ুলো, আমিও বসে থাকতে পারলুম না—ছাদে গেলুম। আল্‌সের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলুম, বাঃ, এ তো বেশী দূর নয়—ওদিককার ফুটপাথ যেখানটায় বেঁকেচে, ঠিক সেই মোড়টার উপর তেতালা বাড়ীখানার মধ্যে সে ঢুকলো।

কিরণ-দি মহানন্দে আমায় জড়িয়ে ধরে বললে,—রোস্‌, সন্ধান নিচ্ছি। বলে দৌড়ে নীচে ছুটে গেল।

অর্থাৎ কিরণ-দি কেমন করে' জোগাড়-জাগাড় করে সরকার মশাইকে সেই বাড়ীর দিকে রওনা করিয়ে দিলে; আধ ঘণ্টা পরে সরকার মশাই ফিরে এসে বললে—একটি বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলে বেড়াতে বেরুচ্ছিল—তারই কাছে সন্ধানে জানা গেল, ওরা আমাদেরই পাল্টা ঘর। ওরা চাটুয্যে।

কিরণ-দি বললে,—মামীমাকে বলে যাচ্ছি ঘটক পাঠাতে। মামাবাবু বেরিয়েচেন, ফিরে আসবেন কাল; আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না !—আমাকে যে চলে যেতে হচ্ছে, না হলে মামাবাবুকে একেবারে পাকা কথা ঠিক করতে পাঠিয়ে দিতুম।

... ...

কিরণ-দি তো চলে গেলো; তারপরই বাড়ীতে নঙ্কুর খুব অসুখ হলো,—কাজেই ঘটক পাঠানো ঘটে উঠলো না। কিন্তু প্রত্যহই আমাদের দুজনের সেই চোখের খেলা চলতে লাগলো। সকালে, বেলা ঠিক দশটার সময় বইয়ের গোছা নিয়ে তাকে কলেজে যেতে দেখতুম,—এবং বেলা দুটো থেকে তিনটের মধ্যে আবার এই পথেই সে ফিরত ! সে বেশ বুঝে নিলে, এখানে তাকে দেখবার জন্ত আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে

থাকি! আমিও বুঝলুম, আমাকে দেখবার জন্য তার ঔৎসুক্যও বড় কম নয়!

একদিন মজা দেখবো বলে ঐ সময়টিতে দোতলার খড়খড়ির ধার ছেড়ে ছাদে আল্‌সের আড়ালে এসে লুকিয়ে রইলুম—মনে ভাবলুম, আমি তাকে ঠিক দেখবো; কিন্তু ও তো আর দেখতে পাবে না, তাতে দেখা যাক্, ওর মনের ভাবখানা কেমন হয়! ও কি করে!

সেদিনও ঠিক সেই নির্দ্দিষ্ট সময়টিতে বইয়ের গোছা নিয়ে সে দেখা দিলে। আমাদের খড়্‌খড়ির পানে উৎসুক দৃষ্টি নিত্যকার মত তেমনি অধীর আগ্রহে আমার আশায় ছুটে এলো;—কিন্তু দেখা মিললো না! তার চোখদুটি তখন একেবারে ম্লান হয়ে গেল। অত্যন্ত মলিন হতাশ মুখখানি নিয়ে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে পড়লো—আমার ভারী আমোদ হলো! তারপর সে কি করে, তা দেখবার জন্য আমি আল্‌সের আর একটা ফাঁকে চোখ দিয়ে দেখতে লাগলুম। দেখি, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ সে থম্‌কে দাঁড়ালো—তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে যেন কি একটা মস্ত-প্রয়োজনীয় জিনিষ বাড়ীতে ফেলে এসেচে, পাচ্ছে না, এমনি ভঙ্গী করে আবার সে ফিরলো। আমি একেবারে মাথা তুলে ছাদে দাঁড়িয়ে উঠলুম, সে ততক্ষণে আমাদের বাড়ীর সামনে এসে পড়েচে,—দৃষ্টি তার সেই খড়খড়ির পানেই। আমার দুঃখ হলো; তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবো বলে আঁচলটা আকাশের দিকে একটু আমি উড়িয়ে দিলুম—এবং তখনি রাস্তার পানে ফিরে তাকালুম। আমায় তখন দেখতে পেয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়লো—তারপর সে কি হাসি, কি প্রসন্নতা, সার্থকতার কি আনন্দই যে তার চোখে-মুখে ফুটে উঠলো! আমি তা স্পষ্ট দেখলুম। বেচারা ফ্যাসাদে পড়ে গেল আর কি! এখন করে কি? আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়েই আবার

পকেটে হাত পূরে দিলে, তারপর চকিতে মাথাটা নেড়ে সে তার গন্তব্য পথের দিকে ফিরে দাঁড়ালো—অর্থাৎ ভাবটা এমনি দেখালে, যেন যার জন্য আমি ফিরছিলুম, তা পেয়েচি গো, পেয়েচি!

এমনি করেই আমার চিত্তে তীব্র নেশা তীব্রতর হয়ে উঠছিলো। একদিন হলো কি,—সন্ধ্যার সময় এক মাসীর বাড়ীর নিমন্ত্রণ গেছলুম—পরদিন ভোরেই ফেরবার কথা; কিন্তু মাসীর অত্যন্ত জেদে মা বললেন,— তা'হলে সন্ধ্যার সময়ই বাড়ী ফিরবো।

শুনে আমি জ্বলে উঠলুম! কি! সারাদিন তাকে দেখতে পাবো না আজ, সে বেচারাও হতাশ মলিন মুখে ফিরে যাবে! নিজে দেখতে পাবো না, সে দুঃখ তো ছিলই,—কিন্তু সে আমায় দেখতে পাবে না, এইটেই বেশী বাজছিলো!

না, কখনো তা হবে না। গোঁ ধরে মাকে বললুম,—আমি এখনি বাড়ী যাবো—

—সে কি হয় কখনো?

—কেন হবে না? সেখানে বাবার কষ্ট হবে, তা ভাবচো?

—একবেলার জন্যে আর কষ্ট কি! লোকজন তো আছে সব—

—না মা, তবু বাবার কষ্ট হবে। বাবাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আমোদ করতে পারবো না আমি। তোমার সাধ হয়, থাকো।

—তোর গিন্নিপনা রাখ্ দিকিনি।

আমি কেঁদে কেটে অনর্থ বাধিয়ে তুললুম। মাসী এবং বাড়ীর সকলে বললেন,—বাপের উপর বড্ড মায়া, বুঝি!

অর্থাৎ আমায় কেউ রাখতে পারলে না। আমি একা ফিরলুম,—বাড়ী পৌছুলুম, বেলা তখন প্রায় দশটা। মনটা ধড়ফড় করছিল। গাড়ীটার উপর রাগ ধরছিলো, ভারী আস্তে চলেছে! সব বৃথা হলো

বুঝি! গাড়ী থেকে নামচি, এমন সময় পিছনে কার কাশির শব্দ পেলুম। ফিরে দেখি, সে। এক ছুটে উপরের ঘরে গিয়ে সার্শির ধারে এসে দাঁড়ালুম—দেখি, সেই সতৃষ্ণ আঁখির দৃষ্টি ব্যগ্র কৌতূহল নিয়ে খড়খড়ির উপর ছুটে এসে পড়েচে! চোখোচোখি হয়ে গেল। দুজনেই দুজনের পানে চেয়ে হেসে ফেললুম। হেসেই আমি ভাবলুম, ছি ছি, এ কি করলুম! লজ্জায় তখনি সরে এলুম।

না, আর বাড়াবো না, খুব সংক্ষেপে সেরে নিচ্ছি।

বাড়ীতে নক্কুর অসুখ সারতে পশ্চিমে যাবার কথা উঠলো। আমি ভয়ানক দুর্ভাবনায় পড়লুম। সকলেই যাবে; সেখানে গেলে তাকে তো দেখতে পাবো না—অথচ কি করেই বা বলি, আমি যাবো না? আমায় এখানে একলা রেখে সত্যি কেউ যাবে না!

যাবার দিন ক্রমে ঘনিয়ে এলো—কি করি, কি করি! মহা দুর্ভাবনায় পড়লুম। মার উপর রাগ ধরছিলো,—কৈ, মা তো বাবাকে বলে একদিনও ঘটক পাঠাবার ব্যবস্থা করলে না। কিরণ-দিই বা কি-রকম লোক! একটা কথা দিয়ে সে-সম্বন্ধে একেবারে চুপচাপ! বাঃ! দুনিয়ার উপর রাগ ধরে গেল—স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর দুনিয়া!

যে দিন আমাদের পশ্চিম যাবার কথা, তার আগের দিনের কথা বলচি। আমি বাইরের ঘরে বাবার কতকগুলো কাগজ-পত্র দেখে শুনে গুছিয়ে টেবিলের ড্রয়ারে পুরে রাখছিলুম—হঠাৎ খড়খড়িতে একটা ঠক্ করে শব্দ হলো। এগিয়ে গেলুম—দেখি, সে একেবারে এ ফুটপাথে, ঠিক আমাদের খড়খড়ির নীচেয় এসে দাঁড়িয়েচে।

আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো। গা ছমছম করতে লাগলো। মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ ছলাৎ করে যেন ঢেউ তুলে নাচ স্বরু করে দিলে। এগুবো কি পেছুবো, ঠিক করতে পারলুম না।

সে-ও একবার আমার পানে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। আমার চোখে জল এসেছিলো। সেও অপ্রতিভ হয়ে পড়লো,—তার চোখে সে ভাব পষ্ট আমি লক্ষ্য করেছিলুম। কোনো মতে সে বলে উঠলো,—গলা তার কাঁপছিলো,—সে বললে,—মাপ করবেন, বড় দুঃসাহসের কাজ করেচি, আমি। কিন্তু শুনলুম, আপনারা পশ্চিম যাচ্ছেন! আপনি পশ্চিমে যাবেন না। আপনাকে না দেখতে পেলে আমি মরে যাবো।—শেষের দিকটায় তার গলার স্বর এমন করুণ হয়ে এলো যে আমার প্রাণটা বেদনায় ঝরে পড়বার মত হলো!

কথাটা শুনে আনন্দ যেমন হলো,—ক্ষোভও তেমনি হলো। ছি—এমন করে এ-কথা বলা কি ঠিক হয়েচে! আমি একজন ভদ্র ঘরের মেয়ে, বয়সও খুব কম নয়—আর ওর সঙ্গে পথের আলাপ বৈ না—কোনো পরিচয় নেই—কেউ কারো সম্বন্ধে কিছুই জানি না, হঠাৎ এতখানি ঘনিষ্ঠতা!

জানি না, মনের কোন্‌খানে একটা ঘা লাগলো। মনের মধ্যে যে রঙিন ফানুসটা জ্বলছিলো, ঘা খেয়ে সেটা ছিঁড়ে পুড়ে গেল—আর তখনি একটা কি-রকম বিশ্রী কালো কালির দাগ চোখের সামনে ফুটে উঠলো!

তবু সরে আসতেও পারলুম না। পা যেন কে এঁটে ধরে রেখেছিলো!

সে বললে,—যদি যান, তাহলে জেনে রাখবেন, ১২ নম্বর বাড়ীর চুনি চাটুয্যেকে আর জীবনে দেখতে পাবেন না।

আমি আর দাঁড়াতে পারলুম না—ছি!

চোখের দৃষ্টিতে মৃদু ভৎর্সনা হেনে আমি সরে এলুম—সে ঘরে আর একমুহূর্ত্ত দাঁড়ালুম না। একেবারে ছুটে তেতলার ছোট ঠাকুর-ঘরের দরজার কাছে এসে বসে পড়লুম। ভয়ঙ্কর কান্না পাচ্ছিলো। তীব্র অনুশোচনায় মন ভরে উঠ্‌লো। বড় সাধের কল্পনা হঠাৎ দম্‌কা ঘায়ে ছিঁড়ে গেলে মনের যেমন ভাব হয়, তেমনি ভাব হলো। পরক্ষণেই কিন্তু মমতায় প্রাণ আবার ভরে উঠলো! আহা, কি করুণ ঐ নিবেদন! ঠাকুর-ঘরের দরজায় মাথা রেখে বললুম,—হে ঠাকুর, আমাদের পশ্চিম যাওয়া বন্ধ করে দাও।

আশ্চর্য্য! সেই রাত্রে বাবার নামে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির! টেলিগ্রাম পড়ে বাবা বললেন,—না, কাল মধুপুর যাওয়া আর হলো না। আমায় ভোরেই মফঃস্বল যেতে হবে। প্রজারা কাছারি লুঠ করেচে!

শুনে আমার সে কি আনন্দ যে হলো!

এ ঘটনায় তার উপর আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল। তবে এ-ই আমার স্বামী, এ-ই সে নিশ্চয়! না হলে ঠাকুর কথা রাখবেন কেন! তখন পরদিন সকালেই তাকে এ খবরটুকু জানাবার বড় ইচ্ছে হলো। খুসী হবে! একটা কাগজে মোটা অক্ষরে লিখলুম—মধুপুরে যাওয়া হলো না। ভাবলুম, সে যখন যাবে—এই পথেই তো যাবে, তখন কাগজখানা রাস্তায় ফেলে দেবো।

আবার মনে হলো, না—ছি! মনকে শক্ত করে বললুম—না—না।

ঘড়িতে দশটা বাজলো, আর অমনি আমাকে জোর করে যেন কে খড়খড়ির ধারে টেনে এনে বসিয়ে দিলে! পথে নানা সাজের লোক চলেছে, ফিরিওলা হেঁকে যাচ্ছে, গরীব-দুঃখী লোক তাদের দুঃখের ভারে নুয়ে পথ চলেছে, ও বাড়ীর উড়ে বামুনটাও রান্নাঘরের জঞ্জাল

ধুয়ে মুছে তালি-দেওয়া একটা আল্‌পাকার কোট গায়ে এঁটে তার উপর গরদের চাদর বেঁধে বিড়ি টানতে টানতে চলেছে! সবই দেখছিলুম, মনটাকে অন্যদিকে ফেরাবো ভাবছিলুম। কিন্তু সে কেবলি বেঁকে দাঁড়াচ্ছিলো, আর হুম্‌কি দিয়ে বলছিলো,—কেন 'না'! কিসের 'না'! ও যে তোর স্বামীরে, ও তো পর নয়, পথের লোক নয়, স্বামী, স্বামী, স্বামী! ওর কাছে তোর কিসের লজ্জা! আমি মনকে কেবলি চেপে ধরে বলছিলুম, না, না, না। এমন সময় ওদিকে সেই মূর্ত্তি আবার যথাসময়ে ফুটে উঠলো তার সকল আকর্ষণ নিয়ে। আনন্দে আমার চিত্তও নেচে উঠলো!

সে কাছে এলো, একেবারে সামনে, ওধারের ফুটপাথে। আমি অমনি কাগজখানা খড়খড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিলুম। কাগজটা উড়তে উড়তে পথের উপর পড়লো। চম্‌কে উঠলুম,—যদি কেউ দেখে! সরে এলুম। আড়াল থেকে দেখতে লাগলুম, দেখি, কি করে! সে একেবারে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে আবার ফিরে এলো—পথে নেমে তার জুতোর ফিতেয় হাত রেখে ঝুঁকে কাগজখানা কুড়িয়ে নিলে, নিয়ে পড়লে। পড়ে একবার উপর-পানে প্রসন্ন হাসি-ভরা দৃষ্টি হেনে চলে গেল।

আমার মনে হলো, ছি, ছি, এ কি করলুম! নিমেষের দুর্ব্বলতায় আমার মনের নিভৃত মন্দির থেকে ইষ্টদেবতাকে টেনে এনে একেবারে পথের মধ্যে এমনভাবে আজ বসিয়ে দিলুম! প্রাণের নীরব পূজাকে আজ কাঁশর-ঘণ্টার হট্টরোলে মিশিয়ে দিলুম!

তার উপরও রাগ ধরলো! কেন ও কাগজটাকে সে কুড়িয়ে নিয়ে গেল! কেন,—কেন? খপরটুকু জানা হলে কাগজখানা কেন সে ছিঁড়ে ফেললে না? কেন ছিঁড়লে না? এ অন্যায়, ভারী অন্যায়!

ঠিক করলুম—বেশ, কলেজ থেকে ফেরবার সময় কখনো আজ দেখা দেবো না তো, কখনো না—খুব শাস্তি হবে তখন।

কিন্তু তুটোর সময় আড়ালে বসে থাকতেও পারলুম না তো! কে আবার চুলের মুঠি ধরে টেনে এনে সেই খড়খড়ির ধারেই আমায় বসিয়ে দিলে। পথের পানে তাকাতেই দেখি, সে আসচে—একটু দূরে সে ছিল। কিন্তু ও কারা? সঙ্গে তু'জন সঙ্গী যে! হাতে ও? দেখেই বুঝলুম, আমারই হাতের লেখা সেই কাগজখানা। সে-কাগজখানা সে খুলে দেখাচ্ছিলো, আর সঙ্গী তুজন অমনি হেসে লুটিয়ে কৃতার্থ বন্ধুর সার্থকতায় তার পিঠ চাপড়াচ্ছিল! দূর থেকে আমাদের খড়খড়িটার পানে আঙুল নেড়ে সে কি ইসারা করলে। তারাও অমনি চেয়ে দেখলে।

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো! কি! এই প্রেম, এই খেলা-এ তোমার কৌতুকের উৎস খুলে দিয়েচে! হতভাগা, কাপুরুষ! ইচ্ছে হলো, বাঘের মত ওদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ হাসিশুদ্ধ মুণ্ডুগুলো ঘাড় থেকে উপড়ে তুলে নি! অভদ্র, ইতর!

তিন বন্ধুতে এগিয়ে আমাদের বাড়ীর সামনে এলো। আমি সজোরে সাশিটা বন্ধ করে দিলুম। চোখে এমন কঠিন দৃষ্টি হেনেছিলুম যে যদি তারা মানুষ হতো তো তখনি আহত মূর্চ্ছিত হয়ে সেইখানে লুটিয়ে পড়তো! কিন্তু তা হলো না! কাজেই, আমার নিজের মনকে আমি রাগের আগুনে পোড়াতে লাগলুম।

মনে করলুম, ছাদ থেকে এখনি লাফিয়ে পড়ি, হাড়গুলো চূর্ণ হয়ে যাক! আর এই লক্ষ্মীছাড়া দেহখানা,—যার রূপের গর্ব্বে অন্ধ হয়ে

আছি, সেই দেহটা কদর্য্য মাংসপিণ্ড হয়ে পথের লোকের পায়ের তলায় পড়ে পিষে কাদা হয়ে যাক! দারুণ ধিক্কারে, ভীষণ অন্তর্দ্দাহে লোকালয় ছেড়ে আমার কোথাও পালিয়ে যাবার সাধ হতে লাগলো। আমি কেঁদে ফেললুম।

তবু মরতে পারলুম না! কোথাও পালানো হলো না—কে যেন মনকে চড় মেরে বললে,—কি! তোর একটা খেয়ালের খেলা ভেঙে গেছে বলে এই মা, এই বাপ, তাদের মুখে চুণকালি দিয়ে আত্মহত্যা করবি, আর কদর্য্য কুৎসায় তাদের অঙ্গ ছেয়ে যাবে! তাই আমি মরতে পারিনি গো, তাই পারিনি! না হলে সেই নীচ পশুটা মানুষের উপর যে ঘৃণা জন্মে দিয়েছিল,—

তারপর যেদিন তোমায় দেখলুম, সেদিন ঐ চোখে কি আশ্বাস, নির্ভরতার কি আভাষ পেয়েচি, তা আমিই জানি! তুমি দিনে-দিনে যত আদর, যত সোহাগ, যত ভালবাসা দিয়েচো, ততই আমার প্রাণ জ্বলে জ্বলে উঠেচে! কেবলি মনে হয়েচে, এ কি, এ কি-পাষাণে তুমি ফুলের আশা করচো! তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে মন আমার মাথা নুইয়ে লুকোবার পথ খুঁজে পায় না,—তাই যখনি তুমি ভাল-বেসেচো, আদর করেচো, তখনি আমি কুণ্ঠিত হয়েচি! মুখের হাসিটুকু দিয়েও আমার প্রাণের অসীম সে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারিনি.........

আজ জানাচ্ছি,—ওগো, পাষাণী অহল্যার মত এ পাষাণীকেও কি পরশ দিয়েচো তুমি! আজ আর কোনো ভয় নেই আমার,—এখন শাস্তি দাও, মাথা পেতে নেবো, হাসি-মুখে নেবো আমি—

স্বামী বলিলেন,—শান্তি চাইছো ?

আমার সমস্ত বুক কেঁপে উঠলো। আমি চোখ বুজলুম।

স্বামী আমায় বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, মুখে চুমু দিয়ে বললেন,—এই নাও শান্তি !

হাব্‌শীর প্রেম

দিল্লী সহর হইতে দিল্লী ফটকের ওধার দিয়া যে রাস্তা বরাবর কুতবের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই দিকটায় চলিয়াছিলাম, সদল-বলে, শাহজাদীদের সন্ধানে। সূর্য্য তখন আকাশের অনেকখানি পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। মাথার উপর সমস্ত আকাশটায় যেন কে আবীর মাখাইয়া দিয়াছে—লালে-লাল আকাশ! প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্নস্তূপ-গুলাকে বাঁয়ে রাখিয়া হুমায়ুনের সমাধি পিছনে ফেলিয়া বরাবর চলিয়াছিলাম। বন্ধু বান্ধব সিগারেটের ধোঁয়ায় এবং হাস্য-কৌতুকে সারা পথ সচকিত করিয়া চলিয়াছিল, আমি চলিয়াছিলাম নির্ব্বাক্, মৌন ভঙ্গীতে। আকাশ-বাতাস কিসের গন্ধে যেন মাতাল হইয়া আছে—তাহারই নেশায় প্রাণ আমার বুঁদ হইয়া গিয়াছিল!

একধারে নিজামুদ্দিনের কবর দেখা গেল। ঢুকিয়া পড়িলাম। ভিতরের পথটা অল্প-আঁধারে ভরিয়া গিয়াছে। জহান্-আরার জাফরি-আঁটা শেষ-শয্যার বাহিরে দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিলাম। পা দুইটা অত্যন্ত ভারী বোধ হইতেছিল—ভিতরের বাতাসে কেমন গুমস্থনি ধরিয়া ছিল। চুপিচুপি বাহিরে আসিলাম। সম্মুখের পথ ধরিয়া খানিকটা আসিয়া এক ঝোপের পাশে বসিয়া পড়িলাম। মাথার মধ্যে যেন কি আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিতেছিল! সম্মুখে ছিল একটা খাদ—জল নাই। দুইধারে বড় বড় জঙ্গল গজাইয়া উঠিয়াছে। ভাবিলাম, ঐ জলে একদিন না জানি কি চঞ্চল তরঙ্গ ছুটিত,—কাঁকণ বাজাইয়া রূপসী তরুণীর দল স্নানে নামিত—সমস্ত বাতাস চকিতে অমনি হেনা

অগুরুর গন্ধে উতলা হইয়া উঠিত! কোন্ সে অতীত যুগের স্নিগ্ধ সুরভি আসিয়া আমার চিত্তকে অবশ করিয়া দিল। একটা পাথরে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদিলাম।

সহসা কে ডাকিল, কৌন্ রে বেটা?

চোখ চাহিয়া দেখি, এক বৃদ্ধ ফকির। উঠিয়া বসিলাম। ফকির কহিল,—বঙ্গালী?

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, হাঁ।

ফকির কহিল,—সলীমার গোর দেখিয়াছিস্?

আমি কহিলাম,—না।

ফকির কহিল,—তুই যে পাথরটায় মাথা রাখিয়াছিস্, তাহারই নীচে সলীমা বিবি ঘুমাইয়া আছে।

সলীমা বিবি! না জানি, কোন্ হারেম আলো করিয়া একদিন সে বিদ্যুৎ-বরণী ফুটিয়াছিল! তার চোখের ইঙ্গিতে কত শাহজাদা উঠিয়াছে-বসিয়াছে, চলিয়াছে-ফিরিয়াছে! কাজল-টানা ভ্রূর বিলাস-লীলায় কোন্ সে বাদশাহের তখ্‌ত টলিয়াছে,—রাজায়-বাদশায় যুদ্ধ বাধিয়াছে! কত ছুরি, কত কিরীচ……

ফকির বলিল, সলীমা ছিল শাহজাদী জানী বেগমের বাঁদী। জাতে হাব্‌শী—রঙটি ছিল মিষ্‌ কালো। কিন্তু যৌবন সেই কালো দেহখানিকেই ঘষিয়া মাজিয়া এমন ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছিল, যে দেখিলে তাক্ লাগিত…এ কি কালো পাথরে খোদা মূর্ত্তি, না…অর্থাৎ বান্দার দলে কেহ কেহ বলিত, সলীমা বিবি যেন তাজা আঙুরটি! তেমনি রসালো, তেমনি নরম! বেগমের পেয়ারের পাত্রকে পেয়ার করিয়া জীবন্ত এই মাটীর নীচে ঢুকিয়া বেচারী তার দুঃসাহসের সাজা লইয়াছে!

পাথরটার গায়ে কতকগুলা ফুল-পাতা রাখিয়া ফকির চলিয়া গেল। আমি বসিয়াই রহিলাম। ঝাউগাছের পাতাগুলাকে দোলাইয়া বাতাস হা-হা শব্দে গুমরিয়া ফিরিতেছিল—দলের কাহারো কোনো সাড়া ছিল না। জহান-আরার পাণ্ডিত্য লইয়া নিশ্চয় সেখানে তারা বিষম তর্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে! নির্ব্বোধ!

পাথরের উপর হইতে একটা ফুল লইয়া নাকের কাছে ধরিলাম। সমস্ত মন চন্-চন্ করিয়া উঠিল। নেশা লাগিল। আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম, সলীমার কথা। না জানি, এই হাব্শী বাঁদীর জীবন কি অসীম রহস্যে ভরা ছিল!

হঠাৎ কে আমায় স্পর্শ করিল। কে? ভালো করিয়া চাহিয়া দেখি, সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক তরুণী। তখন চারিধার ঝাপ্সা হইয়া আসিয়াছে। সেই আলো-আঁধারে এটুকু বুঝিলাম, তরুণীর গায়ের রংটুকু মিস্ কালো, কিন্তু যৌবনের অপূর্ব্ব তরঙ্গ সারা অবয়বে এক অপরূপ হিল্লোল তুলিয়াছে। সুগোল নিটোল হাত, মুখে লাবণ্য একেবারে ঢলঢল করিতেছে! সদ্য-ফোটা ফুলের মতই শ্রীটুকু!

তরুণী কহিল,—অবাক্ হয়ে চেয়ে আছো যে! আমায় চেনো না?

আমি আরো বিস্মিত হইলাম,—মুখে কথা ফুটিল না। সম্মুখে একটা ভগ্ন স্তূপের উপর তরুণী বসিয়া পড়িল। পাৎলা আঁচলখানি কেমন এক ছন্দে উড়িতে লাগিল—মিষ্ট গন্ধে চারিধার ভরিয়া গেল।

তরুণী হাসিয়া কহিল,—এইখানে রোজ সন্ধ্যায় এসে বসি। এ জায়গার মায়া কিছুতে ছাড়তে পারি না।

আমি কহিলাম,—এ জায়গার কি এমন মোহ যে, তার জন্য—

—বুঝতে পারচো না! কেমন করে পারবে বলো! তুমি বিদেশী মানুষ, কিছুই তো জানো না—ক'জনই বা জানে! যে দু'চার-জন

জানতো, তারাও কেউ আর এখন এখানে নেই। বেশ, তবে বলি শোনো...

তরুণী বলিতে লাগিল,—

জানী বেগম ছিল সম্রাট ফরুকশিয়ারের কন্যা। রূপের দম্ভে ধরাকে সরা দেখিত। তবে সে-রূপে কখনো শান্ত আলোর প্রদীপখানি জ্বালিয়া চারিধার স্নিগ্ধ-শীতল আলোয় ভরাইতে চাহে নাই—সে-রূপে সে চাহিয়াছিল, লেলিহান্ তীব্র শিখায় জ্বলিয়া চারিধার জ্বালাইয়া তুলিতে!

বাদশা-ওমরাওদের তরুণ পুত্রগুলা জানী বেগমের চারিধারে ঘুরিত, ঠিক যেন সেই প্রভাতের ফুল-বনে ভ্রমরদলের মতই। গুঞ্জন আর গুঞ্জন, তার আর বিরাম নাই! জানী বেগম ফুলের মতই ঘাড় দুলাইয়া বলিত,—না, না, না! বেচারারা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া, দুনিয়া ভুলিয়া সেই পাষাণ-সুন্দরীর রূপের স্তুতি করিত, আর সেই প্রাণহীনা শাহজাদী নির্দ্দয় কৌতুক বুকে লইয়া তাদের সে নৈরাশ্যের বেদনা হাস্যমুখে উপভোগ করিত! ইহাতেই ছিল, তার মস্ত গর্ব্ব, মস্ত সুখ!

প্রসাদের পাত্রও যে তার না ছিল, এমন নয়! তারা গোপনে আসিয়া শাহজাদীর চরণে লুটাইত,—শাহজাদীর তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে চলিত, ফিরিত। এমনভাবে তারা শাহজাদীর চরণে লুটাইয়া ছিল যে, নিজেদের ইচ্ছায় তাদের ওঠা-বসাটুকুও ঘটিত না। দরবার হইতে লোক আসিয়া জানাইত, বাদশার তলব। শাহজাদী বলিত, খবর্দ্দার্! ব্যস্—পুতুলের মত তারা বসিয়া থাকিত। তারপর বাদসাহী হুকুম অমান্য করার জন্য যখন গর্দ্দানা দিত, শাহজাদী তখন হাসিয়া বলিত,—বেকুব! অর্থাৎ শাহজাদী সাধ হইলে তাদের বুকে ধরিত, আবার পরক্ষণে সম্মুখে দাঁড়াইয়া কশার

ঘায়ে তাদের পিঠের চামড়া উঠাইয়া লইত! মায়া-মমতার এতটুকু ধার ধারিত না।

মহম্মদ ছিল ফরুকৃশিয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্র; তরুণ যুবা—সুশ্রী। বেচারা যখন আকুল প্রাণে জানী বেগমের মুখের পানে চাহিত, জানী তখন হাসিয়া মুখ ফিরাইত! চোখের জলে মহম্মদের দিন কাটিত। আমি ছিলাম জানী বেগমের খাস বাঁদী। চিঠি-পত্র বহা, সিরাজীর পাত্র আর চাবুক হাতে আগাইয়া দেওয়া, এই সব ছিল আমার কাজ!

প্রাণ লইয়া শাহজাদীর এই নিষ্ঠুর খেলা দেখিয়া আমার বুকটার মধ্যে যে কি করিত, তা আমি কথায় বুঝাইতে পারি না। সে যাতনা আমার হাড়ে অবধি বিঁধিত! কিন্তু মুখ যে ফুটিত না! সে স্পর্দ্ধা বা সাহস ছিল না—তখনই কুত্তার মুখে এই দেহটাকে ফেলিয়া দিতে হইবে! তা ছাড়া আমি তো একটা বাঁদী।

কিন্তু পারিলাম না। মহম্মদের সেই করুণ মুখ, নৈরাশ্যের সেই বেদনা আর দীর্ঘশ্বাস বাঁদীর এই কালো প্রাণটার মধ্যে অত্যন্ত বাজিতেছিল,—চিত্ত আমার ক্ষুব্ধ হাহাকারে ভরিয়া উঠিত। আমার প্রাণে কিসের ক্ষুধা, কিসের পিপাসা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে চাহিত।

একদিন নিজেকে আর সামলাইতে পারিলাম না। ঝম্-ঝম্-ঝম্... শ্রাবণের সে কি ধারাই ঝরিয়াছিল! এই যে জায়গাটি, এইখানে ছিল, শাহজাদীর প্রমোদ-কুঞ্জ—ঐ খাদটা ছিল এক প্রকাণ্ড দীঘি। তখন বন-জঙ্গলের চিহ্ন কোথাও ছিলনা—ঐ জঙ্গলটা ছিল গোলাপ-বাগ! অজস্র গোলাপ ফুটিয়া চারিধার লালে-লাল করিয়া রাখিত। বেচারা মহম্মদ সেই শ্রাবণের ধারা মাথায় লইয়া চাহিয়া ছিল, শাহজাদীর ঘরের জানলাটির পানে! শাহজাদী চুল এলাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমি কার্ব্বা

হইতে আতর লইয়া মিহি করিয়া তাঁর চুলে মাখাইতেছিলাম। শাহ্জাদার চোখের সেই অধীর আকুল দৃষ্টি আমার চোখে পড়িল। দেখিয়াই বুঝিলাম, প্রাণে তাঁর কি অসহ্য বেদনা !

আমার যৌবন-বনে নিমেষে অমনি বসন্ত ফুটিল, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী গাহিয়া উঠিল। মন দুলিয়া উঠিল। ধৈর্য্যের বাঁধ নিমেষে টুটিল। দ্রুত ঘরে আসিয়া একটা চিঠি লিখিয়া ফেলিলাম—

প্রিয়তম, আর তোমার এ অধীরতা চোখে দেখিতে পারি না। ওগো আমার যৌবন-কুঞ্জের মালিক, হে আমার জীবন-বসন্তের নবীন বিহঙ্গ, এসো, এসো, প্রাণ ভরিয়া এ-যৌবন উপভোগ করিবে, এসো। এই বাঁদী আজ সন্ধ্যার সময় তোমায় আমার প্রেমের দরবারে আনিয়া হাজির করিবে। তবে একটি সর্ত্ত আছে, বাঁদীর মুখেই সে-কথা শুনিবে। যদি সে-সর্ত্তে রাজী হও, আজই সন্ধ্যায় তাহা হইলে তোমায়-আমায় প্রেমের লীলা চলিবে !

জানী।

শাহ্জাদীর পঞ্জা কোথায় থাকিত, জানিতাম। শাহ্জাদী তখন ফুলের রাশি লইয়া অলস খেলায় মাতিয়াছিল, কখনো ফুল লোফালুফি করিতেছিল—কোনোটা মাথার খোঁপায় গুঁজিতেছিল, কোনোটা আবার ছিঁড়িতেছিল ! বাদশাজাদীর অলস খেলা—সখের খেলা !

পঞ্জা চুরি করিলাম—চিঠিতে ছাপ মারিলাম। পরে ধীরে ধীরে সে চিঠি লইয়া গিয়া মহম্মদের হাতে দিলাম।

চিঠি পড়িয়া মহম্মদ চমকিয়া উঠিল। একেবারে আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—কি সর্ত্ত, বাঁদী ?

আমি তার মুখের পানে চাহিয়া ছিলাম—ঐ উজ্জ্বল চোখ এমন দৃষ্টি-হীন ! আমার প্রাণটার মধ্যে একবার যদি সন্ধান করিত তো

দেখিত, সেখানে লক্ষ জ্ঞানী বেগম বুকে অগাধ প্রেম লইয়া বসিয়া আছে! এই শাহ্জাদার দল চিরকালই মূর্খ!

আমি বলিলাম,—ঘরে আলো জ্বলিবে না। শাহ্জাদীর মুখ দেখিতে পাইবেন না!

প্রেমান্ধ যুবা বলিল,—রাজী।

তারপর নিশি-নিশি প্রেমের সে কি অপরূপ লীলা চলিল। আমার প্রাণ-পুষ্পের প্রতি দলটিকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া শাহ্জাদার পায়ে ধরিতাম, শাহ্জাদা কত আবেগে বুকে তুলিত—কি সোহাগ, সে কি আদর! বাঁদীর শূন্য মন কাণায় কাণায় ভরিয়া গেল! দলিত দ্রাক্ষার মতই আমার যৌবন সুরা পাত্র ভরিয়া শাহ্জাদার অধরে ধরিয়াছি, শাহ্জাদা গভীর আবেগে নিঃশেষে তাহা পান করিয়াছে!

এক বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্রি এই অপূর্ব্ব সুখের ডালি বিলাইয়া আমায় বিপুল ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়া তুলিল। অল্প-ধনে-ধনী আমি একান্তে বসিয়া ভাবিতাম, হাঁয়রে শাহ্জাদী, তখ্‌তে বসিয়া কি নুড়ি-পাথর লইয়া তুচ্ছ খেলা খেলিতেছ—আর আমি পথের বাঁদী, প্রেমের মণিহার গলায় পরিয়া বসিয়া আছি! ওগো শাহ্জাদা, ওগো আমার প্রাণের প্রাণ, প্রিয়তম, ওগো চির-দয়িত, যুগ-যুগ ধরিয়া আমার বুকের নিধি, আমার বুকে বসিয়া তুমি এমনই রাজত্ব কর!

একদিন ভুল করিলাম—নিমেষের ভুল! কিন্তু আমার সমস্ত যুগ-যুগান্ত সেই একটি নিমেষে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল।

বাহিরে সে-রাত্রে জ্যোৎস্না লুটাইয়া পড়িয়াছিল—পাখী গাহিতেছিল—ঘরে অন্ধকার! শাহ্জাদার বুকে মাথা রাখিয়া বলিলাম,—আমায় সত্যই ভালোবাসো, প্রিয়তম?

—বাসি, বাসি—আমার প্রিয়তমা. বাসি, বড় ভালোবাসি, দুনিয়ার চেয়ে তোমায় ভালোবাসি, বেহেস্তের চেয়ে ভালোবাসি, সকলের চেয়ে তোমায় ভালোবাসি! আবেগে শাহজাদা আমার তৃষিত ওষ্ঠে সুধার ধারা বহাইয়া দিলেন! আমি জ্ঞান হারাইলাম। সেই কুহক-ভরা ক্ষণে দারুণ ভুল করিয়া বসিলাম। আমি বলিলাম,—যদি আমি কুরূপ হই,—বিশ্রী হই? তাহলেও?

—তাহলেও বাসি, বাসি! কি গদ-গদ সে কণ্ঠের ভাষা!

আমি দুই বাহুর ডোরে শাহজাদার কণ্ঠ জড়াইলাম, প্রাণ ভরিয়া সে মুখে চুম্বন করিলাম। তারপর উঠিয়া আলো জ্বালিলাম। ভাবিয়াছিলাম, শাহজাদাকে দেখাইব, এই কালো দেহের আবরণে কত প্রেম ভরিয়া রাখিয়াছি, এই কালো মুখে কত আলো! দেখাইব, দেখাইয়া প্রাণে পরিপূর্ণ তৃপ্তি ভোগ করিব!

আলো জ্বলিল। শাহজাদা চমকিয়া শিহরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, গর্জ্জন করিলেন,—শয়তানী, তুই বাঁদী!

শাহজাদার পায়ে ধরিলাম, কত চোখের জল ফেলিলাম। জানী বেগম খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল—শাহজাদার মুখে সমস্ত শুনিয়া সে নিষ্ঠুরা নারী হাসিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল! আমার বুকে তখন আকাশের বাজ হাঁকিতেছিল, হাজার তোপ এক সঙ্গে দাগিতেছিল, চোখে দুনিয়া মিলাইয়া যাইতেছিল!

যখন চেতনা হইল, তখন দেখি, জুয়ান্ বান্দার দল আমার চারিদিকে দাঁড়াইয়া। ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখি, শাহজাদা মহম্মদ আর এই শাহজাদী—সম্মুখে দাঁড়াইয়া। একটা রূঢ় স্বর কাণে গেল,—মট্টীমে গাড় ডালো—

ব্যস! তারপর অন্ধকার, চির-অন্ধকার! কালো হাব্‌শী বাঁদী এই কালো মাটীর তলে মিশাইলাম। কিন্তু আলো,—ওগো সেই ক্ষণিকের আলো! এই কালো দেহের আঁধারে যে-আলোর সন্ধান পাইয়াছিলাম—সেই যে সোহাগ, আদর, চুম্বনের শত সহস্র ধারায় যে আলোর লহর ছুটিয়াছিল, কৈ, কৈ, কোথায় সে! তাহারি একটা কণার সন্ধানে নিত্য আমি শুধু ঘুরিয়া মরি—কিছুই মেলে না তো! কত আশায় চারিধারে ঘুরিয়া মরি! শেষে নিশান্তে নৈরাশ্যের বোঝা মাথায় লইয়া ঐ মাটীর তলে আবার আমার আঁধার কারায় ফিরিয়া যাই!

আমার চোখের সম্মুখে সে বাগান কোথায় গেল! ঘর, দীঘি, দীঘির জল, শাহজাদা, শাহজাদী সব গেল, তবু আমার প্রাণে এ আশার যে আর বিরাম নাই! ওগো, যদি সব গেল, তবে এই আমার আশার রেশটুকুও নিবিয়া যাক্ না! আমারো এ আসা-যাওয়ার ছুটি হয় যে, সব ফুরায় যে, তাহা হইলে—

তরুণী বসিয়া গুমরিয়া-গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি হতভম্বের মত তার পানে চাহিয়া রহিলাম। ইতিহাসের সাল-তারিখে-ভরা অলিগলির মধ্য দিয়া মন আমার সেই নিষ্ঠুর শাহজাদা মহম্মদকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল,—কোথায়, সে কোথায়?

হঠাৎ চমক ভাঙিল—চোখ চাহিয়া দেখি, বন্ধুর দল গায়ে বিষম ধাক্কা দিয়া ডাকিতেছে,—রাত হয়ে যাচ্ছে যে হে, ওঠো, ওঠো। তোমায় খুঁজে খুঁজে সব হায়রাণ। এখানে প'ড়ে ঘুমোচ্ছ, বাঃ! এসো, বাড়ী যাওয়া যাক্!

একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম,—মাথার উপর আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়াছে—চাঁদ যেন জ্যোৎস্নার বন্যা বহাইয়া দিয়াছে! সেই জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ী ফিরিলাম।

গঙ্গাস্নানের ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঘাটের পথে

বরানগরের বুকের মধ্য দিয়া হেজার্ রোড গিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর খানিক উত্তরে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়াছে। দশহরার দিন। বেলা ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। পথে স্নানার্থী নর-নারীর ভিড়। এই ভিড়ের মধ্য দিয়া এক বর্ষীয়সী মহিলা, সঙ্গে বারো-তেরো বছর বয়সের একটি মেয়ে, গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন। বর্ষীয়সীর হাতে ছোট একটি ঘটী, ঘটীতে গঙ্গাজল; বালিকার হাতে গামছায় জড়ানো ভিজা কাপড়।

পথের বাঁ-দিকে একটা পুকুর—জলের রঙ যেন কালি গোলা, তার উপর ময়লা ফেনা। পাড়ের উপর হেলিয়া-পড়া একটা নারিকেল গাছ, তার পরেই ভাঙা ইটের স্তূপ। এই স্তূপের পাশে একটা বাতাবি লেবুর গাছ—অজস্র ফলে ভরা। বাতাবি-গাছের পাশে রাজ্যের জঙ্গল—কালকাসিন্দা আর গাবভ্যারেণ্ডার গাছই বেশী। পাড়ার ক'টি ছেলেমেয়ে জটলা করিয়া কেহ কোনো বন-ফলে থাবড়া মারিয়া সশব্দে তাহা ফাটাইতেছে, কেহ-বা গাবভ্যারেণ্ডার ডাল ভাঙিয়া তারি রসে ফেনার বুদ্বুদ ফুটাইয়া ফুঁ দিয়া বাতাসে উড়াইতেছে। এই পড়ো জমির পাশে একখানি সুদৃশ্য বাড়ী; জীর্ণ পড়িয়াছিল; এখন মিস্ত্রী-মজুর লাগিয়া তার সজ্জা-সংস্কার করিতেছে। বাড়ীর সামনে খানিকটা এলোমেলো জঙ্গল। একজন যুবা হাতে কোদাল লইয়া সেই জঙ্গল সাফ করিতেছিল।

বর্ষীয়সী সেই বাড়ীর সামনে আসিয়া বালিকাকে কহিলেন—এই যে একটা মজুর খাটচে রে। একেই বলি···বাঙালী দেখচি—খোট্টা নয়।

বর্ষীয়সী বাড়ীর সামনে দাঁড়াইলেন। যে যুবা জঙ্গল কাটিতেছিল, তাহাকে কহিলেন—ওরে বাছা, শুনতে পাচ্ছিস্?

যুবা তখন কোদাল রাখিয়া ফিরিয়া চাহিল। বর্ষীয়সী কহিলেন,—আমাদের বাড়ী এই কাছেই। বড্ড জঙ্গল হয়েচে, তা লোক পাই না। তুই আসবি? জঙ্গলটা কেটে পরিষ্কার করে দিবি? পয়সা দেবো।

যুবা ক্ষণেকের জন্য অবাক্ হইয়া বর্ষীয়সীর পানে চাহিয়া রহিল, মনে মনে ভাবিল, বাঃ! আমায় ইনি মজুর ঠাওরাইয়াছেন। এ যে অদ্ভুত ভুল দেখচি! তবে এ ভুলের নজীর আছে! অত-বড় পণ্ডিত হাইকোর্টের জজ যে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়···তিনি এক দিন গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছিলেন, পথে কে তাঁকেও পূজারী-ব্রাহ্মণ ভাবিয়া নিজের বাড়ী ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাঁকে দিয়া যে ইতু পূজা করাইয়া দক্ষিণা দিয়া ছাড়িয়াছিল! আমি সার গুরুদাস নই, সামান্য লোক! হাতে কোদাল, জঙ্গল কাটিতেছি! আমাকে মজুর ভাবা আর বিচিত্র কি! তা বেশ, উনি যখন মজুর ভাবিয়াছেন, তখন নয় মজুরী করিয়াই দেখা যাক্। মন্দ কি! মজা তো আছে! হাসিয়া সে কহিল—কেন করবো না, মা? আমার তো এই কাজ।

বর্ষীয়সী কহিলেন—তা'হলে আসবি বাছা? আমার লোকজন নেই, কে বা ডাকতে আসবে! আমার সঙ্গে এখন এসে যদি বাড়ী দেখে যাস্···

যুবা কহিল—বেশ তো মা, চলুন।

কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছিয়া যুবা বাহিরে আসিল। তার পরণে মোটা কাপড়, গায়ে একটা ফতুয়া, মাথার চুল খুব ছোট করিয়া ছাঁটা, গোঁফ-দাড়ি কামানো, মুখের ও দেহের বর্ণ যেটুকু দেখা যাইতেছে, তাতে ময়লা বলিলে অন্যায় হয় না! তবে কুলির কাজ করিলেও তাকে নোংরা বলা চলে না। সাধারণ ধাঙড়ের মত তার বেশভূষাও নয়!

বর্ষীয়সী কহিলেন—কত করে রোজ নিবি?

যুবা কহিল—আগে জঙ্গল দেখি, মা। তারপর বলবো?

কথাগুলি বেশ নম্র আর বলার ভঙ্গীতে কেমন একটু মাধুর্য্য আছে! বর্ষীয়সী কহিলেন—এখানে মাস দুয়েক আমরা এসেচি। তা, বড় জঙ্গল, বাছা। সামনে বর্ষা,—শেষে কি ম্যালেরিয়ায় ভুগবো! লোকজন তো আর নেই—কেই বা ধাঙড়-মজুর ডেকে দেয়! আজ তোকে পেলুম…

বর্ষীয়সী সধবা। তাঁর পরণে চওড়া লাল-পাড় শাড়ী, অঙ্গে সেমিজ নাই। মুখে-চোখে দারিদ্র্যের ছোপ লাগিয়া থাকিলেও তাঁকে দেখিলে সম্ভ্রম হয়।

কথায় কথায় বর্ষীয়সী বাড়ী আসিয়া পৌছিলেন। লোণা-ধরা ইটের প্রাচীর, মাঝে মাঝে ভাঙিয়া গিয়াছে। প্রাচীরের মাঝখানে কাঠের দরজা। দরজার কাঠে কবে কোন্ সেই মান্ধাতার আমলে কি রঙ পড়িয়াছিল, এখন তার কোনো চিহ্নও নাই! রৌদ্র, জল আর ধূলা খাইয়া কাঠের অঙ্গে এক বিচিত্র বর্ণ বাহির হইয়াছে—গা স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে। দ্বার খুলিলে সামনেই জঙ্গল—এত রকমেরও গাছ বাহির হইয়াছে। সেই জঙ্গল মাড়াইয়া গিয়া সিঁড়ি। সিঁড়ির পর রোয়াক। রোয়াকের সিমেণ্ট ফাটা—মাঝে

মাঝে সিমেণ্ট উঠিয়া খানা-ডোবা হইয়াছে। এই রোয়াকের উপর জীর্ণ একতলা বাড়ী। রোয়াকের নীচে বাঁশের মাচায় কুমড়া শাক—তার কাছাকাছি কয়েকটা ঢ্যাঁড়স-গাছ। এক কোণে লাল করবীর ঝাড়।

বর্ষীয়সী কহিলেন—কি রকম জঙ্গল দেখচিস্! সাপখোপ যে কত আছে, সংখ্যে নেই! ভয়েই মরি! এখন সামনের এই জঙ্গল সাফ করতে হবে। কুমড়ো শাকগুলো না মরে, ঢ্যাঁড়স গাছগুলোও কাটবিনে, আর তুলসীগাছ যে ক'টা পাবি, সেগুলো বাঁচিয়ে সাফ করবি, বুঝলি? কি নিবি, এখন বল্ দিকিনি……

যুবা কহিল—আপনিই বলে দিন্ মা—

বর্ষীয়সী কহিলেন—ছু' আনা দেবো। আর বলিস্ তো জল-পানির জন্মে ছু' পয়সা…কাজ শেষ হয়ে গেলে।

নগদ দশ পয়সা! যুবা মনে মনে হাসিল; তারপর কহিল—বেশ, আপনার যা খুসী তাই দেবেন, মা। কাজ তো তেমন পাই না—দিন-কাল যা পড়েচে! যুবা বালিকার পানে চাহিল। বালিকা রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়াছিল—পুতুলের মত নিস্পন্দ! এই জঙ্গল সাফ করিতে মোটে দশ পয়সা! মার কথা বালিকার কানে বুঝি বাজিল! সে ডাকিল—মা—

মা মেয়ের পানে চাহিলেন। মেয়ে সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি মাকে কি বলিল। মা বলিলেন—এ যেন ফাও! ঐ তো বড় লোকের বাড়ী পয়সার কাজ করচে!—এ নয় গরীবের একটা কাজ স্থবিধে করেই করে দিলে। তা ছাথ্ বাছা, দশ পয়সায় পারবি তো?

যুবা হাসিয়া কহিল—কেন পারবো না, মা? একটা পয়সা কে দেয়. তার ঠিক নেই! এ তো খেটে দশ পয়সা তবু পাবো।

বর্ষীয়সী কহিলেন—তা'হলে কখন আসবি, বল্ বাছা? বাবুদের বাড়ীর কাজ···ও তো একদিনে হবার নয়।···

যুবা কহিল—তাছাড়া ও কাজ দু'দিন হাতে রেখে করবো'খন। বলেন তো, আজ থেকেই এখানে কাজে লাগি—তবে এ ও এক দিনে হবে না।

বর্ষীয়সী কহিলেন—তা তো দেখচি, বাছা। আমার তেমন তাড়া নেই। এ কাজ নয় একটু সময় ক'রে করিস্—তবে দশ পয়সার বেশী পাবি নে ···· ফুরোন হলো তোর সঙ্গে···কেমন?

যুবা হাসিয়া কহিল—তাই হবে মা। তা'হলে আমি বিকেলের দিকে আসবো'খন···এই তিনটে-চারটের সময়।

বর্ষীয়সী কহিলেন—ঠিক আসিস্. বাছা। না হলে আমায় আবার অন্য লোক ঠিক করতে হবে।

যুবা কহিল—আসবো বৈ কি মা······

যুবা চলিয়া আসিতেছিল; দ্বার-প্রান্তে আসিয়া আর একবার ফিরিয়া চাহিল। বালিকা তখন দেওয়ালে-খাটানো দড়িতে ভিজা শাড়ী মেলিয়া দিতেছিল।

পথে আসিয়া যুবা প্রাণ খুলিয়া একবার হাসিল। সুশ্রী সুপুরুষ সে নয়, এ কথা সে ভালো করিয়াই জানে। তা হোক···তা বলিয়া লোকে তাকে ধাঙড় বুঝিবে, নিজের চেহারার সম্বন্ধে এমন বদ ধারণাও তার কোনো কালে ছিল না। ফিজিক্সে এম-এ শিবনাথ মিত্র······কলিকাতা কলেজের ছাত্রমহল যার নামে পাগল··· সে ধাঙড়ের কাজ করিয়া নগদ দশ পয়সা রোজগার করিতে চলিয়াছে, এ কথা যে কোনো আজগুবি গল্পের লেখকও কল্পনা করিতে সাহস পাইত না! আর এত-বড় আজগুবি কাণ্ড আজ সত্যই ঘটিতে বসিল!

এখানকার এই বাড়ীখানা তার পিতার কাছে বন্ধক ছিল। ঋণী টাকা শোধ দিতে পারে নাই, বাড়ীখানা তাই কোবালা করিয়া তাকে লিখিয়া দিয়াছে। কলিকাতার কাছে বাড়ী; সহরের কোনো কোলাহল নাই। গ্রীষ্মে কলেজের ছুটী হইলে এ-বাড়ী সে মেরামত করাইতেছে, নিজে থাকিয়া সব তদ্বির করিতেছে। এইখানে আসিয়া মুক্ত প্রকৃতির বুকের উপর বাস করিবে. ষ্টীমারে করিয়া কলেজ যাইবে—দু'বেলা গঙ্গার হাওয়া,...তাছাড়া এই খোলা বাতাস, পাখীর গান আর ফুল-ফল! এবং তরি-তরকারী সব নিজের হাতে ফলানো, এ তার আজন্মের সাধ! তাই এখানে আসা! কিন্তু আজিকার প্রভাতে এ কি বিচিত্র অসম্ভব কাণ্ড ঘটিয়া বসিল!

শিবনাথ ভাবিল, দেখা যাক, ঘটনাচক্র কোথায় গিয়া দাঁড়ায়! কিন্তু খুব হুঁশিয়ার—ধরা না পড়িয়া যাই!

শিবনাথ ধীরে ধীরে গৃহে আসিয়া ভৃত্যকে ডাকিল—বেচু...

ভৃত্য আসিলে শিবনাথ কহিল - কোদালটা তুলে রাখ্। আর তেল এনে দে...ছাতাটাও আনিস্। গঙ্গায় দুটো ডুব দিয়ে আসিগে, চ। আজ দশহরা রে। বেলা হতে চল্লো। তুইও আজ আর পুকুরে নাস্ নে—গঙ্গায় নাইবি। দশহরায় গঙ্গাস্নান করলে দশবিধ পাপ ক্ষয় হবে, বুঝলি? গঙ্গাস্নানের ফল তো জানিস্ না.. সহস্র অশ্বমেধের ফল। অশ্বমেধ জানিস্?—যজ্ঞ, যজ্ঞ, মস্ত ভারী যজ্ঞ রে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন কাটা

কলেজে গ্যালভানিক ব্যাটারী আর ওম্স্ ল'র চর্চ্চায় মত্ত থাকিয়া যে-শিবনাথ দুনিয়ার আর কোনোদিকে এতকাল চাহিবার অবসর পায়

নাই এবং সময়কে যে অত্যন্ত দ্রুত-গতিশীল বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছে, আজ দুপুরে তার কেবলি মনে হইতেছিল, সময় যেন আর কাটিতে চায় না! টম্‌সনের বিজ্ঞানের বহিখানা ঘরের কোণে পড়িয়া আছে। স্প্রিংয়ের ছোট খাটখানার উপর হইতে রাজ্যের ইংরাজী বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া শিবনাথ সেই খাটে পড়িয়া প্রহর গণিতেছিল। একধারে দেওয়ালে-সংলগ্ন ঘড়ি··· তার পেণ্ডুলামটা দুলিয়া দুলিয়া কিছুতেই আর বড় কাঁটাটাকে আগাইয়া লইয়া যাইতে পারিতেছে না! বাইরে মিস্ত্রীদের কর্ণিক মারিয়া ইট ভাঙার শব্দ হইতেছিল···আর মাঝে মাঝে তাদেরি চীৎকার—এ সোমালি, ইট্টা লে আও, ইট্টা। বহু-দূর গগন-পথে দু' একটা উড়ন্ত চিলের নৈরাশ্যের আর্ত্ত রবও সেই সঙ্গে ধ্বনিয়া উঠিতেছে। শিবনাথ বিরক্ত হইল। দশ পয়সা রোজগারের বিলম্ব? না। প্রাণের মধ্যে যে চব্বিশ বৎসর বয়সটা এতদিন বইয়ের আড়ালে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সহসা সে যেন আজ জাগিয়া উঠিয়াছে! এবং জাগিয়াই বুঝিয়াছে, এ পৃথিবী শুধু জড় পঞ্চভূতের সমষ্টিমাত্র নয়! এখানে গান আছে, গন্ধ আছে, আলো আছে, বর্ণ আছে, মাধুরী আছে, শোভা আছে। এই ইট-কাঠ-চুণ-সুরকীর বন্ধন কাটিয়া ওই ছায়ায় ঢাকা পথে বাহির হইলেই যেন সে আলো, সে বর্ণ, সে গান, সে গন্ধের খানিকটা পরিচয় অনায়াসে পাওয়া যায়! প্রাণ তা পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া পাইবে, তা সে জানে না। তবু মনে হইতেছিল, বাঁধা রুটিনের মধ্যে এই দেওয়ালের আড়ালে আর পড়িয়া থাকা যায় না! বাহির হইবার জন্য পা দুইটা মুহুর্মুহু চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে! কিন্তু বাহির হইয়া কোথায় যাইবে?···ও-বাড়ীতে? কিন্তু তাঁদের সময় দেওয়া হইয়াছে, বেলা

তিনটা। তার পূর্ব্বে যাওয়া খারাপ দেখায়! এখন একটা বাজিয়াছে —কাজেই এ দীর্ঘ দু' ঘণ্টা কাল···শিবনাথ ভাবিল, মিস্ত্রীদের কাজ-কর্ম্ম দেখিয়া কাটানো ছাড়া উপায় কি!···

ঢং-ঢং-ঢং। মিস্ত্রীদের কাজ-কর্ম্মের ফাঁক দিয়া শিবনাথের মন ছিল ঐ ঘড়ির পানে। যেমন তিনটা বাজা, অমনি সে সকালের সেই ছোট কাপড় পরিয়া, ফতুয়া গায়ে দিয়া খালি পায়ে পথে বাহির হইয়া পড়িল—হাতে সেই কোদাল। যৌবনের দিগ্বিজয়-যাত্রার পক্ষে অস্ত্রখানা অত্যন্ত হাস্যকর, সন্দেহ নাই! কিন্তু কোদাল ফেলিয়াও যাওয়া চলে না!

আকাশে মেঘ জমিয়া রৌদ্রের তেজটুকুকে ঢাকিয়া দিয়াছিল। পথের ধারে মস্ত জামরুল গাছ—গাছে সাদা সাদা অজস্র জামরুল। কোথায় কোন্ একটা ঝোপে বসিয়া কি একটা পাখী ডাকিতেছিল। শিবনাথ ভাবিল, পাখীর গলায় সত্যই মধু ঝরে! কবিদের কল্পনা তাহা হইলে নিছক মিথ্যা নয়!

সেই বাড়ী। দ্বার ভেজানো ছিল। দ্বার খুলিয়া ভিতরে ঢুকিতেই দেখে, রোয়াকের উপর মাদুর বিছানো। মাদুরে বসিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তাঁর সামনে ক'খানা পুরানো ইংরাজী বই—ছ'পেনি সংস্করণ বলিয়া মনে হইল—একটা দোয়াত, কলম ও মোটা খাতা। শিবনাথ ভিতরে প্রবেশ করিতেই প্রৌঢ় চাহিয়া দেখিলেন, কহিলেন —ও! তুই এসেছিস্! তোরি সঙ্গে গিন্নী-ঠাকরুণের কথা হয়েছিল বুঝি, আজ?···এই জঙ্গল সাফ করার জন্য···?

শিবনাথ কহিল—আজ্ঞে, কর্ত্তা।

প্রৌঢ় ডাকিলেন—ট্যাঁপা···

ভিতর হইতে উত্তর আসিল,—যাই বাবা। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই বালিকার প্রবেশ। মাথার চুল খোলা, পিঠ বহিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে,

যেন শ্রাবণের এক রাশ মেঘ! বালিকার পরণে একখানি তালি-দেওয়া বহু পুরানো চাঁদের-আলো রঙের শাড়ী। কালের স্পর্শে কাপড়ের হলুদ রঙের উপর সাদা সাদা আঁশ ফুটিয়াছে। শিবনাথের পানে চাহিতেই দু'জনে চোখোচোখি হইল এবং ট্যাঁপা চকিতে চোখ ফিরাইল। প্রৌঢ় কহিলেন—ওঁকে বল্‌গে যা, সেই মজুর এসেচে। আর আগে কোন্ ধারটা সাফ করবে, জিজ্ঞাসা কর্। বালিকা এক পাক ঘুরিয়া চলিয়া গেল। তার আঁচলে বাঁধা ছোট চাবির রিংটা সশব্দে দুলিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় কহিলেন—আমার একটু ফুলের সখও আছে···বুঝলি? তা এ জঙ্গল সাফ হয়ে গেলে ওখানে কিছু ফুলের চারাও লাগাতে চাই। গাছের জোগাড় করে দিতে পারবি? তোরা তো এখানকার বাসিন্দে···আমি নতুন এসেচি···তবে দাম শস্তা হওয়া চাই।···তা হবে না কেন? এ তো আর কলকাতা সহর নয়···কি বলিস্, পারবি?

এ প্রস্তাব মন্দ নয়! জঙ্গল সাফ হইলেও কাজ ফুরাইবে না, গাছের চারা লাগানো কাজ জুটিয়া যাইবে! শিবনাথ কহিল—আজ্ঞে, তা পারবো না কেন? ভালো ভালো বেল, যুঁই, রজনীগন্ধা, মল্লিকা, টগর—তা আমি খুব শস্তায় এনে দেবো, কর্ত্তা।

ইতিমধ্যে বর্ষীয়সী আসিয়া দেখা দিলেন—একা। প্রৌঢ় কহিলেন,—তোমার লোক তো এসেচে গিন্নী—তা কোন্ দিকটা আগে সাফ করবে, বলে দাও। আমি ওকে বলছিলুম, ফুলগাছের চারা লাগাবার কথা···ও চারা এনে দেবে, দামেও শস্তা হবে, বলচে।

গৃহিণী কহিলেন,—বেশ তো। তোমার অত সখ বলেই না! তা ছাড়া এখানে বাস করতেই হবে যখন···

বর্ষীয়সী জায়গা দেখাইয়া দিলেন,—এইদিকটা আগে। শিবনাথ যে-আজ্ঞে বলিয়া কোদাল লইয়া কাজে নামিল।

কতকগুলা কাটিতেই তার হাত ভারী হইয়া উঠিল। অনভ্যস্ত হাত! তার উপর আনাড়ি! গাছ কাটিতে পা না কাটিয়া বসে! কোদাল রাখিয়া শিবনাথ দাঁড়াইল। প্রৌঢ় নামিয়া আসিয়া তার সামনে দাঁড়াইলেন, কহিলেন,—একটা ঝুড়ি চাই? না?

শিবনাথ কহিল—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

প্রৌঢ় ডাকিলেন—ট্যাঁপা......

আবার সেই বালিকা আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইল। ট্যাঁপাই এ-বাড়ীর সব! অর্থাৎ কর্ম্মচক্র ঘুরাইতে হইলেই এই ট্যাঁপার ডাক পড়ে! প্রৌঢ় কহিলেন,—একটা ভাঙা ঝুড়ি-টুড়ি দিয়ে যা দিকি—এগুলো ফেলতে হবে তো।

বালিকা চলিয়া গেল। প্রৌঢ় কহিলেন,—তোমায় বাঙালী দেখচি। ভালো। খোট্টাদের জ্বালায় জন-মজুরী করেও বাঙালীর আর খাবার জো নেই।

শিবনাথ কহিল,—আজ্ঞে, না।

প্রৌঢ় কহিলেন,—তোমার নাম কি?

শিবনাথ মুহূর্ত্ত ভাবিল, তারপর সতর্কতা সত্ত্বেও ফস্ করিয়া তার মুখ দিয়া সত্য কথাই বাহির হইল। সে কহিল,—শিবু।

প্রৌঢ় কহিলেন,—শিবু! বাঃ, বেশ নাম। তা তুমি অন্য কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা ছাখোনা কেন! এই যেমন, লোকের বাড়ী চাকরি-বাকরি! জোয়ান আছো!

শিবনাথের চেহারার মধ্যে এমন কিছু বুঝি প্রৌঢ় লক্ষ্য করিলেন, তাই সহসা 'তুই' না বলিয়া তাকে এবার এই 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন!

শিবনাথ কহিল,—আজ্ঞে, পাই কৈ! তা'ছাড়া……

তার মাথায় বুদ্ধি জোগাইল। সে কহিল,—জাতে কায়স্থ…
তা'ছাড়া গাছপালার সখ একটু আছে…

প্রৌঢ় কহিলেন,—বটে! কিন্তু কায়েতের ছেলে হয়ে লেখাপড়া কিছু শেখোনি বাপু! এই ধাঙড়ের কাজ…

শিবনাথ কি ভাবিয়া কহিল,—আজ্ঞে, একটু-আধটু শিখেছিলুম। ইংরিজীতে নামটা সই করতে জানি।

প্রৌঢ় কহিলেন,—তাই তো! দেশের কি দুরবস্থাই হয়েচে।… কায়েতের ছেলে হয়ে…তা… তোমার বাপ-মা আছে?

শিবনাথ কহিল,—আজ্ঞে না, কেউ নেই।

—আহা! প্রৌঢ় একটু সমবেদনার দৃষ্টিতে শিবনাথের পানে চাহিলেন। ট্যাঁপা ইতিমধ্যে একটা ঝুড়ি আনিয়া দিল; তলায় প্রকাণ্ড ছিদ্র। প্রৌঢ় কহিলেন,—এর তলা যে একেবারে নেই রে! তিনি হাসিলেন; শিশুর মত সরল হাসি! হাসিয়া তিনি কহিলেন,—তা তলায় একখানা কলাপাতা দিয়ে নাও……

শিবনাথ কহিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই নেবো।

ট্যাঁপা চলিয়া যাইতেছিল, প্রৌঢ় কহিলেন,—আমার দোয়াত-কলম-কাগজপত্তরগুলো আপাতত তুলে রাখ্ তো মা…আজ আর লেখা হলো না। একবার কলকাতা যাবার কথা আছে…এই বেলা যাই।

ট্যাঁপা কহিল,—সকাল-সকাল ফিরো বাবা, রাত করো না। মেঘ করে রয়েচে, যদি বৃষ্টি নামে!

প্রৌঢ় কহিলেন,—তাই হবে। বেশী ঘুরবো না, আহিরীটোলায় যাবো শুধু…

ট্যাপা কহিল,—তোমার কাপড়-জামা ঠিক করে দি···

প্রৌঢ় কহিলেন,—হ্যাঁ।

ট্যাপা চলিয়া গেল। প্রৌঢ় শিবনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—তুমি তা'হলে দেখে-শুনে কাজ করো, বাবা···কায়স্থ তুমি,···ফাঁকি দিয়ো না যেন···ঘরের ছেলের মতন—এ বেলায় নয় এখানেই কিছু খেয়ো, গিন্নীকে আমি বলে যাচ্ছি।

শিবনাথ কহিল,—আপনার দয়া, কর্ত্তা।

প্রৌঢ় চলিয়া গেলেন। শিবনাথ কোদাল হাতে জঙ্গল কাটিতে লাগিল। বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিল। জঙ্গল কাটার তবু বিরাম নাই। রোয়াকের ঠিক নীচে খানিকটা জায়গা সাফ হইয়া গেল। সন্ধ্যা হয়-হয়, বর্ষীয়সী আসিয়া কহিলেন,—কিছু খেয়ে'নে বাছা···

শিবনাথ তাঁর পানে চাহিল—কাঁসিতে ভরিয়া তিনি মুড়ি আনিয়াছেন। কিসে লইবে, শিবনাথ বুঝিতে পারিল না; সে হাত বাড়াইল। বর্ষীয়সী কহিলেন,—কাঁসিতেই? তাই নে।

শিবনাথ কাঁসি লইয়া হাতের পানে চাহিয়া দেখে, নোংরা হাত।

সে কহিল,—একটু জল দেবেন? হাতটা ধোবো।

বর্ষীয়সী ডাকিলেন,—ট্যাপা, একটু জল নিয়ে আয় তো মা···

ট্যাপা জল লইয়া আসিল। শিবনাথের হাতে সে জল দিল। হাত ধুইয়া শিবনাথ সিঁড়িতে বসিয়া মুড়ি খাইতে সুরু করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চাল বাড়ন্ত

পরের দিন বিকালবেলা। রোয়াকে মাদুর বিছাইয়া কর্ত্তা সেই খাতায় কি লিখিতেছিলেন, আর শিবনাথ জঙ্গল কাটিতেছিল; মাঝে

মাঝে কর্ত্তার পানেও চাহিয়া দেখিতেছিল। কর্ত্তা খানিকক্ষণ লেখেন, আবার আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকেন। কি লিখিতেছেন? হিসাব? এত ভাবিয়া কত বৎসরের পুরানো হিসাব লিখিতেছেন? শিবনাথের বারবার কৌতূহল হইতেছিল, কর্ত্তা কি লিখিতেছেন জানিবার জন্য। কিন্তু মনকে সে পুনঃপুনঃ শাসাইয়া স্থির রাখিতেছিল, খবর্দ্দার! সে ধাঙড়, তার এ কৌতূহল অত্যন্ত অনুচিত, বেমানান্! তাছাড়া ধরা পড়িবার আশঙ্কা তাহাতে বিলক্ষণ! অবশ্য ধরা পড়িলে এমন কিছু ক্ষতি নাই! তবে এই বিচিত্র রোমান্স আর এক লাইন অগ্রসর হইবে না!

একজন, দুইজন, তিনজন লোক আসিয়া টাকার তাগাদা করিল। পাওনাদার! কর্ত্তা অত্যন্ত কুণ্ঠিতভবে সকলকেই আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—এই শনিবারটা! তারপর রবিবার সকালে কাহাকেও শুধু হাতে ফিরাইবেন না! আশ্বাস পাইয়া তারা বিদায় লইল, কিন্তু মুখে অপ্রসন্নতার বোঝা বহিয়া!

শিবনাথ ভাবিল, কর্ত্তা কি করেন? অফিস তো নাই। শনিবারে টাকা আসিবে, বলিলেন। বাড়ী ভাড়া? কলিকাতার বাড়ী ভাড়া দিয়া এখানে বাস করিতে আসিয়াছেন, বুঝি! কিন্তু যাই হোক, তার এত মাথাব্যথা কেন?

মাথাব্যথার একটু কারণ ছিল। এই পরিবারটির প্রতি তার কেমন একটু মমতা জাগিয়াছিল। আর ঐ মেয়েটি! আহা, বড় শান্ত! যেটুকু তাকে সে দেখে, শুধু ফাই-ফরমাস খাটিতেছে! তাও, নির্ব্বিবাদে, প্রসন্ন চিত্তে! নিজের যেন কোনো অস্তিত্ব নাই! এই ছোট্ট সংসারটুকুর মধ্যে সে যেন কেবলি শৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে! যার যেখানে বাধিতেছে, সেইখানেই সে আসিয়া হাতখানি

বাড়াইয়া বাধা সরাইয়া লইতেছে! তাছাড়া টঁ্যাপার বর্ণ এমন-কিছু নয় যে, তার পানে কারো নজর পড়িবে! তবে তার চোখ দুটি! এমন চোখ যে একবার দেখিলে বারবার দেখিতে ইচ্ছা হয়! ঘনকৃষ্ণ পল্লব, তার নীচে ডাগর টানা চোখ…তাহাতে ঐ যে কেমন একটা উদাস, অসহায় ভাব! কলেজে যখন সংস্কৃত কাব্য পড়িত, তখন একটা কথা সে পড়িয়াছিল, মৃগাক্ষি! মৃগের অক্ষি তেমন করিয়া দেখার সৌভাগ্য তার কখনো হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না! তবে এ দুটি চোখ দেখিয়া কবেকার সেই কলেজে-পড়া মৃগাক্ষি কথাটা তার বার-বার মনে পড়িতেছিল!

গৃহিণী আসিয়া কহিলেন,—ওগো, চাল যে বাড়ন্ত—কাল সকালেই চাই। না হলে…

কর্ত্তা কলম ফেলিয়া গৃহিণীর পানে চাহিলেন; কহিলেন,—কিন্তু শনিবারের আগে…তাইতো, মুদি এইমাত্র এসেছিল টাকার জন্য। কিছু না পেলে দেবে কি?

গৃহিণী দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। তিনি কহিলেন,—উপায়…?

কর্ত্তা কহিলেন,—কারো বাড়ী থেকে চেয়ে-চিন্তে…

গৃহিণী কহিলন,—টঁ্যাপাকে বলেছিলুম, তা ও আর পারে না! বলে, নিত্যিই তো এটা-সেটা…ওর ভারী লজ্জা করে!

কর্ত্তা ও গৃহিণীর মুখে নিরুপায়তার এমন বেদনা ফুটিয়া উঠিল!… তাঁদের কথাগুলা শিবনাথের কানে গেল। তার বুকখানা দরদে ফাটিয়া পড়িবার মত হইল! ওখানে বিলাস-ভূষণে সে জলের মত পয়সা ব্যয় করিতেছে, আর ঠিক তার বাড়ীর পাশেই এই বিপন্ন পরিবার… এমন বিপন্ন যে কাল মুখে অন্ন দিবে কি করিয়া, তার কোনো সংস্থান নাই! ‥

তাইতো! এখন এই বিপন্ন পরিবারটিকে এই দারুণ দুশ্চিন্তার হাত হইতে কি করিয়া সে রক্ষা করিবে!

সহসা বুদ্ধি জোগাইল। সে আসিয়া কহিল,—একটা কথা বলছিলুম, কর্ত্তা…

কর্ত্তা কহিলেন,—কি?

শিবনাথ কহিল,—আপনারা দয়া করে আমায় কাজ দিয়েচেন বলেই সাহস পাচ্ছি। তা'ছাড়া আপনাকে দেখে—শিবনাথ গৃহিণীর পানে চাহিল; চাহিয়া কহিল,—আমার নিজের মার কথা মনে পড়ে! ছেলে-বেলায় তাঁকে হারিয়েচি…ভালো মনে পড়ে না, তবু যেটুকু পড়ে, তাই থেকে মনে হয়, তিনি অনেকটা যেন আপনার মতই দেখতে ছিলেন…

মমতায় গৃহিণীর বুক দুলিয়া উঠিল। মার বুক! তিনি কহিলেন, —কি, বল্…

শিবনাথ একটা ঢোঁক গিলিয়া কহিল,—আমি যেখানে রেঁধে খাচ্ছিলুম, সেখানটায় চূণ-সুরকী এনে ফেলেচে—তাই রান্নার অসুবিধে হবে,…তা মা, আমায় দুটি খেতে দেন যদি আজ! কোথাই বা রাঁধি!…

এই কথাটুকু তার মুখে ফুটিবামাত্র গৃহিণীর মুখ এমন বিবর্ণ হইয়া উঠিল…শিবনাথ তাহা লক্ষ্য করিল; লক্ষ্য করিয়া কহিল,—পাঁচ সের চাল আমার কেনা আছে মা, সেই চালগুলি নিয়ে আসবো। দয়া করে যদি দুটি রেঁধে দেন!

গৃহিণীর দুই চোখ বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—বেশ, বাবা…তার আর কি! দুটি রেঁধে দেওয়া তা…

দুঃখে-ক্ষোভে গৃহিণীর স্বর রুদ্ধ হইল, কথাটা তিনি আর শেষ করিতে পারিলেন না।

শিবনাথ কোদাল রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। কর্ত্তা কহিলেন,—ওরি চালে নয় চালিয়ে দাও ক'টা দিন গো! শনিবারে বসাকের হাতে-পায়ে ধরে কিছু টাকা আনবোই। বইয়ের জন্য না দেয় তো ভিক্ষে করেও…

গৃহিণী নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—কিন্তু এমনি করে ক'দিন চলবে? তার উপর মেয়েটা বড় হয়ে উঠেচে!

কর্ত্তা কহিলেন,—ও-কথা বলো না। আমায় কোনো কথা মনে করিয়ে দিয়ো না। আমার সব মনে জেগে আছে, অষ্ট প্রহর! তবে ভেবে ফল নেই! তাই ভাবি না। অদৃষ্টের উপর সব ভার দিয়ে আমি বসে আছি। না হলে পাগল হয়ে যাবো!

গৃহের পথে শিবনাথের চিন্তার আর অন্ত ছিল না। সে কেবলি ভাবিতেছিল, কি করিয়া কয় সের চাউল কোনো দোকান হইতে কিনিয়া ইঁহাদের গৃহে পৌছাইয়া দেওয়া যায়! সে তো এঁদের পরিচয় জানে না! কর্ত্তার নামটাও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার তার সাহস হয় নাই! যদি ধরা পড়ে? ধাঙড়ে জঙ্গল সাফ করিতে আসিয়া কবে আর গৃহকর্ত্তার নাম-ধাম-পরিচয় জিজ্ঞাসা করে! সারা পথ ভাবিয়াও সে কোনো উপায় স্থির করিতে পারিল না। কি করিয়া পারিবে? জীবনে মানুষের কোনো পরিচয়, মানুষের সুখ-দুঃখ বা হাসি-অশ্রুর কোনো সংবাদ কোনো দিন সে রাখিয়াছে কি? ক্ষিতি, অপ্, তেজ ইহাদের স্থিতি-গতি …এই সব লইয়াই চিরদিন মাথা ঘামাইয়া আসিয়াছে! মানুষের রাজ্যে বাস করিয়া মানুষকে না জানিয়া তেজ, মরুৎ, ব্যোম …এই সবের তদ্বির করিয়া তো ভারী লাভ! জীবনে তারা কি সার্থকতাই বা আনিয়া দিবে! এই যে সামনেই এক মস্ত সমস্যার উদয় হইয়াছে—ক্ষিত্যপ্‌তেজের পায়ে মাথা খুঁড়িয়া মরিলে কিম্বা গালভ্যানিক ব্যাটারি ঘুরাইলেও যে তার সমাধান হইবে না!

গৃহে পৌঁছিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া শিবনাথ কহিল,—একটা থলেয় সের আষ্টেক চাল বার করে দে দিকিন্…

ভৃত্য অবাক হইয়া মনিবের পানে চাহিল। শিবনাথ কহিল,—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে! চট্‌পট্‌ দে…

তাড়া খাইয়া ভৃত্য থলিতে চাল ভরিয়া লইয়া আসিল, আসিয়া কহিল,—কোথায় নিয়ে যাবো?

শিবনাথ কহিল,—তোকে নিয়ে যেতে হবে না। আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

—আপনি! ভৃত্যের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বিস্ময়ে তার দুই চোখ ঠেলিয়া বাহির হইবার জো!

শিবনাথ কহিল,—হ্যাঁ, আমিই নিয়ে যাব। তুই নিজের কাজ কর্ গে। দোতলার বারান্দায় মিস্ত্রীরা আজ বিলিতি মাটী দিয়েচে তো?

বেচু কহিল,—হ্যাঁ।

শিবনাথ চালের থলি লইল। বেশ ভারী! তা হউক! বেচুকে বলিল—ত্যাখ্, আজ রাত্রে আমি বাড়ীতে খাবো না। নেমন্তন্ন আছে, বুঝলি!

কথাটা বলিয়া ভৃত্যের পানে না চাহিয়া চাউলের থলি বহিয়া সে আবার পথে বাহির হইল।

চাউলের থলি রোয়াকের উপর রাখিয়া সে ডাকিল,—মা-ঠাকরুণ…

গৃহিণী বাহিরে আসিলেন, কহিলেন,—এত চাল…

শিবনাথ কহিল,—কোথায় বা রাখি? তাই যা ছিল, সব নিয়ে এলুম।

তারপর? এ চালে নিজেদেরও আপাতত চলিবে। দাম নয় দিব, কিন্তু সে কথা কি করিয়া তোলা যায়? কর্ত্তা বলিয়াছেন,

না ই বলিলে! শেষে টাকা পাইলে যত চাল লওয়া হইবে, কিনিয়া পুরাইয়া দিলেই চলিবে! কিন্তু না বলিয়া চাল লওয়া—এ তো চুরি! তা'ও যা-তা চুরি নয়, চাল চুরি! চাল লক্ষ্মী!···গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন।

শিবনাথ কহিল,—দুটো চালে দু'বার নাই বা রাঁধলেন, মা। এই চালেই সকলের হয় যদি···চাল খুব খারাপ হবে না, বোধ হয়!

আঃ! গৃহিণী নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন; কহিলেন,—বেশ বাবা, তাই করবো। শিবনাথও বুঝিয়াছিল। সহসা এমন বুদ্ধি জোগাইয়াছে দেখিয়া নিজের উপর সে ভারী খুশী হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর পা-হাত ধুইয়া শিবনাথ রোয়াকের এক ধারে আসিয়া বসিল। কর্ত্তা মাদুর পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন,—এই দরিদ্র মজুরের মহত্ত্বে তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন। তার মহত্ত্ব? না, এ ভগবানের দয়া? যিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তার অন্নও তিনিই সংগ্রহ করিয়া দেন! নহিলে মজুর তো অনেক গৃহে খাটে, ঘটনাচক্র কি তা বলিয়া এমন কখনো দাঁড়ায়!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বজ্র ও বিদ্যুৎ

তার পরের দিন শিবনাথ আসিলে গৃহিণী বলিলেন,—এ দিকটা হয়ে গেছে। এবারে বাবা বাড়ীর মধ্যে উঠোনটা আজ সাফ করে দে। বড্ড দরকার। কি হয়ে যে আছে···সাপে কেন কামড়ায় না, তাই ভাবি।

শিবনাথ কোদাল হাতে ভিতরের উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। উঠানের এক ধারে ছোট একটা ঘর, ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। সেই জীর্ণ ঘরের পাশে দরজা। ট্যাপা একখানা কড়া মাজিয়া সেই দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। ওদিকে বুঝি একটা ছোট ডোবা আছে? তাই। শিবনাথ ট্যাপার পানে চাহিল। ট্যাপার করুণ মুখ আজ যেন আরো করুণ দেখাইতেছে! কেন?

আধ ঘণ্টা। ট্যাপা কড়া রাখিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। শিবনাথ ভাবিল, ও-ঘরে গোরু আছে? না। সে ঐ ঘরের দিকে চাহিয়া রহিল, কোদালটা পায়ের নীচে পড়িয়া। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট—ট্যাপা তবু বাহির হয় না! কি করিতেছে? শিবনাথের পা দুইটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। গিয়া দেখিবে? না। গৃহের দিকে চাহিল,...কোথাও কাহারো সাড়া নাই! বাড়ীটায় কেমন যেন নিঝুম ভাব!

সহসা...ও কি!...ফুঁপাইয়া কে যেন কাঁদিতেছে, না? কোথায়? শিবনাথ চারিদিকে চাহিল। ঠিক, ঐ ঘরে।...ট্যাপা? কিন্তু কেন কাঁদে?

শিবনাথ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। সে ভুলিয়া গেল, সে ধাঙড়, এখানে মজুরী করিতে আসিয়াছে! ট্যাপার ম্লান অসহায় চোখ দুটির কথা শুধু মনে জাগিতেছিল। কাল সে বুঝিয়াছে, কি দারিদ্র্যের মধ্যে এঁরা বাস করিতেছেন! সে একা—অভাব সে জানে না। অভাব কি! তার যা আছে, তাহাতে বিশজনের অভাব সে অনায়াসে ঘুচাইতে পারে! বেচারী ট্যাপা! বেচারী গৃহিণী! কর্ত্তা এ দারিদ্র্যের সঙ্গে অহরহ যুদ্ধ করিতেছেন! মনে সর্ব্বক্ষণ দারুণ অস্বস্তি! আর সঙ্গে সঙ্গে এ দু'জন নারীও...

শিবনাথ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের একখানা কপাট নাই, বাকীখানা জীর্ণ দেহে কোনোমতে ঝুলিয়া আছে! ঘরের মধ্যে মাটী আর ভাঙা ইটে বোঝাই স্তূপ! সেই স্তূপের উপর একধারে বসিয়া কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া ট্যাপা ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে! জীর্ণ শাড়ীর ফাঁক দিয়া বিকশিত অঙ্গের লাবণ্যটুকু···যেন খানিকটা ম্লান জ্যোৎস্না! শিবনাথ ডাকিল—শুনচো?

কোনো উত্তর নাই। শিবনাথ একেবারে আরো কাছে ঘেঁসিয়া আসিল। নাম ধরিয়া ডাকিবে? ক্ষতি কি! একটু সম্ভ্রম মিশাইয়া সে ডাকিল,—টেঁপু···

ট্যাপা চমকিয়া চাহিয়া দেখিল। ধাঙড়টা?···তার এমন স্পর্দ্ধা, এখানে তার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়!—শুধু দাঁড়ানো নয়, দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া ডাকে! সে রাগে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল,—তুই এখানে?

শিবনাথ সে স্বরে চমকিয়া উঠিল। নিমেষে সে বুঝিল, ঠিক কথা! সে তো ফিজিক্সের প্রোফেসর নয়—ধাঙড়! তবু সঙ্কোচে মৃদু স্বরে কহিল,—কান্নার শব্দ পেলুম কি না!

ট্যাপা রাগিয়া কহিল,—আমি কাঁদি কি যা করি তোর কি? চলে যা··

শিবনাথ কহিল,—চলে যাচ্ছি। কিন্তু তা···তা···কেন কাঁদচো তুমি?

বাধা দিয়া ট্যাপা কহিল—এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর! তবু দাঁড়িয়ে রইলি? যা চলে, নয়তো এখনি মাকে ডাকবো আমি!

শিবনাথ কহিল,—আমি সামান্য মজুর, তা আমি জানি···তবু একজনকে কাঁদতে দেখলে···

ট্যাপা ঝঙ্কার দিয়া কহিল,—আমি কাঁদিনি। কে বললে, আমি কাঁদচি?

শিবনাথ কহিল,—তোমার চোখ।…তা'ছাড়া কান্নার শব্দ পেলুম কি না!

ট্যাপা কহিল,—যদিই কাঁদি, তোর কি? ট্যাপা শিবনাথের পানে চাহিল। কি কুণ্ঠিত বিশুষ্ক মুখ শিবনাথের! ট্যাপার চট্ করিয়া মনে পড়িল, হোক ধাঙড়, আগের দিন দয়া করিয়া এই ধাঙড়ই চাউল আনিয়া দিয়া তাদের মান বাঁচাইয়াছে, প্রাণ বাঁচাইয়াছে! সে চুপ করিল, আর কোনো কথা কহিল না।

শিবনাথ কহিল,—আমার একটা অপরাধ হয়েচে…আমায় তোমরা মাপ করো,…মানে, আমি সত্যি-সত্যি মজুর নই!

ট্যাপা যেন আকাশ হইতে পড়িল! অতি বিস্ময়ে তার অশ্রু কোথায় উবিয়া গেল! সে শিবনাথের পানে ফিরিয়া চাহিল।

শিবনাথ কহিল,—আমার নাম শিবনাথ মিত্র। প্রেসিডেন্সি কলেজের নাম শুনেচো? কলকাতার সব-চেয়ে বড় কলেজ… প্রেসিডেন্সি কলেজ…?

ট্যাপার বিস্ময় আরো বাড়িল। সে কহিল,—নাম শুনেচি।

শিবনাথ হাসিল; হাসিয়া কহিল,—সেই কলেজের আমি প্রোফেসর।

প্রোফেসর কথার অর্থ কি, ট্যাপা জানে। শিবনাথের কথায় সমস্ত পৃথিবীখানা চকিতে যেন তার পায়ের তলা হইতে সরিয়া গেল! সে যেন শূন্যে ঝুলিতেছে!

শিবনাথ কহিল,—নিজের বাড়ীর সাম্‌নে এমনি নিজে সখ করে কোদাল নিয়ে বাগানের জঙ্গল সাফ করছিলুম। তোমার মা মজুর মনে করে যখন এ বাড়ীর জঙ্গল সাফ করতে ডাকলেন, তখন শুধু

মজার লোভেই এসেছিলুম। কিন্তু এসে তোমার বাবাকে-মাকে এমন ভালো লাগলো···আর···

টঁ্যাপা শিবনাথের পানে চাহিয়া ছিল ; শিবনাথ হাসিয়া কহিল,—আর তোমার ঐ অক্লান্ত পরিশ্রম, ম্লান চোখ···

টঁ্যাপা মুখ নত করিল। কোথা হইতে রাজ্যের লজ্জা আসিয়া তাকে ঘিরিয়া ধরিল ! সে চলিয়া যাইতেছিল। বাধা দিয়া শিবনাথ কহিল,—যেয়ো। কিন্তু দয়া করে বলো, কেন তুমি কাঁদছিলে ? কোনো বিপদ ? বলো। যদি আমি কোনো উপায় করতে পারি···?

টঁ্যাপা কি বলিবে ? সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল !

কুমার-সম্ভবের কবি লিখিয়া গিয়াছেন—ন যযৌ, ন তস্থৌ। তার ভাবখানাও ঠিক তেমনি !

শিবনাথ কহিল—তোমার বাবার পরিচয় জানবার জন্য এমন ইচ্ছা জেগে আছে ! বসে বসে কি উনি লেখেন···কিন্তু মজুরী করতে এসেচি, তাই কাকেও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়নি।

টঁ্যাপা একটা নিশ্বাস ফেলিল। পিতার প্রসঙ্গে কঠিন পৃথিবীখানা আবার তার পায়ে ঠেকিল। সে কহিল,—আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত জয়গোপাল দত্ত। বাবার নাম শোনোনি·· ?

কথাটা বলিয়াই সে জিভ কাটিল। তুমি বলিয়া কথা কহিতেছে ! ইনি তো মজুর নন্—বড় লোক, কলেজের প্রোফেসর। সে মুখ নীচু করিল। পরক্ষণে কহিল—বাবার নাম শোনেন নি ? বাবার লেখা বাংলা বই আছে, অনেক।

শিবনাথ কহিল—উনি অথর ? ও !···তা কি বই আছে ? অর্থাৎ আমি বাংলা বই বড়-একটা পড়িনি, পড়বার অবসর পাইনি কখনো।

ট্যাপা কহিল,—নারী-রাক্ষসী, নরুণে খুন, জাল জহরলাল, শাস্ত-লালের শয়তানী···

শিবনাথ কহিল,—নাম শুনে···অর্থাৎ ডিটেক্‌টিভ নভেল বুঝি ?

ট্যাপা কহিল,—হ্যাঁ। বই লিখেই বাবা সংসার চালান। আহিরীটোলার জনার্দ্দন বসাক বাবার বই নেয়, নিয়ে টাকা দেয়, আর সেই বই সে ছেপে বিক্রী করে।

শিবনাথ কহিল,—তাতে তো অনেক টাকা হয়। শুনেচি, পাব্লিশাররা লেখকদের অনেক টাকা দেয়।

ট্যাপা কহিল,—না। বই-পিছু একশো টাকা। তা মানুষ কত লিখবে! তা'ছাড়া দেনা আছে। আমার দিদির বিয়ে দিতে আমাদের বাড়ী বাঁধা পড়ে। সে ধার তো শোধ হচ্ছে না। তার সুদ দিতেই মাসে ষাট সত্তর টাকা বেরিয়ে যায়। তা সেই ধার বেড়ে চলেচে। তারা শাসাচ্ছে, বাড়ী বেচে নেবে। বাড়ী গেলেও তাদের পুরো টাকা আদায় হবে না।

শিবনাথ কহিল,—সবশুদ্ধ কত টাকা ধার ?

ট্যাপা কহিল,—প্রায় চার-পাঁচ হাজার। বাবা বলেচেন, বাড়ী তো রাখা যাবেই না—আর তারা যে রকম লোক, বাকী টাকাও যেমন করে পারে আদায় করে নেবে!

শিবনাথ কহিল—তোমার ভগ্নীপতি এ-সব জেনেও চুপ করে আছেন ?

ট্যাপা একটা নিশ্বাস ফেলিল, কহিল,—দিদি তো নেই।··· বিয়ের এক বছর পরে মারা গেছেন!

বাহিরে সহসা কক্কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বিদ্যুতের লেলিহান শিখা ভাঙা ঘরের ফাটলে ফাটলে দৈত্যের রক্ত-জিহ্বার

মতই লক্‌লক্ করিয়া ছুটিয়া গেল! দু'জনে শিহরিয়া উঠিল। শিবনাথ স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্! সারা পৃথিবীখানা যেন তার চোখের সাম্‌নে আগুনের গোলায় রূপান্তরিত হইয়া ঘুরিতে লাগিল! হায় রে, যার জন্য এ ঋণ, এই দারিদ্র্য, সে……

সহসা বাতাস বহিল। সারা পৃথিবী যেন এ দারুণ হিংসা দেখিয়া শিহরিয়া নিশ্বাস ফেলিল! শিবনাথ কহিল—তোমরা কায়স্থ?

ট্যাঁপা কহিল,—হ্যাঁ।

তারপর দুজনেই নীরব। ট্যাঁপা ভাবিতেছিল, এই দরদী লোককে না বুঝিয়া কি ভৎর্সনাই সে করিয়াছে! আর শিবনাথ··? আগুনের গোলাটা যে কখন্ হঠাৎ চোখের সাম্‌নে নিবিয়া গিয়া··· আলো, আলো, রঙীন আলোয় চারিধার ভরপূর! আর সেই রঙীন আলোর ঝাড়ের মাঝখানে ট্যাঁপা···

শিবনাথ কহিল,—বুঝেচি। বেশ, তোমার বাবাকে বলো, তোমার বিয়ের জন্য তিনি যেন কোনো ভাবনা না ভাবেন! সে ভাবনা আমার রইলো।

এ কথায় ট্যাঁপার চোখে হু-হু করিয়া জল ঝরিল। শ্রাবণের মেঘেও বুঝি এত জল ঝরে না! কাপড়ে মুখ লুকাইয়া সে সেই ভাঙা ইটগুলার উপর ধনুকের মত বাঁকিয়া বসিয়া পড়িল; বসিয়া···

তার মাথায় হাত রাখিয়া শিবনাথ সস্নেহে কহিল,—কেঁদো না টেঁপু। আমি সত্যি করচি···

প্রবল ভাবে মাথা নাড়িয়া ট্যাঁপা কহিল,—তা হয় না, হয় না, হবে না তা···

শিবনাথ বিস্মিত হইল। হয় না? কি? কি হয় না? কেন হয় না? কেন? কেন?

শিবনাথের মনে হইল, তার পায়ের তলায় পৃথিবীখানা ঠিক আছে তো! সরিয়া যায় নাই? তবে তার পা এমন দোলে কেন? মাধ্যাকর্ষণের আইন-কানুন সব উল্টাইয়া গেল নাকি!

শিবনাথ কহিল—কেন হয় না টেঁপু?

অতি-কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া ট্যাঁপা কহিল—বাড়ী যার কাছে বাঁধা আছে, হাটখোলার বিরিঞ্চি বোস···ট্যাঁপা আর বলিতে পারিল না, কাপড়ে মুখ লুকাইল।

শিবনাথ কহিল—কি করেচে বিরিঞ্চি বোস?

ট্যাঁপা কহিল—বাবাকে বলেচে· আবার তার কথা বাধিয়া গেল!

ব্যাপার কি? শিবনাথ কহিল—বলো, কি বলেচে তোমার বাবাকে···বলো টেঁপু। যে কথাই সে বলুক, আমি তারো কিনারা করবো। যদি তা আমার অসাধ্য না হয়! কি সে কথা···?

ট্যাঁপা কহিল—তার স্ত্রী মরে গেছে,···

শিবনাথের সারা অঙ্গে কে যেন কাঁটার চাবুক মারিল! সে কহিল—বুঝেচি, তোমায় সে বিয়ে করতে চায়···না?

ট্যাঁপা কোনো জবাব দিল না। শিবনাথ কহিল—তোমার পায়ের তলায় দাঁড়াবার যোগ্যতা যার নেই, একটা সুদখোর ছুঁচো··· আমি বেঁচে থাকতে তা হবে না, টেঁপু! এ স্থির জেনো। পাঁচ হাজার টাকা আমার ব্যাঙ্কে আছে। পাঁচ হাজার কেন, দরকার হয় তো সেই ছুঁচো বেটার হাত থেকে তোমায় উদ্ধার করতে দশ হাজারও অনায়াসে আমি···

এত করুণা, এমন মমতা! চোখের জল তার পাশে টিঁকিতে পারে না! ট্যাঁপা কহিল—বাবাকে এক খুব কড়া চিঠি লিখেচে···

মামলা করে ডিক্রী পেয়েচে। সে ডিক্রী জারি করে বাকী টাকার জন্যে জেলের ওয়ারেণ্টও বার করবে। বাবা বিয়েয় না রাজী হলে, দু'একদিনের মধ্যেই। বাবা তাকে তাই হাতে-পায়ে ধরে আনবার জন্য গেছেন!

শিবনাথের মনের মধ্যে পিশাচের ফৌজ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল! এই তো চাই! বাঃ, খাসা হইয়াছে! শিবনাথ কহিল—সে বেটা আজ এখানে আসচে?

টঁ্যাপা কহিল—হঁ্যা, পাকা কথা কইতে···

বটে! রাজ্যের ক্রোধ আর হিংসা শিবনাথের মনের মধ্যে হাজার ফণায় ফুঁশিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল! সে কহিল—আচ্ছা। তাই হবে। কথা পাকা করেই সে ফিরবে। ব্যাটা শাইলক! সুদখোর চামুণ্ডী! এখানে তার যমও এই রইলো!

শিবনাথের কণ্ঠের স্বরে ভড়কাইয়া টঁ্যাপা তার পানে চাহিল। ডাগর চোখের সেই অসহায় দৃষ্টির মাঝখানে···ও কিসের আলো! শিবনাথ নিমেষের জন্য যেন পাগল হইল। ঝাঁপ দিয়া সে টঁ্যাপাকে বুকের মধ্যে টানিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে কহিল—তুমি আমার, আমার, আমার, টেঁপু,···এই বুকে তোমায় আশ্রয় দেবো, অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে!

টঁ্যাপাও বড় অসহায়তার মাঝখানে যেন একটু আশ্রয় পাইয়া সব ভুলিয়া গিয়াছিল! সে মুহূর্ত্তের বিহ্বলতা! তখনি তার চেতনা ফিরিল। চেতনা ফিরিবামাত্র টঁ্যাপা শিবনাথের কাছ হইতে নিজেকে ছিনাইয়া লইল। শিবনাথও শিহরিয়া সরিয়া আসিল এবং দীন ক্ষমাপ্রার্থীর ভঙ্গীতে কহিল,—আমায় মাপ করো টেঁপু···আমি পাগল হয়েছিলুম···

ট্যাপা নির্ব্বাক্! যেন কাঠের পুতুল! শিবনাথ কহিল—যাক, আমার পরিচয়ের কথা কাকেও এখন বলো না, তোমার মাকেও না…

ঝম্ ঝম্ ঝম্! বাঁধন-হারা এ কি বৃষ্টি-ধারা! আকাশ তার সঞ্চিত স্তম্ভিত জল-ভার যেন আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না! এত জল! হিংসার তাপে সারা তুনিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুকগুলাও যে সে তাপে জ্বলিয়া যায়! আঃ, এ বৃষ্টিধারায় তপ্ত ধরণী শীতল হোক, স্নিগ্ধ হোক!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাপক্ষয়

প্রচণ্ড বৃষ্টি। এ বৃষ্টিতে কাজ করা চলে না! কর্ত্তার ঘরের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া শিবনাথ তাই চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বুঝি সে ভাবিতেছিল, ও বৃষ্টি নয়,…আকাশের অশ্রু! ট্যাপার চোখের জলে আজ আকাশের মন গলিয়াছে, তাই এ তুনিয়ার প্রাণ-গলানো, বুক-ভাসানো বৃষ্টি-ধারা! সে আরও ভাবিতেছিল, কত তুচ্ছ কারণের পিছনে কত বড় কাজ এ পৃথিবীতে ঘটিতে পারে! গাছের একটা ফল কবে কোন্ এক ক্ষণে মাটিতে পড়িয়াছিল,…এমন তো নিত্য পড়ে! কিন্তু নিউটন সেই ফল পড়া দেখিল, অমনি তার ফলে তুনিয়া পাইল কত বড় বৈজ্ঞানিক সত্য! কবে কোথায় একটি ছেলে ঘুড়ি উড়াইতেছিল,—ঘুড়ি তো ছেলেরা নিত্য উড়ায়,—কিন্তু একদিনের সেই ঘুড়ি ওড়ানোর ফলে মানুষ বিদ্যুৎকে চিরদিনের জন্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে! তেমনি তু'দিন পূর্ব্বে কোদাল লইয়া খেয়ালের

বশে সে জঙ্গল সাফ করিতেছিল, এ-বাড়ীর গৃহিণী গিয়াছিলেন গঙ্গাস্নানে, কি বলিয়া তাকে তাঁর মজুর বলিয়া মনে হইল! এবং যেমন মনে হওয়া, অমনি তাকে ডাকিয়া কাজের ভার দেওয়া! শিবনাথ অনায়াসে বলিতে পারিত, সে মজুর নয়, ফিজিক্সের প্রোফেসর —তা না বলিয়া সে চুপ করিয়া গেল! তার ফলে আজ সে এই দরিদ্র পরিবারের কতখানি কাজে লাগিতে পারিবে!

গৃহিণী আসিয়া বলিলেন—দরজাটা ভেজিয়ে বসো বাবা, গায়ে জল না লাগে!

শিবনাথ কহিল—না মা, জল লাগবে না।

গৃহিণী চলিয়া যাইতেছিলেন, শিবনাথ কহিল—এই বৃষ্টিতে কর্ত্তাবাবু কোথায় বেরুলেন মা?

গৃহিণী কহিলেন—তিনি কলকাতায় গেছেন বাবা,—কাজ আছে।

গৃহিণী চলিয়া গেলেন। তাঁর স্বর ভার-ভার। শিবনাথের তাহা লক্ষ্য এড়াইল না।······

বৃষ্টির বেগ ক্রমে কমিয়া আসিল। শিবনাথ ভাবিল, এমন চুপচাপ তো আর বসিয়া থাকা যায় না! ঘরের দেওয়ালের গায়ে সেল্‌ফ। সেল্‌ফের উপর এক-রাশ বই। ভাবিল, টানিয়া পড়িবে কি? কিন্তু না, সে মজুর, এখনো মজুর,···এরি মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া কাজ কি! যখন সময় আসিবে···আজ, না হয়, কাল!

একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সামনে থামিল। শিবনাথ খাড়া দাঁড়াইয়া উঠিল। বাড়ীর দ্বার খোলা হইল। শিবনাথ লণ্ঠনটা তুলিয়া ধরিল। গৃহে প্রবেশ করিলেন কর্ত্তা জয়গোপাল দত্ত, তাঁর সঙ্গে আর একটি লোক। বেঁটে, কালো, ত্রিবক্রের মত আকৃতি!

এ-ই তাহা হইলে সেই বিরিঞ্চি বোস? মর্কটই বটে—শুধু আচারে নয়, আকারেও!

জয়গোপাল দত্ত কহিলেন—আলোটা আর একটু তুলে ধরো তো বাবা শিবু…

শিবনাথ আলো তুলিয়া ধরিল। সামনেকার জঙ্গল সাফ হইলে কি হইবে, নিকাশের পথ নাই, কাজেই জল জমিয়া ক্ষুদ্র পুকুরের আকার ধরিয়াছে। জুতা খুলিয়া সেই জলের উপর দিয়া ছপ্ছপ্ করিতে করিতে দুই জনে আসিয়া ঘরে উঠিলেন। শিবু ঘরের কোণে কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। মজুর, মজুরের মতই চুপচাপ্!

দু'জনে নানা কথা চলিল—টাকার সম্বন্ধে, ডিক্রীর সম্বন্ধে…জয়-গোপালের কত অনুনয়, কি বিনীত কাতর অনুরোধ, আর বিরিঞ্চির সদর্প ভঙ্গীতে অভিযোগ আর আস্ফালন! তার বাঁকা মন কিছুতেই আর সিধা হইতে চায় না! অবশেষে জয়গোপাল উঠিলেন, উঠিয়া ভিতরে গেলেন।

শিবনাথের বুঝিতে বাকি রহিল না,—আসরে এইবার ট্যাপাকে আনা হইবে। তার অসহ্য বোধ হইল! সে উঠিল; উঠিয়া একেবারে তীক্ষ্ণ স্বরেই কহিল—তুমি মহাজন?

ঘরের মধ্যে দুম্ করিয়া যদি একটা পিস্তলের আওয়াজ হইত, তাহা হইলেও বুঝি হাটখোলার বিরিঞ্চি বোস এতখানি চমকিয়া উঠিত না! সে হুঁঃ করিয়া শিবনাথের পানে তাকাইল—একটা ছোটলোক কুলি, না, ভৃত্য·· তার এমন স্পর্দ্ধা!

কিন্তু তার চমক ভাঙ্গিবার পূর্ব্বেই শিবনাথ কহিল—টাকা পাবে তো তুমি?

শিবনাথের ভঙ্গী দেখিয়া বিরিঞ্চি অবাক্! সে একটু ভড়কাইয়া গেল; কহিল—হ্যাঁ...

শিবনাথ কহিল—আর সে টাকা তুমি পাবে কর্ত্তা জয়গোপাল দত্তর কাছ থেকে? জয়গোপাল দত্ত তোমার খাতক...?

বিরিঞ্চি আরো অবাক্! অবাক্ হইয়া কহিল—হ্যাঁ।

শিবনাথ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল—জয়গোপাল দত্তর ঐ এক ফোঁটা মেয়ে তোমার খাতক নয়...?

বিরিঞ্চি এবারো তেমনি যন্ত্র-চালিতের মত কহিল—না।

শিবনাথ কহিল—তবে তাকে এখানে আনা হচ্ছে কেন?

শিবনাথের মুখের ভাব এমন ছিল না, যা দেখিলে মানুষের প্রাণ শীতল বা স্বস্থির হয়! তবু হাটখোলার মহাজন বিরিঞ্চি বোস...ভয় পাইলেও বুঝিতে সে কাতর নয়! সে কহিল—এই কন্যাটিকে আমি বিবাহ করবো কি না...

শিবনাথ-হাসিয়া উঠিল। পাগলের অট্টহাসি! শিবনাথ কহিল—তুমি বিয়ে করবে ঐ এককোঁটা মেয়েকে...? বুড়ো ষাঁড়...একটা বৃষকাঠ...

শিবনাথ আগাইয়া আসিল। শিবনাথের ভঙ্গী দেখিয়া বিরিঞ্চি বোস দাঁড়াইয়া উঠিল। শিবনাথ কহিল—সরে পড়ো।.. বিয়ে করা হচ্ছে না। ডিক্রী পেয়েচো, ডিক্রী জারি করো। জয়গোপাল দত্ত টাকা ধার করেচে, তাঁর সঙ্গে তার বোঝাপড়া করোগে, তাঁর মেয়ের ত্রিসীমা মাড়িয়ো না—খবর্দ্দার! আমি থাকতে এ বিয়ে হচ্ছে না, চাঁদ!...দোরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, এই বেলা মানে-মানে সরে পড়ো...

এক কথায় হঠিবে, বিরিঞ্চি সে মানুষই নয়! তবু তার ভয়

হইতেছিল, ছোকরা পাগল, না, কি ? যদি মারে ? বিরিঞ্চি ডাকিল—ওগো জয়গোপালবাবু…

কি ভীত আর্ত্ত আহ্বান ! সে আহ্বানে জয়গোপালবাবু ছুটিয়া আসিলেন—আসিয়া যা দেখিলেন, তাহাতে তাঁর চক্ষুস্থির ! শিবু মজুর বিরিঞ্চি বোসের একখানি হাত বাগাইয়া ধরিয়াছে !

ভয়ে জয়গোপাল দত্তর চোখ দুইটা যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল ! কম্পিত ভগ্ন স্বরে তিনি কহিলেন—এ কি ?

শিবনাথ কহিল—ওঁর ডিক্রী জারি করতে পেয়াদা নিয়ে উনি আসবেন—আর তার বোঝাপড়া হবে আপনার সঙ্গে ! আপনার মেয়ের সঙ্গে ওঁর কিসের সম্পর্ক মশায় যে তাকে এখানে এনে…

জয়গোপালের বুকটা ভয়ে ধড়াশ করিয়া নামিয়া গেল। কত সাধিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া কন্যাদানের অঙ্গীকারে বশীভূত করিয়া অত বড় মহাজনকে যদি বা কৃপাপরবশ করিয়া তুলিয়াছেন, এক ক্ষ্যাপা মজুরের অতিরিক্ত স্পর্দ্ধায় শেষে…

তিনি কহিলেন—ছি বাবা শিবু, ভদ্রলোকের হাত ধরে কি অমন করে…?

শিবনাথ কহিল—ভদ্রলোকের হাত ধরে না, তা জানি। কিন্তু এ কি ভদ্রলোক ?

বিড়ম্বনা ! ভগবান কপালে কি যে লিখিয়াছেন…! এ ব্যাপারের পর…নাঃ। জয়গোপাল দত্ত বিমূঢ়ের মত হইলেন। তাঁর চিন্তা করিবার বা কথা কহিবার শক্তিও বিলুপ্ত হইয়া গেল !

বিরিঞ্চির হাত ধরিয়া টানিয়া শিবনাথ কহিল—কেউ তোমায় রক্ষা করতে পারবে না !… ছুঁচো কোথাকার ! তিনকাল গিয়ে এক-কালে ঠেকেচে, তবু এসেচে বিয়ে করতে ! তাও, বাপের গলায় পা

দিয়ে তার মেয়েকে বিয়ে করবে! অসীম দয়া!·· বেরোও, বেরোও, বলচি······

একটি হ্যাঁচকা-টান্। সে টানে বিরিঞ্চি বোস ঘর ছাড়িয়া একেবারে রোয়াকের উপর হুম্ড়ি খাইয়া পড়িলেন! সেখান হইতে আর একটি ধাক্কা দিলে···পড়িয়া পা'খানাই ভাঙে বুঝি! শিবনাথ কিন্তু সে ধাক্কা দিল না; তার ঘাড় ধরিয়া নামাইয়া দিল, কহিল—বেরো, বেরো বল্চি শীগ্গির! ব্যাটা মহাজন, আস্পর্দ্ধার সীমা নেই! কাব্লির অধম, পিশাচ! ডিক্রী নিয়ে চোখ রাঙিয়ে বিয়ে করতে এসেচো!—বেহায়া, নির্লজ্জ কোথাকার!

বিরিঞ্চি বোস রাগে অপমানে কাঁপিতেছিল; কাঁপিতে কাঁপিতেই কহিল—তবে রে ছোটলোক, ভূত···বলিয়া শিবনাথের দিকে আগাইয়া গেল! কিন্তু ছোটলোক ভূতটা এমন হাত পাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে···বিরিঞ্চি বোস নিরুপায় হতাশ স্বরে ডাকিল—জয়গোপালবাবু···

জয়গোপালবাবু হতভম্ব! বিরিঞ্চি বোস কহিল—এ অপমান আমি ভুলবো না, কড়ায়-গণ্ডায় এর উসুল হবে! মনে থাকে যেন! আমার দোষ নেই···

শিবনাথ হুঙ্কার দিয়া নামিয়া আসিল—তবু দাঁড়িয়ে রইলি! ছোটলোক, মর্কট, অষ্টাবক্র ব্যাটা···

ঠাস্ করিয়া বিরিঞ্চির গালে শিবনাথ এক চড় কষাইয়া দিল।

বিরিঞ্চির মাথা বোঁ করিয়া ঘুরিয়া গেল। তবু সে হাটখোলার মহাজন, তেজারতী তার পেশা! এ চড়ে সে নির্ব্বাক্ হইল না! সগর্জ্জনে বিরিঞ্চি কহিল—আবার মার! আচ্ছা, আদালত আছে, দেখে নেবো। তোর মনিবকে শুদ্ধু এর ফলভোগ করতে হবে।

শিবনাথ কহিল—যা, যা, আদালতে যা। আমিও রাজী।

সেখানে গিয়ে আমি বলবো, হাঁ, এ উল্লুককে মেরেচি—মার স্বীকার করে দশ টাকা জরিমানা ফেলে দিয়ে আসবো···তাতে আমার গৌরব বাড়বে,—ভাববো, সে জরিমানা দিলুম না, তোর কান মলে দাম দিলুম···

এ কথার পর আর টিঁকিয়া থাকা যায় না! যে গোঁয়ার, পাষণ্ড···! বিরিঞ্চি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল, দ্বারের কাছে গিয়া কহিল—জয়গোপালবাবু, বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান করলে! ডালকুত্তো লেলিয়ে দিলে! আচ্ছা, কাল পেয়াদাকে কি করে ঠেকাও, দেখে নেবো।

শিবনাথ কহিল—চোখ যদি কাল থাকে, তাহলে দেখে নিস্!

বিরিঞ্চি বাড়ীর বাহির হইয়া গেল; নিমেষ-পরে আবার ঢুকিল; কহিল—আমার ছাতাটা··

কোণে দাঁড়-করানো ছাতাটা লইয়া শিবনাথ ছুড়িয়া দ্বারপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল।

বিরিঞ্চি বোস ছাতা কুড়াইয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিল। গাড়ী চলিয়া গেল!

অত ঝড়···মুহূর্ত্তে সব শান্ত! ঘরে ঢুকিয়া শিবনাথ দেখে, এ যেন রূপকথার কোন্ প্রাণহীন ঘুমন্ত পুরী! এক-ধারে জয়গোপাল দত্ত কাঠ হইয়া বসিয়া আছেন, আর দ্বারের চৌকাঠে গৃহিণী নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া! বায়োস্কোপের ছবিতে ফিল্মের স্পুল আটকাইয়া গেলে ছবির যেমন নড়াচড়া একেবারে রহিত হয়, তেমনি ভাব!

শিবনাথ কহিল—কি ভাবচেন বসে? কোনো ভাবনা নেই! যান, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করুন গে···

প্রথমে গৃহিণীর চেতনা ফিরিল। তিনি কহিলেন—কি করলি বাবা? কিছু না জেনে-শুনে পাগলের মত কি যে করলি…! এর ফলে কাল কি সর্ব্বনাশ হবে…গৃহিণী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

শিবনাথ কহিলে—বলচি তো মা ঠাকুরুণ, কোনো ভাবনা নেই! আপনার টেঁপুর বিয়ের জন্যে তো বলচেন…?

গৃহিণী কহিলেন—বিয়ের ভাবনা ভাবনাই নয়, বাবা…

শিবনাথ কহিল—বুঝেচি, মহাজন কাল ডিক্রী জারি করতে আসবে…

গৃহিণী কোনো জবাব দিলেন না। পরের দিন বাড়ীর মধ্যে দানবের যে তাণ্ডব নৃত্য চলিবে, ভয়াতুর নেত্রে তিনি যেন তাবি ছবি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন!

শিবনাথ কহিল—ওর ডিক্রীর টাকার জন্য ভাববেন না… কত টাকার ডিক্রী?…ও ছুঁচোর সাধ্যও হবে না আপনাদের কোনো বিপদে ফেলে!

গৃহিণী অবাক্ হইয়া শিবনাথের পানে চাহিলেন। এ পাগলা মজুরটা বলে কি?

শিবনাথ কহিল—শুনুন কর্ত্তা,' আমার হাতে মেয়ে দেবেন…? আশ্চর্য্য হচ্ছেন! আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই!…শুনুন, আমি সত্যি মজুর নই। ওই যে নতুন বাড়ী হচ্ছে, ও আমারি বাড়ী। আমার নাম শিবনাথ মিত্তির, প্রেসিডেন্সি কলেজের ফিজিক্সের প্রোফেসর আমি…তা'ছাড়া ব্যাঙ্কে আমার নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে, তার উপর কলকাতায় দু'খানা বাড়ী…

এ কি স্বপ্ন · কি এ!

আকাশে ইতিমধ্যে মেঘ কখন কাটিয়া গিয়াছিল। চাঁদ

উঠিয়াছিল। জলে-ধোওয়া নির্ম্মল আকাশে ত্রয়োদশীর চাঁদ। তারি এক ঝলক জ্যোৎস্না আনন্দের হাসির মত খোলা জানলার ফাঁক দিয়া ঘরে ঢুকিয়া যেন নৃত্য করিতেছিল!

শিবনাথ কহিল—আমি মিছে কথা বল্‌চি নে মা। খবর নেবেন আপনারা। কাল যদি ডিক্রী জারি করতে আসে ও ছুঁচো...তা, কত টাকা চাই? আমার্ কাছে এইখানেই নগদ হাজার খানেক আছে। বলেন, ভোরে গিয়ে আরো টাকা নিয়ে আসি...তিন হাজার...না, চার?...কত?

এ-সব টাকাকড়ির কথা গৃহিণীর কানেও গেল না। গৃহিণী ডাকিলেন—ট্যাঁপা...

দ্বারের পিছনেই ট্যাঁপা দাঁড়াইয়া ছিল। বিরিঞ্চির লাঞ্ছনায় সে একেবারে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল! মার আহ্বানে দ্রুত পলাইয়া যাইতেছিল, ছুটিতে গিয়া চাবির রিঙে সেই রাগিণীর ঝঙ্কার! মা তাকে ধরিয়া ফেলিলেন; ধরিয়া টানিয়া তাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া কহিলেন—তোর ভাগ্য এমন হবে, এ কখনো ভাবিনি যে মা!...প্রণাম কর্...মজুর নয় রে, তোর ভগবান!

গৃহিণী আপনার মনেই ধকিয়া চলিলেন,—সেদিন গঙ্গা নাইতে গিয়ে মার কাছে প্রাণের বড় কাতর কান্না কেঁদেছিলুম! মিনতি জানিয়েছিলুম যে, মা গঙ্গা, স্থদ্দিন দাও মা! আর কিছু চাই না, শুধু মেয়েটার পানে মুখ তুলে চাও—। তা, মা মুখ তুলে সত্যিই চেয়েছেন! গঙ্গাস্নানের এমন ফল কে কবে পেয়েচে!...

গৃহিণীর দুই চোখে অশ্রু ঝরিতেছিল! আনন্দের অশ্রু! শিবনাথ কাঠ হইয়া তাই দেখিতেছিল! কর্ত্তা সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া শিবনাথকে

বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, আবেগ-বিহ্বল স্বরে কহিলেন,—বাবা··· বাবা···

তাঁর মুখে আর কথা ফুটিল না! পায়ের নীচে সারা পৃথিবীখানা এমন দোলে দুলিতেছিল···পা টলিয়া উঠিল! শিবনাথের বুকে তাঁর মাথা লুটাইয়া পড়িল।

প্রেমের ফাঁদ

রবিবার। বেলা তখন একটা। উপরের ঘরে খাটের বিছানায় শুয়ে গজেন উসখুস্ করছিল। তাকে দেখলেই মনে হয়, সে যেন এক মহা সমস্যায় পড়েচে! মাঝে মাঝে সন্তর্পণে বালিশের তলা থেকে একখানা চিঠি বার করে' তার উপর অধীর দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে। দু'একছত্র পড়া হতেই কার পদশব্দ আশঙ্কা করে চিঠিখানা পাকিয়ে বালিশের তলায় গুঁজে পাশের ইংলিশম্যানখানা টেনে নিয়ে তার যেখানে-সেখানে চোখ মেলে দিচ্ছে!

গজেনের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি—দেখতে নিতান্ত সুপুরুষ না হলেও মন্দ নয়; তবে তার ধারণা, সে একজন সুপুরুষ। পৈতৃক কারবার আছে—তাতে বিলক্ষণ দু'পয়সা উপার্জ্জন হয়। সে যে পদশব্দের আশঙ্কা করছিল, সে পদশব্দ তার স্ত্রীর। স্ত্রীর সঙ্গে তার খুবই মনের মিল। স্ত্রীকে নিয়ে প্রত্যহ মোটরে চড়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে বেরুনো, মাঝে মাঝে বায়োস্কোপে বা বনভোজনে যাওয়া—এ সবে তার ঝোঁকও ছিল খুব প্রবল। আর এ-সব ব্যাপারে স্ত্রীর চেয়ে তার আগ্রহই বেশী।

আশঙ্কার কারণ ঐ চিঠিখানা। চিঠিখানায় মজা ছিল ভারী অপূর্ব্ব রকমের। মেয়েলি হাতের লেখা—ক'টি ছত্র,—

"প্রিয়তম, শুধু চোখের দেখা দেখেই মনকে শান্ত করতে পারচি না। একবার প্রাণ খুলে দুটি কথা ক'বার সাধ হচ্ছে। আজ ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় ইডেন গার্ডেনের প্যাগোডায় এসে বসো, প্রাণের যা

কথা আছে, খুলে বলবো। যদি না এসো, তাহলে জগৎ থেকে একজন নারী তার হতাশ-দগ্ধ প্রাণ নিয়ে সরে পড়বে, জেনো। ইতি—অপরিচিতা।"

গজেন ভাবছিল, তাইতো, কে এ চিঠি লিখলে? ধরণটা হুবহু উপন্যাসের মত! স্বপ্ন নয় তো? খেয়াল নয় তো এটা তার? না,—ঐ যে চিঠিখানা—আর এই যে মেয়েলি ছাঁদের অক্ষরগুলি মুক্তোর মত সাজানো রয়েচে!

যৌবনের সীমানায় সে এসে দাঁড়িয়েচে! আজ এমন অবেলায়, এ কোন্ বসন্তের কুঞ্জ থেকে কার এ আকুল আহ্বান এল! কে এ অপরিচিতা?

অনেক ভাবলে সে; জীবনের অতীত মুহূর্তগুলো ডায়েরির মত পাতার পর পাতা খুলে ঝরে পড়তে লাগলো তার চোখের সামনে, আর সে পরম আগ্রহে তার প্রতি ছত্র পাঠ করতে লাগলো—কবে ট্রেনে যেতে যেতে ষ্টেশনে গাড়ী থাম্‌লে কোন্ ওয়েটিং রুমের আড়াল থেকে কে তরুণী অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়ে চোখ মেলে চাইতেই তার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হয়েছিল! দেওঘরে হাওয়া খেতে গিয়ে পথে কোথায় কার সঙ্গে দৈবাৎ চোখোচোখি হয়েছিল! কলকাতার পথে ভাড়া-গাড়ীর ফিরকির ফাঁক দিয়ে কবে ছুটি কালো চোখের বিলোল চাউনি বিদ্যুৎ হেনে গেছলো—কোন্ স্বপ্নপুরীর অতল থেকে যেন সেগুলো আজ হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে সে টেনে বার করে দেখতে লাগলো।...তখনি আবার ভাবলে, ধেৎ! সে কোন্ সুদূর অতীতে কবেকার কথা—এতদিন পরে হঠাৎ এ চিঠি কেন আসবে সেজন্য? তা ছাড়া এ যে লিখচে—

চিঠিখানা আস্তে আস্তে আবার হাতে তুলে নিয়ে সে পড়তে

লাগলো। চিঠিতে লিখেচে, শুধু চোখের দেখা দেখেই মনকে শান্ত করতে পারচি না তো! এ তাহলে এখনকার, এখানকার কথা! রোজ যে তাকে দেখে, এমন কেউ লিখেচে!...কে—এ?

...ঠিক! গঙ্গার ধারে তার মোটরের সঙ্গে এই যে আজ কদিনই দেখা হচ্ছে...একটা সাদা ঘোড়া-জোতা ল্যাণ্ডোলেটে ধানী রঙের মাদ্রাজী শাড়ী-পরা এক সুন্দরী তরুণী, গায়ে ধানী রঙের হাফ্-হাতা ব্লাউশ, তাতে টক্‌টকে লাল ফিতে পাড়ের কাফ্—তরুণীর চোখে বিভোর দৃষ্টি! চার-পাচ দিন চোখোচোখি হয়েচে! পাশে স্ত্রী বসে থাকা সত্ত্বেও তার দৃষ্টি সব কুণ্ঠা বিসর্জ্জন দিয়ে সেই ল্যাণ্ডোলেট গাড়ীখানার মধ্যে কি অধীর গতিতে ছুটে গেছে, আর ক'দিনই তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়েচে! অথচ সে দৃষ্টিতে বিরক্তির আভাষ মাত্র জাগেনি বা সে দৃষ্টি সরমে সরে যায় নি!...এ তার, নিশ্চয় এ তার চিঠি! কিন্তু—

...না, এ বোধ হয় সেই লাল সিল্কের শাড়ী-পড়া কিশোরীটি! সেই যে প্রিন্সেপ্‌স্ ঘাটের সামনে সেদিন সন্ধ্যার পর হঠাৎ উল্‌স্‌লি কারের পেট্রল ফুরিয়ে যায়—কিশোরী একা মোটরে বসে সোফারকে ভৎর্সনা করছিলেন,—পেট্রলের খপর রাখো না? ভৎর্সনা হলেও সে স্বরে যেন গানের ঝরণা ঝরে পড়ছিল! পেট্রলের উল্লেখ শুনে গজেন উপযাচক হয়ে নিজের গাড়ী থেকে পেট্রল নিয়ে দিলে—কিশোরী মৃদু হেসে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর তিন চারদিন সেই গাড়ীর সঙ্গে পথে দেখা...কিশোরী মৃদু হাসির উচ্ছ্বাসে মাথা নেড়ে সেদিনকার সেই সাহায্যের দরুণ কৃতজ্ঞতা জানিয়েচেন!

গজেন ভাবলে, এ তবে শুধুই কৃতজ্ঞতা নয়! তার পিছনে আরো

কিন্তু গজেনের বয়স যে চল্লিশের কোটায় এসে পৌঁছুলো! চল্লিশ! এ বয়সে তরুণীর মন আটকে পড়তে পারে কখনো? সে একটা নিশ্বাস ফেললে।

এমন সময় স্ত্রী পরীরাণী এসে একেবারে বুকের উপর মুখ রেখেই বললে,—ইস্ কি ভাগ্যি আমার! ওপরের ঘরে এসে শুয়ে আছো! তাসের আড্ডায় যাও নি!

গজেন গম্ভীর মুখে বললে—না!

পরী বললে,—কেন? এ যে একেবারে অবাক্ কাণ্ড! বন্ধু-মজলিশ যে আঁধার হয়ে থাকবে গো! সেখানে হাহাকার পড়ে যাবে যে!

গজেন গম্ভীর হয়ে রইলো, কোনো জবাব দিলে না।

পরী বললে,—কি ভাবচো গা? তারপর সে প্রশ্নের জবাবের জন্য তিলার্দ্ধ কাল অপেক্ষা না করেই বললে,—আজ চলো না গা পিক্‌চার প্যালেসে,—নতুন ফিল্ম্ আছে—পার্ল অফ্ প্যারাডাইস্—দেখে আসি। কাল থেকে দেখাচ্ছে—ও বাড়ীর মায়ারা গেছলো।

একটু দম নিয়ে গজেন বললে,—না। আজ একটু মুস্কিলে পড়েচি। এক বন্ধুর ভারী অসুখ, ভবানীপুরে; তাকে দেখতে যেতে হবে, সন্ধ্যার সময়।

পরী বললে,—অসুখ দেখতে যাবে, তা এখনি যাও না কেন! সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করবার দরকার কি?

গজেনের অন্তরাত্মা শিউরে উঠলো। সত্যিই তো! এখনই বেরিয়ে যাবার বিরুদ্ধে কোনো কৈফিয়ৎও নেই! একটা ঢোক গিলে সে

বললে,—আরো-দুজনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে কি না—সুধীর, বুড়ো, এরা ধরে বসেচে, আমার গাড়ীতেই যাবে। তাই না হয়েচে মুস্কিল! নিজে একলা গেলে তো এখনি দেখে আসতুম। এদের জন্যে সমস্ত দিনটাই,—সেই রাত ন'টা-দশটা অবধি—দেখচি, মাটী হবে! তোমার সঙ্গে বেড়াতে বেরুনোও হবে না।

হঠাৎ বাইরে ঝী চীৎকার করে উঠলো,—দাঁড়াও তো, বল্‌চি মাকে। অ মা, এই হ্যাখোসে খুকী জল ঘাঁটচে। মানা করচি, শুনচে না।

খুকী গজেনের মেয়ে—বছর পাঁচেক তার বয়স।

ঝীয়ের চীৎকার শুনে পরী দ্রুত ঘরের বাহিরে চলে গেল। মেয়েকে শাসন করে আবার যখন সে ঘরে ফিরলো, গজেন তখন দুই চক্ষু মুদ্রিত করেচে।

পরী বললে,—ঘুমুচ্ছ না কি?

গজেন বললে,—বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

হেসে পরী বললে,—এ রোগ তো তোমার কখনো দেখিনি। দুপুর বেলায় ঘুম!

একটু রসিকতার চেষ্টা করে গজেন বললে,—বয়স হচ্ছে তো!··· কিন্তু নিজের মুখের এই কথাটাই নিজের কানে শুনে তার মনের ভিতরটা যেন ঝড়ের দোলানি পেয়ে কেঁপে উঠলো! বয়স হচ্ছে কি? ওরে না, না—চিরশ্যামল সবুজের ছোপ তার অন্তরে এখনো স্পষ্ট লেগে আছে যে,—না হলে যৌবনের এ আহ্বান আসতো কি!

পরী বললে,—ঘুমোও তবে! আমি ও-ঘরে ছেলে-মেয়েগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে মাছের কচুরিগুলো ভেজে নি।

গজেন কোনো জবাব দিলে না। পরী চলে গেল।

গজেন তখন আবার সেই চিঠিকে কেন্দ্র করে ভাবনার জাল বুনতে স্থরু করে দিলে!...এটা কি ঠিক? স্ত্রী পরীর এই অগাধ অসীম বিশ্বাসের উপর—

কিন্তু দোষ কি এতে? সে তো আর জাহান্নামে যাচ্ছে না! অবিশ্বাসের কাজও কিছু করচে না। এ একটু মজা—একটা রহস্য আবিষ্কার করা বৈ তো নয়! নারীর মনের যে বিচিত্র রূপ, বিচিত্র বিকাশ নানা দেশের নানা উপন্যাসে নাট্যে কাব্যে পড়ে সে দিশাহারা হয়ে ভাব্‌তো, কৈ, কোথায় এ সব নায়িকার দল? বাস্তব জীবনে এই যে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে স্থর বেজে চলেছে, তার মধ্যে কোথায় তার সরস পরশ! লেখকের দল মিথ্যা কুহকের ফাঁদ রচে মনের মধ্যে শুধু মিথ্যা একটা অতৃপ্তি জাগিয়ে তোলেন বৈ তো না! এখানে বাস্তব জীবনে কিছুই নেই,—আছে শুধু হাট আর বাজার, লোক আর জন, ভিড় আর ভিড়—এক কাজ, এক মুখ, এক কথা—জীবনটায় কোনো স্থখ নেই, বৈচিত্র্য নেই, রস নেই! কি এ?

ঢুম্ করে হঠাৎ পরী এসে বললে,—কৈ, ঘুমোও নি তো!

গজেন অপ্রতিভভাবে উঠে বসে বললে,—না, ঘুমোব না ঠিক করলুম।

পরী বললে,—তাস খেলতে চল্‌লে না কি?

—না। বলে গজেন আবার শুয়ে পড়লো।

পরী বললে,—তোমায় যেন কেমন উতলা দেখচি—একবার শুচ্ছ, একবার উঠচো,—শরীর ভালো নেই, না কি?

গজেন কাঁচু-মাচুভাবে বললে,—শরীর তেমন জুৎসই বোধ হচ্ছে না।

পরী বললে,—তবে ঘুমোও। সন্ধ্যা বেলায় আজ আর ভবানী-পুরে না হয় না-ই গেলে।

গজেন আবার উঠে বসলো,—না, যেতেই হবে। অসুখ শুনলুম—

পরী আর কোনো কথা না বলে চলে গেল। গজেনের মনে হলো, পরীর ঠোঁটের কাছে যেন একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল!

গজেন আবার ভাবতে লাগলো; ভেবে ঠিক করলে, যাবে না, ইডেন গার্ডেনে সে যাবে না। এ কার চিঠি আর-কাকেও হয়তো লিখেচে, ভুল করে তার কাছে এসে পৌঁছেচে! কিন্তু না, খামখানা তুলে নিয়ে সে দেখলে,—এ যে তারই নাম, স্পষ্ট—তারই ঠিকানা। ভুল চিঠি এ নয় তো তবে!

আবার মনে হলো, না গেলে 'জগৎ থেকে একজন নারী···সরে পড়বে'—অর্থাৎ আত্মহত্যা করবে! আহা, বেচারী!

সে শিউরে উঠলো, কি সর্ব্বনাশ! তারই অদর্শনে ব্যথিত জীবনের লীলা একজন শেষ করে দেবে! সে ভাবলে, না, যেতেই হবে, এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্ততঃ যাওয়া দরকার! গিয়ে ভালো কথায় তাকে সৎ পরামর্শ দেবে,—এ আলেয়ার পিছনে ছোটা থেকে তাকে নিবৃত্ত করবে!

আবার মনে হলো, তাইতো, নারীর এ আহ্বান—এ মস্ত প্রলোভন! সকল দেশের শাস্ত্র-পুরাণ এ প্রলোভন থেকে দূরে থাকবার জন্য কেবলি রাশ-রাশ উপদেশ দিয়েচে! এ ফাঁদে পা দিয়ে কোথায় শেষে গিয়ে পড়বে! কোথায় থাকবে পত্নী, ছেলে-মেয়ে! তা ছাড়া এই সুনাম—যে সুনামটুকুকে এই চল্লিশ বৎসর পরম যত্নে রক্ষা করে এসেচে···!

বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়লো—চিঠিখানা আর একবার সাবধানে পড়ে নিয়ে জামার পকেটে রেখে দিলে; তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাথায় বেশ করে ব্রশ চালিয়ে চেহারাখানা দেখে নিলে।… বয়স চল্লিশ…তা হোক্—এখনো যৌবনের ছাপ মুখে-চোখে হাসিতে কেশের রাশিতে হিল্লোলিত রয়েচে!…যৌবনটা বৃথায় গেল! স্ত্রীর প্রেম, সে তো আছেই—সকলেই পায়! কিন্তু এই অপরিচিতার প্রেম? এ যে একেবারে দুর্লভ বস্তু! এ যে জন্ম-জন্ম সাধনার ধন! আর দু'চার বছর পরে ও বস্তু পাবার আশাও থাকবে না যে! এ সুযোগ, এ সৌভাগ্য জীবনে ক'জনের ভাগ্যে ঘটে! এ সুযোগ মিলেচে যদি, জীবনের এই অবেলাতেও, তো হেলায় তা হারাবে?… একটা নিশ্বাস ঝড়ের বেগে তার বুকটাকে তোলপাড় করে জেগে উঠলো। হতাশভাবে সে ভাবলে, যাক্—কে জানে, এতে বিপদও হয়তো ঘটতে পারে!… যদি কোনো শত্রুর ফন্দীই হয়?

…কিন্তু তার আবার শত্রু কে? মনে পড়ে না! শেষে সে স্থির করলে, থাক, যার জন্যে এত ভাবনা, কাজ কি? নাঃ, যাবো না!

সে খপরের কাগজে মন নিবিষ্ট করলে! নজর পড়লো একটা প্রবন্ধের উপর। আঃ, খপরের কাগজেও আজ এই সুর! কি এ! চারিদিকে আজ বসন্ত জেগে উঠলো যেন! প্রবন্ধটায় লেখা আছে,—নারী ভালোবাসে তরুণকে, না, প্রৌঢ়কে? একেবারে যে তরুণ, তাকে ভালোবাসার নাম মোহ—তাতে নৈরাশ্যের ভয় থাকে, তা উবে যায়, মুছে যায়! কিন্তু প্রৌঢ়ের সঙ্গে যে প্রেম, তাতে গভীরতা আছে, সে মুছে যাবার নয়!

আনন্দের উচ্ছ্বাসে গজেন এবার হেসে ফেললে। তবে তো

তারও দাবী আছে নারীর প্রেমে! কিন্তু সে তরুণ নয়,—এ কথা ভাবতেও প্রাণটা হায়-হায় করে উঠলো।

কোনমতে ছ'টা অবধি আই-ঢাই করে কাটিয়ে গজেন একটু সৌখীন রকমেই আজ সাজসজ্জা করলে, বাইরের ঘরে। ভিতরে সাজসজ্জা করতে ভরসা হলো না! কে জানে, পরী যদি কোনোরকম সন্দেহ করে বসে? সে বলেচে, যাচ্ছে ভবানীপুরে, পীড়িত বন্ধুকে দেখতে। তার জন্যে সাজসজ্জার ঘটা কেন? সে ভাবলে, এ-কথা না বলে যদি সে বলতো, কোনো বন্ধুর ভাইয়ের বিয়েয় পাকা-দেখা দেখতে চলেছে, তাহলে সাজসজ্জার এ ঘটাটুকু মানাতো! যাক্, যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই, অথচ যা-তা পোষাকেও যৌবনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বেরুনো যায় না তো! তাই সে একেবারে বাহিরের ঘরেই সাজসজ্জা-সমেত আশ্রয় নিয়েছিল।

মোটরে করে গঙ্গার ধারে কতবার ঘোরা হলো। ঘড়ি দেখারও বিরাম নেই—অথচ ঘড়ির কাঁটা সাতটার ওপর আজ যেন আর যেতেই চায় না! অন্য দিন এক চক্কর দিতে না দিতেই আটটা বেজে যায়! সময়টা আজ নেহাৎ সেই গল্পের কচ্ছপের মতই চলেচে যেন! হঠাৎ তার মনে হলো, ঘড়িটা ঠিক যাচ্ছে ত?

সোফারকে সে বললে,—চলো এস্প্লানেড্।

গাড়ী চল্‌লো ধর্ম্মতলার দিকে। কার্জ্জন পার্কের পশ্চিম প্রান্ত থেকে হোয়াইটএ্যাওয়ে লেড্‌লর দোকানের চূড়ার প্রকাণ্ড ঘড়িটার পানে চেয়ে সে দেখে, সাতটা বাজতে দশ মিনিট। নিজের ওয়াচ খুলে দেখে, তাই তো, ঘড়ি ঠিকই যাচ্ছে, তবে—

সোফারকে বললে,—ঘুমায় লেও। চলো ইডেন্-গার্ডেন।

বাবুর খামখেয়ালি ভাব দেখে সোফার একবার মুহূর্ত্তের জন্য বাবুর পানে ফিরে চাইলে। তারপর গাড়ী ঘুরিয়ে একেবারে গঙ্গার ধারে এলো। ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডের পশ্চিমে গিয়ে হাজির হতেই বাবু বললেন,—রোখো!

গজেন তখন গাড়ী থেকে নেমে হন্-হন্ করে প্যাগোডার সামনে এসে দাঁড়ালো। দূর থেকেই দৃষ্টি এক কিশোরীর সান্নিধ্য অনুভব করে অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়ছিল। কিন্তু কোথায় সে? অন্ধকারে ছায়ার মত প্যাগোডা দেখা যাচ্ছে,—তার ধারে জলের কোলের কাছে পাঁচ-ছটি প্রাণী বসে—তারা সাহেব-মেম! একটু বিরক্ত হয়ে গজেন এসে প্যাগোডার ধারে বসে পড়লো।

সামনে পুকুরের জলে সন্ধ্যা তার নিবিড় আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়েচে—কালো জল নিথর স্তব্ধ! তীরে শুধু সাহেব-মেমদের হাসি আর গল্পের গুঞ্জন,—পাপড়ি-মোদা ফুলের কানে ভ্রমরের অলস-গুঞ্জনের মতই তা বাজছিল! গজেনের বুকের মধ্যটা দুপ্ দুপ্ করছিল—এই কোলাহলের মধ্যে, ভিড়ের মধ্যে সে আসবে কি? হায় অপরিচিতা, এ কি স্থান বেছে নিয়েচো মনের গোপন কথা নিবেদনের জন্য! তার জন্য যোগ্য ঠাঁই হতো, কোনো নিরালা কোণ, জনহীন পথ,—আলোর উগ্র হাসি যেখানকার শান্ত স্তব্ধতাকে চিরে দেয় না, লোকের কোলাহল যে স্তব্ধতার বুকে বাজের ঘা মারে না!

এমনি ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার ভাগ্য সদয় হলো। সাহেব-মেমের দল চলে গেল। অদূরে ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডে বেশ একটি মিঠে রাগিণী বেজে উঠলো। গজেন চেয়ে দেখলে, গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে আলোর রশ্মি জেগে রয়েচে—পথের মাঝে-মাঝে আলোর ক'টা টুক্‌রো হীরের কুচির মত ঝক্‌ঝক্ করচে—বাকীটুকু আঁধারে ছায়ায় ঘেরা, অস্পষ্ট, স্বপ্নের মতই যেন তা বিচিত্র রমণীয়!

গজেন ঘড়ি খুলে দেখে,—সাতটা বাজতে তিন মিনিট বাকী।… আর বসে থাকা যায় না!

অধীর আগ্রহে সে উঠে দাঁড়ালো, পায়চারি করতে লাগলো,—উৎকর্ণ হয়ে অধীর দৃষ্টি নিয়ে! কোন্ দিক দিয়ে আসবে সে? ওগো তরুণী, ওগো সুন্দরী, ওগো অপরিচিতা, ওগো নায়িকা, ওগো যৌবন-বন-অভিসারিকা—

পায়চারি করুতে করতে হঠাৎ মৃদু কণ্ঠের গানের স্বর তার কাণে গেল। কে গাইচে,—

কথা ছিল তারে বলিতে!
চোখে চোখে দেখা পথ চলিতে!

গানের স্বর লক্ষ্য করে চেয়ে সে দেখে, প্যাগোডার অন্য ধারে একটি বাঙালী যুবা বসে গান গাচ্ছে; বসে আছে সে একটা প্রতিমূর্ত্তির মত! দু'তিনবার পায়চারি করে সে চেয়ে দেখে, গানের রসে-ভাবে লোকটা একেবারে মশ্‌গুল্! নড়বার-চড়বার কোনো লক্ষণ নেই তার! আঃ!

গজেন ভারী বিরক্ত হলো। কে এ?…হয়তো এর জন্যেই বেচারী আসতে পারচে না! বেড়াতে বেড়াতে সে তার কাছে গেল—দূর থেকে একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার পানে। তার গান থেমে গেল—যেন বেহালার তার ছিঁড়ে গেল হঠাৎ খট্ করে! সে-ও বক্র দৃষ্টিতে গজেনের পানে চেয়ে দেখলে—দুজনে চোখোচোখি হলো। হতেই সে দাঁড়িয়ে উঠলো, ডাকলে,—সেজ-দা—

—কে? নরেন?

নরেন গজেনের পিসতুতো ভাই। গজেনের বাড়ীতে থাকে! তার বাপ-মা থাকেন পশ্চিমে, আর নরেন কলকাতায় গজেনের বাড়ীতে

থেকে কলেজে পড়চে,—এবার বি, এস্-সি দেবে। আর মাসখানেক বাদেই তার এগ্‌জামিন।

গজেন বললে,—এখানে ভূতের মত বসে আছিস্ যে?

নরেন একটা ঢোঁক গিলে বললে,—বেড়াতে এসেচি।

গজেন বললে,—বেড়াতে এসেচিস্ তো ওধারে বেড়াগে যা'না। এখানে অন্ধকারের মধ্যে ঘুপ্‌টি মেরে বসে আছিস্ কেন?

নরেন বললে,—মাথা ধরেচে।

—মাথা ধরেচে তো বাড়ী যা। না-হয় খোলা হাওয়ায় বেড়াগে—বসে থাকে না।

নরেন একটু ইতস্তত করে বললে,—এখানে বসে আছি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে engagement করেচি বলে। তার সঙ্গে একটু লেখাপড়ার কথা আছে।

গজেন বিষম বিরক্ত হলো। এখনো ছেলেটা কথা-কাটাকাটি করে! তার শাসন নেই—মেলামেশা সহজ ভাবে করে—তা করুক্,—তবু বয়সে ছোট ভাই তো! গজেন বললে,—যা, যা, এখানে লেখাপড়া করে না। বাড়ী গিয়ে ও-সব তর্কাতর্কি করিস্। মাথা ধরেচে, বাড়ী যা। আমার গাড়ী আছে বাইরে, তাতে করেই নয় যা।

—আপনি কিসে যাবেন?

—আমি নয় ট্রামে যাবো'খন। তোর মাথা ধরেচে—এগ্‌জামিনের আগে অসুখে পড়বি শেষে!

—অসুখ করবে না।

—না! করবে না! ভারী জানিস্! এই ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময়! শেষে অসুখে পড়ে একটা বছর মাটি করো!

—আর-একটু পরে যাচ্ছি।

রাগে গজেনের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো। এত বড় বেয়াদব ছোকরা —তবু নড়তে চায় না, বিরক্ত হয়ে সে ফিরলো।

ফিরতেই দেখে, পুলটার উপর দিয়ে এক বাঙালী নারী—কিশোরী বলেই মনে হয়—দ্রুত চলে যাচ্ছেন!

তার বুকখানা দমে গেল। বুঝি সে-ই! এসে চলে গেল! গজেন হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে এলো। সে যখন এধারে এসে পৌঁছুলো, কিশোরী তখন ত্বরিত গতিতে এগিয়ে এক সঙ্গিনীর হাত ধরে বাগানের ফটক পার হচ্ছেন। গজেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো। বাহিরে ফটকের সামনে একখানা মিনার্ভা কার—সঙ্গিনীর হাত ধরে কিশোরী কারে উঠলেন। কার তখনি চল্‌তে সুরু করলে। গ্যাসের আলো লেগে কিশোরীর মুখ বেয়ে রূপের একটা হিল্লোল ঠিক্‌রে পড়লো। গজেন বিমূঢ়ের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো,—খানিক পরে তার চেতনা ফিরে আসতে সে ঘড়ি খুলে দেখে, সাতটা বেজে আটাশ মিনিট।

ব্যাণ্ড-ষ্ট্যাণ্ডের উত্তর দিকে গাছতলায় একটা বেঞ্চে সে বসে রইলো; মাঝে মাঝে হতাশভাবে প্যাগোড়ার পানে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। অন্ধকারের মধ্যে প্যাগোডা ভূতের মত দাঁড়িয়ে, আর তার পায়ের তলায় সাদা চুণকাম-করা প্রতিমূর্ত্তিগুলোয় আলো পড়ায় মনে হচ্ছিল, একটা কালো ভূত যেন প্রকাণ্ড দাঁত মেলে অট্টহাস্য জুড়ে দিয়েচে!

বাড়ী এসে নিঝুমভাবে কতক্ষণ সে বাহিরের ঘরেই পড়ে রইলো। অন্দর থেকে খাবারের ডাক আসতে সে ভিতরে গিয়ে খেতে বসলো।

পরী বললে,—বন্ধু কেমন আছেন গো?

গজেন সংক্ষেপে জবাব দিলে,—ভালো।

পরী বললে,—দেখা হয়েছিল তো ?

গজেন বললে,—হয়েছিল।

হেসে পরী বললে,—অপরিচিতা কি বললে ?

…এঁ্যা! শপাৎ করে কে যেন গজেনের পিঠে চাবুক মারলে। গজেন মুখ তুলে পরীর পানে চেয়ে দেখে, সে মুখ হাসিতে ভরা—চোখে অবধি হাসির উচ্ছ্বাস। তবে কি চিঠিখানা ? না, চিঠি তো তার কাছেই বরাবর! সে হাতছাড়া করেনি, মুহূর্ত্তের জন্য না!…অসম্ভব!…তবে—

পরী বললে,—তোমার গাড়ী তো ছিল ইডেন গার্ডেনে। ভবানীপুরে গেলে কি করে ?

গজেন কচুরি হাতে হাঁ করে রইলো পরীর মুখের পানে চেয়ে। পরী হেসে উঠলো, বললে,—অপরিচিতার চিঠি পেয়ে অধীর হয়ে ছুটে গেছলে, তা দেখা মিল্‌লো না ? আহা!

গজেন স্তব্ধ, বিমূঢ়!

পরী বললে,—পুরুষ মানুষের অহঙ্কার সাজে না। ক লাইন চিঠি পড়ে দিগ্বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে ছুটেছিলে,—এখন শোনো ব্যাপারখানা। ও-বাড়ীর মায়া, বেশ গাইতে পারে কি না, তা ওদের বাড়ী গান শোনার সুবিধে নেই, শ্বশুর টম্বুর আছেন বাড়ীতে, কাজেই গাইতে পারে না। এখানে তার গান শুনবো বলে তাকে নেমন্তন্ন করেছিলুম। অথচ বাড়ীতেই বা শুনি কখন্! তুমি আছো, বেরুবে যদি তো আমায় না নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় বেরুবে না, তাই, কি করে তোমার হাত এড়াবো ঠিক করতে পারছিলুম না। মুস্কিল! তারপর ঐ ফন্দী আঁটলুম। জানি তোমাদের জাতের দুর্ব্বলতা। যতই বড় কথা কও না, নারীর একটু চটুল চাউনির ইসারায় না করতে পারো

তোমরা, এমন কাজ নেই! তার জন্যে দুঃখ করচি না। কমল এসেছিল, তাকে দিয়ে ঐ চিঠি আমি লেখাই। তাতে তুমি ঘর ছেড়ে একলা বেরুবে, জানতুম। ওধারে নরেন-ঠাকুরপো, ও তো ঐ বইয়ের পোকা, একদণ্ড বই ছাড়ে না—তাকে নড়ানোও শক্ত। যত বলি, সন্ধ্যাবেলায় একটু বাইরে বেড়াওগে, তা শুনবে না, বলে, বোঝো না সেজবৌদি; ভারী keen competition! একদণ্ড বই ছাড়লেই ও ভাবে, ফাষ্ট´ ক্লাস ফাষ্ট´ হতে পারবে না! তাই ঐ চিঠিরই আর একটা নকল তাকে পাঠালুম।···তোমাকে ভেতরকার কথা খুলে বললুম, তাকেও এক রকম করে সব বলবো। ছেলে বিয়ের নামে লাফিয়ে ওঠেন, আর এদিকে প্রেমপত্র পেয়ে এগজামিনের পড়া চুলোয় দিয়ে ছুটলো কোথায়, না, ইডেন গার্ডেনে ট্রামের পয়সা খরচ করে!···এ কি কম ফাঁদ,—কি বলো? যাই হোক, তোমার হায়রাণ হয়েচে খুব, তার উপর অত বড় আশায় এতখানি নৈরাশ্য,—মাপ করো। পরী হাসতে লাগলো; হাসতে হাসতেই বললে,—তোমরা গেছ কি না, পরখ করবার জন্যে ভোঁম্বোলের মিনার্ভা কার নিয়ে আমাতে আর মায়াতে গেছলুম ইডেন গার্ডেনে। ওঃ, ধরা পড়েছিলুম আর একটু হলেই! তুমি আমায় দেখে আমার দিকে যে রকম হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছিলে, ভাবলুম, ধরা পড়লুম বুঝি! শেষে ছুটতে হলো লজ্জার মাথা খেয়ে—পরী হাস্তে হাস্তে একেবারে গড়িয়ে পড়লো।

কোনোমতে লজ্জার পাশ কাটিয়ে গজেন বললে,—যাক, নরেনের কাছে মোদ্দা বলো না যে আমাকেও চিঠি লিখেছিলে, আর আমি ঐ চিঠি পেয়েই সেখানে গেছলুম। হাজার হোক্ আমি বড় ভাই, আমার একটা ইজ্জত আছে তো ওর কাছে।···এইটুকু করুণা করো।

পরী বললে,—না গো, না! সেটুকু বুদ্ধি আমার আছে। পরীর হাসি আর থামে না।

গজেন নিঃশব্দে ভোজন সমাধা করতে লাগলো। তার মনে অত্যন্ত আপশোষ হচ্ছিল, এত বড় নৈরাশ্য সে অনায়াসে সহ্য করতে পারতো যদি ওটার মধ্যে কিছু সত্যও থাকতো! কিন্তু হায়রে তাও অদৃষ্টে ঘটলো না! চিঠিখানা একদম ভূয়ো!

চিরন্তনী

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। চারুর বাগানে মস্ত দল জড়ো হইয়া ছিলাম, পিকনিক-পার্টিতে। দীনেশ রান্নার ভার লইয়াছিল, পূর্ণ ছিল তার য়্যাসিষ্টাণ্ট। কাজেই আহার জুটিবে, যার নাম সেই রাত বারোটার পর! অগত্যা প্রকাণ্ড দীঘির পাড়ে শাণ-বাঁধানো চাতালে জাজিম পাতিয়া তাকিয়া ঠাসিয়া রাজ্যের আলোচনা জুড়িয়া দিলাম, আমরা কয়জনে।

দীঘির দু'ধারে নারিকেল আর সুপারি গাছের সার। ওপারে ঝাউয়ের কেয়ারি। দখিণ হাওয়ায় বেল, জুঁই, হাস্নাহানার গন্ধে প্রাণটা মশ্গুল হইয়া উঠিতেছিল।

চারু কুলপী তৈরী করিয়া আনিলে আমরা বলিলাম,—বসোনা হে, একটু গল্প-সল্প করা যাক্!

চারুর বাগানে অতিথি। অমন গোঁয়ার-গোবিন্দ, এখন একেবারে বিনয়ের ভারে নুইয়া পড়িতেছে।

অমূল্য তাকে ধরিয়া বসাইল। চারু বলিল,—এই যে ভাই, তোদের একটু শীতল আতিথ্যে আপ্যায়িত করি আগে, দাঁড়া—খাওয়া কখন্ হবে, তার কোনো ঠিকানা নেই কি না!

অমূল্য বলিল,—এইজন্যেই বলেছিলুম, সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ। ন-গিন্নিকে যদি আনতিস্, তাহলে ওদিককার ব্যাপার এমন সুশৃঙ্খলে গড়ে উঠতো যে ভাবনার ফুরসৎই মিলতো না!

ঘোষাল বলিল,—আমোদ করতে বাগানে আসা! একটু ফুর্ত্তি! তা এখানে এসেও যদি সেই উদর-তৃপ্তির দিকেই এত ঝোঁক দিতে হয়, তাহলে মন বেচারা যেমন দরিদ্র, তেমনি দরিদ্রই থেকে যায় যে!

আমি কহিলাম,—ঠিক কথা! উদরের খোরাকের জন্য তোমার গৃহে তোমার গৃহিণীর শরণ নেওয়া যেতো তো! মনের খোরাকের জন্যই না ক্ষুধার্ত্ত মন নিয়ে এখানে আসা!

অমূল্য কহিল,—রে মূঢ়ের দল, মনের খোরাক নিতে এসেচো এই গাছপালার কাছে! সে খোরাকও যদি কেউ জোগাতে পারেন তো ওঁরাই!

টনু গান ধরিয়া দিল,—

মনের খোরাক দিতে কে পারে!
মন-অধিকারিণী সে বিনা রে!
মন যে হরিতে জানে, মোহিতে ছলিতে গো—
সে-বিনে মনের ধার কে ধারে!

চারু তার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—থাম্ রাস্কেল, দু'দিন বিয়ে করে তুই একেবারে মনের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া হয়ে উঠেচিস, না?

কুলপীর শীতল স্পর্শে বাক্‌বিতণ্ডা থামিলে নানা গল্পে মজলিস জমিয়া উঠিল। বাঙালীর মনুষ্যত্ব-জাগরণকে ভিত্তি করিয়া আলোচনা সুরু হইয়া হিন্দু-মোস্লেম প্যাক্ট, রাজরাজেশ্বরীর প্রতিমা-বিসর্জ্জন, বেরিবেরি সারিয়া শেষে শ্রীভগবানের বিরাট মহিমা—এমন লম্বা পাড়ি আর তর্কের কশরৎ বড় দেখা যায় না!

শেষে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে ঘোষালকে ধরিয়া পড়া গেল,—তুমি তো বিস্তর মুল্লুকের খবর রাখো হে, সদ্য খুব বেড়িয়েও এসেচো! দু'চারটে ধরো। তাকিয়ায় মাথা রেখে শুনি আমরা।

অমূল্য কহিল,—একটু রোমান্সের আমেজ দিয়ে বলো মোদ্দা! এই সন্ধ্যা, এমন ফুলগন্ধ বহে সমীরণে…

আবার আলোচনা। এবার অশোকের শিলালিপি হইতে সুরু করিয়া পাহাড়পুর, তক্ষশিলা ঘুরিয়া এ আলোচনা গিয়া ঢুকিল মিশরে। পীরামিডে চড়িয়া ম্যমি ঘাঁটিয়া আমেনেম্-হাতকে লইয়া সকলে যখন পরিশ্রান্ত, তখন ঘোষাল কহিল,—এ-সব ব্যাপারে একটা আপশোষ এই মনে জাগে ভাই যে, মানুষ কেবলি তার কেরামতি, বীরত্ব, বাহুবল, অর্থাৎ পশুত্বের বড়াই পৃথিবীর বুকে চির দিনের জন্য এঁকে রেখে গেছে। মানুষের মমতা, প্রীতি, করুণার পরিচয় এই সব শিলালিপিতে বা পাথরের স্তূপে আজ যদি আঁকা থাকতো, তাহলে বোঝা যেত, এই বুকের মধ্যে যে-সব মণি-মাণিক ভগবান পুরে দেছেন, সেগুলোর মানুষ কাল্‌চার করচে, সদ্ব্যবহার করচে!

টনু বলিয়া উঠিল,—কেন, অশোকের শিলালিপি……

ঘোষাল কহিল,—তাতেও ঐ দিগ্বিজয়ের বার্ত্তা, নয়তো আচার্য্যের আসন নিয়ে নিজের ধর্ম্ম-মত প্রচারের সেই বাহাদুরী! তার চেয়ে সের শার বানানো পথগুলি, পথের দুধারে বসানো গাছের শ্যামল ছায়া, দীঘি, কূয়া আমার মনকে বেশী স্পর্শ করে!

অমূল্য বলিল—ওয়ার্ডসওয়ার্থ কি সাধে বলে গেছেন, what man has made of man!

ঘোষাল কহিল—একটা গল্প বলি তবে, শোনো! দিল্লীর ওদিকে নতুন দিল্লী তৈরী করার ব্যাপারে মাটী খুঁড়তে খুঁড়তে বহু ইমারত ভাঙ্গা কবর বেরুচ্ছে তো! তার একটার দেওয়ালের মধ্য থেকে দুটো আস্ত নর-কঙ্কাল বেরিয়েচে—পণ্ডিতের দল এও সিদ্ধান্ত করেচেন, ওই কঙ্কালের একটি পুরুষের, অপরটি স্ত্রীলোকের।

ঘোষাল চুপ করিল। অমূল্য কহিল,—নিশ্চয়ই কোনো বাদশাহী কেচ্ছা!

সকৌতূহলে সকলে ঘোষালের পানে চাহিলাম। ঘোষাল কহিল,—সন্ধান নিছলুম। তাই বটে! এক বাদশা ছিলেন, বাদশার নামটা এখনো বেরোয় নি। তবে ওখানকার বুড়ো বাসিন্দারা পুরুষানুক্রমে যে-গল্প শুনে আসচে, সেইটে বললে। কে জানে, গল্প সত্য কি না, তবে মিথ্যা হলেও তার মধ্যে ছুটো জিনিষ তারিফ করার যোগ্য। প্রথম, পুরুষের বর্ব্বর মনের ক্রূর হিংসা সনাতন কাল ধরে চলে আসচে সমভাবে, শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কারে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে। দ্বিতীয়, এ গল্পটি যে বানিয়েচে, তার রচনা আর কল্পনাশক্তি সামান্য নয় এবং এ কবিত্ব আর কল্পনাশক্তি নিশ্চয় ঐ একটি গল্পে নিঃশেষ হয়নি। মনস্তত্ত্ববিৎ বড় বড় ঔপন্যাসিক বা কবির সঙ্গে একাসনে বসবার দাবী রাখে সে!

আমরা বলিলাম,—সমালোচনা পরে করো হে! আগে কাহিনীটা বলো!

ঘোষাল কহিল,—ছোট্ট কাহিনী! তাতে রস দিতে পারবো না। সে আর্ট আমার জানা নেই। নেহাৎ খপরের কাগজের নিউজ-কলমের একটা প্যারার মত শোনাবে।

চারু কহিল—ভূমিকা রেখে কথা আরম্ভ করো না, বন্ধু!

ঘোষাল কহিল—এক বাদশা ছিলেন। তিনি ভালোবাসতেন এক বাঁদীকে। বাঁদীর পক্ষে বাদশার নজর উপেক্ষা করা চলে না! কাজেই সে নিজেকে বাদশার খেয়ালী হাতে সঁপে দিয়েছিল। বাদশার আদরে তার দেহের লাবণ্য শতদলে ফুটে উঠতো না। বেচারী বাঁদী! তার মন চাইতো এক হীন বান্দাকে! ছু'জনে ছু'জনকে

ভালোবাসতো। অর্থাৎ বাঁদী তার দেহখানা দিয়েছিল বাদশাকে, তাঁর শক্তি আর সামর্থ্যের পায়ে। মনখানি কিন্তু সে ঐ বান্দার জন্য নিত্য নূতন সাধ-আশার ফুলে ভরিয়ে রাখতো! একান্তে হাসির বিদ্যুতে বান্দার আঁধার প্রাণটার মধ্যে আলোর দীপ্তি ফুটিয়ে তুলতো! নিভৃতে নির্জ্জনে বান্দাকে তার সুখ-দুঃখের যা-কিছু কথা বলতো, হাসি-অশ্রু নিঃশেষে উজাড় করে দিতো! বাদশার একদিন নজরে পড়লো বাঁদীর এই ক্ষণিক সুখ, তার ঠোঁটের ঐ শুভ্র অনাবিল হাসিটুকু! বাদশার অসহ্য বোধ হলো! বাদশার মণিমুক্তা যে হাসির এক কণা কিনতে পারেনি, বাদশার প্রতিপত্তি-হুঙ্কার যে-মনকে ফেরাতে পারেনি, এক গরীব বান্দা বিনামূল্যে তা পাচ্ছে, এত অজস্র-ভাবে, এমন অবলীলায়! বাদশা হুকুম দিলেন, এক দেওয়াল গড়বার। দেওয়াল গড়া হলো। দেওয়ালে পাশাপাশি দুটি ফোকর রাখা হলো। তার এক ফোকরে বাঁদীকে দাঁড় করানো হলো, আর একটায় সেই বান্দাকে। সঙ্গে তাদের তিন মাসের খোরাক দেওয়া হলো, তারপর বাদশা হুকুম দিলেন,—দেওয়াল গড়ে তোলো।

শিহরিয়া কহিলাম,—তারপর?

ঘোষাল কহিল,—দেওয়াল গড়ে তোলা হলো। বাদশার খেয়ালে বাদশার হুকুমে হীন বাঁদী হীন বান্দা জীবন্ত কবরিত হলো!

অমূল্য কহিল,—কি বর্ব্বর, কি নির্ম্মম!

ঘোষাল কহিল,—এমনি পোঁতা না পুঁতে ঐ যে তিন মাসের খোরাক দেওয়া...ভাবো একবার, ঐ খোরাক জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাদের কতখানি প্রলুব্ধ করবে! এমন আশাও তাদের ক্ষণে ক্ষণে মনে জাগবে যে, আহা, বেঁচে থাকলে দু'দিন পরে এই দেওয়ালের আড়াল ভেঙ্গে হয়তো দু'জনের সাক্ষাতের সুযোগ মিলবে! এই

যে মাঝে মাঝে আশার জাগরণ, পরক্ষণে তীব্রতর নৈরাশ্য···এতে দু'জনের মৃত্যু আরো কত নির্মম, কত ভীষণ হয়েছিল, ভাবো !

চারু কহিল,—শয়তান !

টনু কহিল,—uncultured brute !

আমি কহিলাম,—unculturedness-এর সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কালচার থাকলেই কি মানুষ হিংসা ছাড়তে পারে ?

ঘোষাল কহিল,—কারো-কারো মনে হিংসার ঝোঁকটা বেশী।

অমূল্য কহিল,—Jealousy ! কিন্তু তাও বলি, যেখানে ভালো-বাসা, সেইখানেই Jealousy. Jealousy হলো ভালোবাসার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ !

ঘোষাল কহিল,—তাহলে আর একটা গল্প বলি, শোনো—মীরাটে আমার এক ইংরাজ বন্ধু ছিলেন। তাঁর নাম মরিসন। মরিসনের বাংলায় ছিল এক পাঠান জমাদার—জমাদার মানে দরোয়ান। মরিসনের এক বন্ধু জনষ্টন প্রায়ই তাঁদের বাংলায় এসে গল্পসল্প করতেন ; অর্থাৎ মরিসন-দম্পতীর সঙ্গে জনষ্টনের খুব অন্তরঙ্গতা ছিল। মরিসনকে দিন পনেরোর জন্য হঠাৎ কি কাজে কারাচি যেতে হয়। তার মেম একা থাকতো। জনষ্টনই তখন তার একমাত্র সঙ্গী। জনষ্টনের সঙ্গে মরিসনের মেম বেড়াতে যেতো, গল্প করতো, তাস খেলতো ; গান-বাজনা হতো দু'জনের। দু'জনে নাচের পার্টিতেও যেতো। দু'জনে এক সঙ্গে বসে অমন রাত এগারোটা-বারোটা অবধি গল্পসল্প, গান-বাজনা করেচে। পাঠান জমাদারটা কাঠ হয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতো, নড়তো না। সেদিকে জনষ্টন বা মরিসনের মেমের নজর পড়েনি, কারণ দরকার হয়নি নজর পড়ার। একদিন মীরাটে গোরাদের এক থিয়েটার হয়—জনষ্টন এসে মরিসনের মেমকে তার বাংলা থেকে

নিয়ে যাবে, কথা ছিল। রাত ন'টা। জনষ্টন এসে হাজির তার মোটর-বাইকে—কিন্তু পাঠান জমাদারটা ফটকে দাঁড়িয়ে কঠিন দুর্গের মত! জনষ্টনকে বললে, সাহেব না এলে রাত্রে সে জনষ্টনকে মেম-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না! জনষ্টন বললে,—মেমসাহেবকে খবর দাও। অবিচল স্বরে পাঠান বললে,—কভি নেহি! হাম যানে নেহি দে'গা। সাহেব রেগে উঠলো। তবু পাঠান অটল! শেষে সে স্পষ্ট বলে দিলে, সাহেবের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর সঙ্গে বাহিরের পুরুষ এসে রাত্রে দেখা করবে, মেলামেশা করবে, এ সে জান্ থাকতে বরদাস্ত করবে না! জনষ্টন বললে, সাহেব তার বন্ধু! পাঠান জবাব দিলে, হোক বন্ধু, তাতে কিছু এসে যায় না! মেমসাহেব তার মনিবের স্ত্রী! মনিবের ইজ্জৎ! তাকে এর কৈফিয়ৎ দিতে হবে! পাঠান বললে, চাকরি খোয়াতে সে পারে, কিন্তু মনিবের ঘরে এত বড় বেয়াদবি সে বরদাস্ত করবে না! জনষ্টন চলে গেলো। মেমসাহেব সেজে-গুজে বাংলায় বসে রইলো। তার পরে মরিসন সাহেব এলে এ কথা উঠতে পাঠানের কৈফিয়ৎ তলব হলো। পাঠান বললে, মনিবের বিশ্বাস সে রক্ষা করেচে! মনিবের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে অপর পুরুষ এসে রাত্রে গান-বাজনা বা নিভৃত আলাপ করবে, এ তার চোখে বরদাস্ত হয় নি! মরিসন আর তাঁর মেম, দু'জনেই অবাক হয়ে গেলেন! এর মাথায় কি এমন ঢুকলো যে···সাহেব আমায় বললেন—তোমাদের দেশের লোক এমন যে, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে দূষ্যভাব ছাড়া বন্ধুভাবে মেলামেশা কত সহজ, তার আইডিয়াও করতে পারে না! আমি কোনো জবাব দিতে পারিনি—দিইনি! যদি বলি, অশিক্ষিত পাঠান, তাই! তাহলেও কথাটা ঠিক হয় না! কেননা, শিক্ষিত আমরাও এ-রকম ব্যাপারে ইতর সন্দেহ আর ক্রুদ্ধ মন নিয়ে জ্বল্‌তে থাকি তো!

'জেলশি', ভালোবাসা লইয়া বন্ধুর দলে অনেক কথা উঠিল। অমূল্য বলিল,—কিন্তু শিক্ষার গুণে আমরা নারীকে এখন আর এমন সন্দিগ্ধ চোখে দেখি না...বিশেষ স্ত্রী...যাঁর সঙ্গে মনের খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাঁকে অবিশ্বাস করে বসবো...এ কি রকম জেলশি! স্ত্রীর ভালোবাসায় ও 'জেলশি'র কথা উঠতেই পারে না!

চারু বলিল,—কিন্তু শিক্ষিত পুরুষের মধ্যেও এমন লোক আছেন, যিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি অপরের একটু মনোযোগ বা তারিফ. সহ্য করতে পারেন না!—কথাটা বলিয়া চারু অমূল্যর পানে চাহিল।

অমূল্য বলিল,—ঠিক। এ-রকম একটা ব্যাপার আমি জানি। ব্যাপারটা আদালত অবধি গড়িয়েছিল। তোমরাও শুনলে বুঝতে পারবে —বেশী দিনের ঘটনা নয়, খপরের কাগজে রিপোর্টও বেরিয়েছিল।

সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম,—কোন্ ব্যাপারটা হে?

অমূল্য বলিল,—শোনো...তবে নাম-ধামগুলো সঠিক বলবো না। আসল নাম গোপন করে ছদ্ম নামের আড়ালে বলে যাবো...

—শঙ্কর বড়মানুষ লোক, কারবারী। এই কলকাতা সহরের বুকে তার মোটর, তার কারবার কারো অজানা ছিল না। বিদেশে প্রায় বছর কয়েক ঘুরে সেখানে থেকে পয়সা আনার কতকগুলো কশরৎ আর হদিশ শিখে কায়েমী হয়ে সে কলকাতায় এসে আস্তানা পেতে বসলো, এবং অবসর পেয়ে একটি বিবাহও করলে। স্ত্রী তরুণী, পরমা সুন্দরী; তবে গরিবের মেয়ে। শঙ্কর তার লক্ষ্মীর প্রসাদ-ভরা হাতখানি বাড়াবামাত্র শ্বশুর তাঁর অনূঢ়া তরুণী মেয়ে বীণাকে তার হাতে তুলে দিয়ে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করলেন।

এই মেয়ে বীণা গরিবের ঘরে জন্ম নিলে কি হবে, তার দেহের বর্ণ, তার শ্রী, তার মন,—এ সব ছিল রাজ-সিংহাসনের যোগ্য। তার

অনিন্দ্য কান্তির সঙ্গে আর একটি জিনিষ ভারী আশ্চর্য্য মিশ খেয়েছিল, সে তার তেজ! একটা দীপ্ত মহিমার মত তার রূপশ্রীকে এই তেজ উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। এই তেজ এই মহিমার সামনে পথের মত মলিন কুৎসিত নির্লজ্জ দৃষ্টি একেবারে কুণ্ঠিত হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়তো। তাকে দেখলে মনে হতো, সে যেন নিপুণ শিল্পীর হাতে-গড়া একখানি উজ্জ্বল প্রতিমা!

প্রতিমা বলচি এই জন্য যে, পৃথিবীর ধূলামাটী তাকে স্পর্শ করতে পারেনি, বুঝি তার মনের নাগালও পায়নি কোনোদিন! শঙ্করের ঘরে এসে সে সুখী হয়েছিল? না। শঙ্কর তার নিজের কাজ-কর্ম্ম, হিসাব-নিকাশ এই নিয়েই মশগুল থাকতো সর্ব্বক্ষণ। আর বীণা? গৃহপিঞ্জরের মধ্যে চুপ করে পড়ে থাকতো! বাহিরের আলো-হাওয়া, বাহিরের কোলাহল-কলরব কতখানি স্বাস্থ্য, কতখানি জীবন নিয়ে উথলিত উছলিত বয়ে চলেছে, তার কোনো পরিচয়ই বীণার প্রাণের দ্বারে পৌছুতো না! বীণা বাহিরের সংস্পর্শে আসবে, এ ব্যাপারে শঙ্করের প্রচণ্ড নিষেধ কঠিন লৌহদুর্গের মত খাড়া ছিল। বীণা কাঠ হয়ে বসে থাকতো, বড় লোকের অত-বড় পাথর-মহলের ক্ষুদ্র এক আঁধার কোণে! এই কোণটির প্রতি তার জন্মগত আকর্ষণ ছিল, সে কথা ভেবো না। কি করে এ মায়া জাগলো, তার একটু ইতিহাস আছে।

বীণা খুব মিশুক ছিল। হাসিখুশী খেলাধূলা,—এগুলোয় তার ছিল প্রচণ্ড অনুরাগ। একদিন দুপুরের অলস অবসরে কোমরে কাপড় জড়িয়ে দোতলায় সে লুকোচুরি খেলা খেলছিল, শঙ্করের কয়েকটি পোষ্যের সঙ্গে। শঙ্কর দৈবাৎ তার চেক-বইখানা নিতে গৃহে এসে বীণার এই হাসিখেলা দেখে কঠিন ভৎর্সনায় তাকে শাসন করে গেল!

স্পষ্ট বলে গেল, ঐ কোমর-বাঁধা মূর্ত্তিতে বীণার লাবণ্যশ্রী যেন চতুর্গুণ উথলে উঠেচে,—সে একেবারে পাগল-করা মোহিনী-মূর্ত্তি! ও রূপে পুরুষ প্রলুব্ধ হয়, প্রমত্ত হয়। নারীর উচিত নয়, নিজের রূপশ্রীকে এমনভাবে ফুটিয়ে প্রলোভনের জাল পাতা! শঙ্করের শাসন যদি ভদ্রভাবে স্পর্শ করতো, তাহলে বীণা এতখানি মুষড়ে পড়তো না, কিন্তু তার শাসন ঐ ইতর ইঙ্গিতকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হলো! শঙ্কর আরো বললে,—এ বয়সে সমস্ত দেহের লাবণ্যকে অমন প্রলুব্ধভাবে ফুটিয়ে তোলায় বাড়ীর চাকর-বাকরগুলোকেও দুরস্ত রাখা দায় হবে! তারা চঞ্চল হতে পারে, ও শোভা-দর্শনে! তাছাড়া খেলায় কিশোর ভাগনেটি সঙ্গী ছিল। লুকোচুরি খেলায় তাকে নেওয়াটাই যে বীণার মস্ত অপরাধ! ভাগনেকে পড়াশুনা ছেড়ে এভাবে খেলা করার দরুণ এমন কড়া শাসন করে গেল যে, সে-বেচারার বীণার সঙ্গে দেখা করা বা কথা কওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হলো।

ঘোষাল বলিল,—একটা কথা বলে একটু বাধা দেবো। বহু পুরুষের মনের মধ্যে সেই যে আদিম বর্ব্বর হিংসা বস আছে, সেই হিংসাই এ-রকম ব্যাপারে মনে জেগে মনকে ক্ষিপ্ত করে তোলে···অর্থাৎ স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষের আদিম যে লিপ্সা···যার মূলে হয়তো বহু বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, সে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা তুলচি না, তবে এইটুকু বলচি,—যে, ঐ হিংসা সম্পূর্ণ নিজস্ব স্ত্রী, অর্থাৎ নারীটিকে একমাত্র আপনার চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের উপভোগের বস্তু বলে জেনে রেখেচে! স্ত্রী যদি শোভা-সজ্জায় একটু বেশী রমণীয় শ্রীতে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে বা অলস অবসরে তাঁর অঙ্গের আবরণ ঈষৎ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে তো ঐ হিংসা অমনি নিজের স্বত্ব রক্ষার জন্য ক্ষেপে ওঠে—ও শোভা অপরের চক্ষুকে নিমেষের জন্যও যেন বিমুগ্ধ না করে!

অর্থাৎ বহু পুরুষ ভাবে, তাদের স্ত্রীরা যেন অপরের প্রাণে এতটুকু বিভ্রম বা admiration জাগিয়ে না তোলেন !

অমূল্য কহিল—ঠিক এই ব্যাপারই এখানে ঘটেছিল। পরে বলচি। বীণা এ শাসনে একেবারে তার সহজ ভঙ্গী বিসর্জ্জন দিয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। অপরের সঙ্গে হাসা বা প্রাণ খুলে গল্প করা—সেদিকেও শঙ্করের শাসন নিষেধের প্রাচীর তুলে দিলে! বেচারী নির্জ্জনে বসে বই পড়েই অবসর যাপন করতো। কাব্যের কল্পলোক হলো তার বিচরণের জায়গা; উপন্যাসের পাত্রপাত্রী হলো তার নির্জ্জনতার সঙ্গী। একদিন শঙ্কর এসে দেখে, বীণা 'নষ্টনীড়' পড়চে। শঙ্কর বইখানা কেড়ে নিয়ে তার কাজ ফেলে পড়তে বসে গেল! পড়া শেষ হলে রুদ্র মূর্ত্তিতে বীণার পানে চেয়ে বললে, এ বই কুলবধূর পড়ার যোগ্য নয়! বইখানা সে ছুড়ে পথে ফেলে দিলে। তারপর সন্ধান নিলে, বই বীণা কোথা থেকে পায়? সেই ভাগনে। একে কিশোর বয়স, তায় ঐ নষ্টনীড়ের গল্প! ভূপতির কাজ-কর্ম্মের অন্তরালে স্ত্রী চারুর চিত্ত খেলা-ধূলার মধ্য দিয়ে অমলের উপর যে-ভাবে নির্ভর করে চলেছিল, সেই ছবি তার মনে জেগে উঠলো। তার ফলে ভাগনেটির নির্ব্বাসন হলো। অর্থাৎ তার পড়াশুনার দিকে শঙ্করের অসম্ভব চাড় পড়লো এবং তাকে সে একেবারে হোষ্টেলে চালান করে দিলে। বীণা? সে এই-সব কড়াক্কড়ির অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে এক কোণে দলিত ম্লান ফুলের মত পড়ে রইলো।

তোমরা ভাবচো, শঙ্কর বীণাকে খুব ভালোবাসতো? গহনা টাকা-কড়ির ভারে স্ত্রীকে আচ্ছন্ন করে রাখা যদি ভালোবাসার প্রমাণ হয়, তাহলে শঙ্কর বীণাকে ভালোবাসতো! কিন্তু আমরা তো জানি, নারীর মন এ সব তুচ্ছ বস্তুগুলোয় তৃপ্ত থাকে না! স্বামীর একটু

স্নেহ, প্রীতি, একটু হাসি, আদর, সোহাগ; দরদ, মমতা—এ-সব পেলে গহনার কথা তার মনেও জাগে না! আমাদেরি দেশের জীর্ণ শতচ্ছিদ্র কুটীরে তার শত-সহস্র প্রমাণ কি প্রদীপ্ত মহিমার বর্ণে জাজ্বল্যমান দেখতে পাই! টাকা-কড়ি কি ছার বস্তু! সারা দিনরাত্রি কঠিন পরিশ্রম—তার অন্তরালে রাত্রে সেই নিমেষের প্রাণ-খোলা অন্তরঙ্গতা—এতে নারীর সুখের আর সীমা থাকে না···!

শঙ্কর বীণাকে ঠিক নিজের বিলাসের বস্তু বলেই জেনে রেখেছিল। তার দাস-দাসী যেমন হুকুম তামিল করে তাকে কায়িক পরিশ্রম থেকে রক্ষা করে, তার মোটর গাড়ী তাকে যেমন আরাম দেয়, ইলেক্‌ট্রিক ফ্যান, ইলেক্‌ট্রিক বাতি যেমন তাকে শান্তি দেয়, তেমনি তার কর্ম্মের অবসরে বীণাও নিজের দেহের দীপ্তি, যৌবনের লাবণ্য, দেহের আলিঙ্গনে তাকে আরাম জোগাবে, সুখ জোগাবে, বিরামের মোহে বিমুগ্ধ করবে! কিন্তু এই কি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক? স্ত্রী তো নারীমাত্র নয়। স্ত্রী যে চিন্তায় কার্য্যে সঙ্গিনী! সাধে আমাদের শাস্ত্র বলেচে, স্ত্রী সহধর্ম্মিণী? আমরা ক'জন স্ত্রীকে তাঁর যোগ্য মর্য্যাদা দি? কিন্তু যাক্ সে কথা!

প্রায় বছর দুই পরে এক ব্যাপার ঘটলো। এতখানি দরদ-হীনতার মধ্যে থেকেও বীণার লাবণ্যশ্রী বেড়েই চলেছিল! বুঝি, এর মধ্যে তার ভাগ্য-বিধাতার কি নির্ম্মম ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল! শঙ্করের এক ধনী ভ্রাতা তার গৃহে অতিথি-বেশে উপস্থিত হলো। তার সঙ্গে শঙ্করের আর্থিক সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠভাবে বেড়ে উঠছিল। এই ভাইটি যেন একেবারে স্বাস্থ্যের সজীব হাওয়া! কারো কোনো বাধা-নিষেধের সে কোনো তোয়াক্কা রাখতো না। কি জানি, বোধ হয়, অনেকখানি অর্থের আসনে বসে আছে বলে দুনিয়ার পথেও নিজের গতিকে বাধাহীন সুপ্রশস্ত করে সে বিনা-দ্বিধায় চলে যেতো এবং যেখানে

কোনো নিষেধের পাহারা, সেখানেও একটা টোকা মারতে সে এতটুকু ইতস্তত বোধ করতো না।

সে এ বাড়ীতে এসেই শঙ্করকে বললে—বৌদি কোথায়? তাঁকে সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেচো না কি শঙ্কর-দা?

এর কথা এমন নিঃসঙ্কোচ যে তার সান্নিধ্য শঙ্করকেও দুলিয়ে তুল্‌লে। সুনীতি বললে—বামুন-চাকরে জলখাবার এনে আপ্যায়িত করবে, বাড়ীর গৃহিণী বাঁড়ীতে থাকতে! এ দস্তুরমত অপমান! আমি খাবো না।

শঙ্কর এ কথার উপর কোনো কথা বলতে পারলে না, বীণাকে ডেকে আনলে। সুনীতি তাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল—এত রূপ, এমন শ্রী! প্রথমটা সে কেমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল, তারপর চমক্ ভাঙতে বীণার পায়ের কাছে ঢিপ্ করে প্রণাম দিয়ে সে বললে—আমি দ্যাওর হই, বৌদি। তোমার গৃহে কয়েক দিনের অতিথি। তা তুমি নিজে অতিথি-সৎকার না করে যদি তোমার মাইনে-করা ভৃত্যদের হাতে সে ভার দাও, তাহলে প্রকারান্তরে বলা হয় না কি যে, এ গৃহে তোমার স্থান হবে না, বাপু?

এই সরস কৌতুক, এই প্রাণ-খোলা কথার উচ্ছ্বাস—বীণা যেন চমকে উঠলো! এ জিনিষ যে তার কাছে কোন্-স্বপ্নে-ভেসে-আসা এক অজানা লোকের স্মৃতির মতই! মুখ তুলে সে চাইলে। সুনীতির মুখে-চোখে হাসির জ্যোৎস্না মাখানো! কথার সুরে জীবনের কি প্রবাহ! তার সামনে এই যে এত বড় পুরীটা জমাট পাথরের স্তূপে পরিণত হয়েছিল, সুনীতির হাসি আর কথার উচ্ছ্বাসে সে পাথর যেন গল্‌তে সুরু হয়েচে, এমনি মনে হলো! দু'দিন পরে সুনীতি ধরে বসলো—চল শঙ্কর-দা, বায়োস্কোপে যাই!

শঙ্কর বললে,—বেশ, চলো।

সুনীতি বললে,—বৌদিকে তৈরী হয়ে নিতে বলো।

বৌদি! শঙ্কর চম্‌কে উঠলো! কিন্তু বিধাতা এমন কল খাটিয়ে ছিলেন, ঐ পয়সা-কড়ির দিক দিয়ে এমন জাল যে, সুনীতির কথায় 'না' বলা শঙ্করের শক্তিতে কুলোলো না! অগত্যা বৌদিকেও তৈরী হতে হলো। বেরুবার মুখে বৌদিকে দেখে সুনীতি বললে—এ কি বেশ! এ যে কলাবৌ সেজেচো! এতখানি ঘোঁমটা টেনে মানুষ পথে চলে কখনো! ছি, ছি!—ও শঙ্কর-দা, এখনকার কাপড় পরার ষ্টাইলটাও তোমার অন্তঃপুরে এসে পৌছয় নি? আর তুমি মোটর চালিয়ে বলো, আপ্ টু-ডেট্ হয়েচো!

নিরুপায়! বীণাকে আপ-টু-ডেট্ সেজেই আসতে হলো। বীণার তো জুতো-মোজা ছিল না। পথে কেনা হলো; এবং তা দিয়ে চরণ-ভূষাও সম্পাদিত হলো। তারপর বায়োস্কোপ। সুনীতি তাকে ছবির নর-নারীর মনের সমস্ত লীলাটুকু অবধি এমন পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে লাগলো যে, বীণার প্রাণ এই দরদী লোকটির উপর দরদে ভরে উঠলো। এমন লোকও উপন্যাসের বাইরে জীব-জগতে ছিল? প্রাণের জীবন্ত মূর্ত্তি! যখন বায়োস্কোপ থেকে ফিরলো, বীণার মন তখন এক নূতন জগতের নূতন আলোয় ভরে উঠেচে!

তারপরে নানা গল্প-গাথা ব্যঙ্গ-হাসি-আলাপের মধ্য দিয়ে বীণার মনের সে পঙ্গু জড় ভাব কোথায় যে ডুবে গেল! এ-সবের মধ্যে মনে মাঝে মাঝে শঙ্করের একটু রুদ্র হুঙ্কার, সরোষ ইঙ্গিত বিদ্যুতের মত বিরলে ফুটে উঠতো; কিন্তু সেই সঙ্গে ওদিকে অত দরদ, অত কথা, হাসি-খুশীর ঐ ঝাপ্‌টা! বীণার মন দুঃস্বপ্নের মত সে হুঙ্কার, সে ইঙ্গিত ভুলে সরসতায় ভরে থাকে!

সে সরস সহাসভঙ্গীতে তার রূপশ্রী আরো উছলিত হয়! তা দেখে শঙ্কর জ্বলে ওঠে! সগর্জ্জনে বীণাকে নিভৃত অন্তরালে টেনে এনে বলে,—ওর সাম্‌নে বেশ! আর কাছে এলেই প্রাণহীন কাঠের পুতুল!

এ-কথায় বীণা মুষড়ে পড়ে। তার সাধ হয় বলে,—ওগো, আমার কি ইচ্ছা নয়, এমনি হাসি-খুশীর ডালি তোমার পায়ে ধরি? কিন্তু তোমার ভ্রূভঙ্গীর সাম্‌নে কি যে ভয় হয়! শাসনের সহস্র স্মৃতি মনকে এমন চেপে ধরে!

বীণার এই নীরবতায় শঙ্কর আরো অধীর হয়! কাণের পাশে কে যেন কেবলি বলে, নষ্টনীড়! নষ্টনীড়! তবে কি বীণার 'মন' ছিল? স্নীতি ঐ হাসির দামে সে মনকে কেড়ে নিচ্ছে? একটা সংশয় বিষাক্ত তীরের ফলার মত তার বুকটাকে বিঁধে ধরছিল! কিন্তু অনুযোগ তোলার মত কোথাও তো কিছু ঘটচে না। দু'জনের অমন সরল হাসির অমল ভঙ্গী! তবু·····

এই বীণাকে শঙ্করও তো দেখে আসচে এতদিন! যেন পুতুলটি! তার সঙ্গে বসে কোনোদিন কি এমন গল্প করেচে, এ হাসি কখনো হেসেচে বীণা! এ কথা তার মনেও হলো না যে বীণাকে এ-হাসি হাসার কোনো স্নযোগ কি সে দিয়েচে! এমনি গল্প? না দিক, বীণার দিক থেকে কোনো আগ্রহও তো জাগেনি কোনোদিন! ঐ যে স্নীতি! তার খাওয়ার সময়টিতে বীণা শত কাজ ফেলে তার সামনে এসে বসে! সকালে চায়ের পেয়ালায় বীণার প্রাণের সমস্ত আবেগ-যত্ন চা-টুকুকে কতখানি স্বাদু, স্নতার ও স্নপেয় করে তোলে! খানসামা চা তৈরী করে—এ বাড়ীর চিরদিনের দস্তর-মত! স্নীতি যে-দিন বললে,—চাকরের হাতে চা খাবো কেন, বৌদি, তুমি থাকতে? সেদিন থেকেই বীণা কেট্‌লি নিয়ে বসে গেল, চা করতে! শঙ্কর তো

ঐ চাকরের হাতের চা-ই পান ক'রে এসেচে চিরকাল। বীণা তো বলেনি, আমি চা তৈরী করে দেবো! শঙ্কর অবশ্য এমন কথা জানায় নি, এ কথা ঠিক…তবু সে তার স্ত্রী! স্বামীর এ সেবাটুকু নিজে থেকে অনায়াসে আগ্রহভরে জোগাতে পারতো তো! স্ত্রীর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে সেবা-যত্ন? ধিক্! স্ত্রীর নিজের মন এদিকে উদ্যত অধীর হয়ে ছুটে আসবে না?

তারপর কাজ থেকে বাড়ী ফিরলে…? শঙ্কর চিরদিন ফিরে নিঃসঙ্গ অমন চুপ করে বসে থেকেচে…আর এখন? বীণা ছুটে এসে সুনীতিকে অভ্যর্থনা করে—শীতল পানীয়ে তাকে আপ্যায়িত করে, নিজে এসে ফ্যানের সুইচ খুলে দেয়! বীণা যেন এত বড় পুরীর মধ্যে অধীর প্রতীক্ষায় বসে থাকে সর্ব্বক্ষণ, ঐ সুনীতির জন্য! শঙ্করও পানীয় পায়, কিন্তু কেন? সুনীতির হাতে সরবতের গ্লাস ধরে দেওয়া—অথচ সামনে শঙ্করও বসে আছে, খারাপ দেখাবে,—তাই এ নীরস কর্ত্তব্য-পালন মাত্র, একটা লৌকিকতা!

তবু এগুলো নিয়ে কোনো অনুযোগও তোলা যায় না! সুনীতি আসবা মাত্র শঙ্কর নিজে বীণাকে বলেছিল, সুনীতি দুদিনের অতিথি, সম্পর্কে তার ভাই! তার আদর-অভ্যর্থনায় যেন কোনো ত্রুটি না ঘটে! বীণা তাই এ যত্ন দেখায়!…মন তবু ঝেঁজে বলে উঠলো—তা করুক, তবু সে স্বামী! অতিথিরও উপরে তার আসন! আগে শঙ্কর, তারপর সুনীতি!

একটা ক্ষোভ, একটা ঈর্ষা…শঙ্করের মন যেন জ্বলতে থাকতো! সে রাত্রে সুনীতি কোথায় নিমন্ত্রণ রাখতে বেরিয়ে গেলো! বীণা শুতে এসেও নিশ্চিন্ত রইলো না! ফিরে এসে উপরের দরজা খোলা পেতে যদি তার দেরী হয়? খাবার জল…যদি একটা লিমনেড কি সোডা

খেতে চায়? চাকররা যদি ঘুমিয়ে পড়ে?···বীণার মুহূর্ত্ত স্বস্তি ছিল না। সুনীতি ফিরতে সে ছুটে গেল···ফিরতেও দেরী হলো! ঠাকুরপো সোডা খেতে চাইলে—বরফ ছিল না! দোয়ারকাকে দিয়ে বরফ আনাতে হলো···তারপর ঠাকুরপো গল্প বলছিল, নিমন্ত্রণ-বাড়ীর কত কথা! কি করে সে চলে আসে? শঙ্কর ঈর্ষায় জ্বলছিল এই সব খুঁটীনাটী ঘটনায়।

শেষে একদিন সুনীতির বিদায়ের ক্ষণ এলো। সুনীতি চলে যাবে। বীণার আকাশ অন্ধকারে ভরে উঠলো! এই হাসি-খেলার শুভ্র জ্যোৎস্না সব নিভে যাবে' এ হাসির জ্যোৎস্না-স্পর্শে তার মন যে অনেকখানি ভরে উঠেচে! তার হাওয়ায় শঙ্করের কাছ থেকেও কখনো দু'এক টুকরো প্রসন্ন হাসিও সে লাভ করেচে! শাসনের কঠিন বাঁধনও বহু মুহূর্ত্ত অমন শিথিল হয়েচে! দুনিয়ায় রঙের ছোপ লেগেচে! সে সব আবার অন্ধকারে জমাট কালো পাথর হয়ে মিশে যাবে! সে তো বেশ ছিল নিজের সঙ্গে বোঝাপাড়া করে! আবার আজ···তার দুই চোখ অশ্রুময় হয়ে উঠলো!

সুনীতি বললে,—ছেলেমান্সী ত্যাখো বৌদির···আরে, আমায় যেতেই হবে তো। আবার মাঝে মাঝে আসবো—তা, বৌদি কাঁদতে সুরু করেচে! বীণার চোখের জল কোনো-মতে চোখের পিছনে স্তম্ভিত ছিল। এ-কথায় সে বাঁধ ভেঙ্গে অঝোরে ঝরে পড়লো। শঙ্কর বীণার পানে চেয়ে বিরক্তি-ভরা সুরে বল্‌লে,—সঙ! বৌদির আঁচল ধরে ও বসে থাকবে? না? হাসি আর গল্প—এই নিয়েই জীবন নয়! কাজ, কাজ, শত কাজ আছে জীবনে!

কথাটা শঙ্করের নিজের কানেই কেমন বিশ্রী ঠেকলো। সুনীতিরও লেগেছিলো! এই কি সান্ত্বনা!

তারপর দুপুরে বিদায়ের ক্ষণ! শঙ্কর নীচে নেমে গেছলো কি কাজে। উপরে সুনীতিকে ডাকতে এসে দেখে, বীণা দুঃখে একেবারে হেলে পড়েচে, আর সুনীতি তার হাতখানি ধরে সান্ত্বনার ছলে কি বলচে। শঙ্কর বললে—উঠে এসো সুনীতি। কাঁদুক! ওরে, আমার মায়াময়ী দরদিনী···

সুনীতি বললে—আহা, রাগ করচো কেন, শঙ্কর-দা?

এ-কথায় শঙ্করের মনের মধ্যে এতদিনকার সঞ্চিত পুঞ্জিত হিংসা একেবারে তার ভদ্রতার খোলস ফেলে প্রচণ্ড গর্জ্জনে গর্জ্জে উঠলো—এ সবের কি মানে, আমি তা বুঝি না, ভাবো সুনীতি? উনি তোমাকে ভালোবেসেচেন। ভালোবাসা! লভ্! তোমার বিরহ সহ্য হবে না ওঁর!

—শঙ্কর-দা! সুনীতি লাফিয়ে একেবারে শঙ্করের সামনে এসে দাঁড়ালো। শঙ্কর বললে—তোমারো অন্যায় এ-ভাবে ওঁকে প্রশ্রয় দেওয়া। উনি অপরের স্ত্রী। ফ্লার্টিং জিনিষটা লোভনীয় হলেও তাতে অপরের অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ করা হয়! এই অবধি বলে সে চুপ করলে। সুনীতি স্তম্ভিত! শঙ্কর পরক্ষণে বললে,—আসলে, মেয়ে জাতটাকে তুমি চেনো না! আমাদের শাস্ত্রকাররা নারীকে অন্দরের ভেতর পুরে রাখতে বলেচেন্ কি সাধে!

সুনীতির দুই হাত একটা হিংস্র বাসনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো! নিজেকে কষ্টে সম্বরণ করে সে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়লো। শঙ্কর ব্যঙ্গ-ভরা স্বরে বললে,—ওঁকে দেখে নেবো'খন। ওঁর প্রেম-ব্যাধির দাওয়াই আমি জানি।

সুনীতি বলে উঠলো—চুপ করো শঙ্কর-দা। কাকে কি বলচো, তুমি জানো না! নিজের স্ত্রীকে ভালো না বাসো,—নারী বলেও বৌদিকে একটু সম্ভ্রম করো।

শঙ্কর বললে,—আমি অন্ধ নই। তোমারো দরদ কেন জেগেচে এত জানি! তরুণী, রূপসী, পরস্ত্রী—দরদ তাই এত! কিন্তু আমাদের সমাজে flirting চলে না।

শঙ্কর পৈশাচিক উত্তেজনায় উঠে সামনের আলমারি থেকে একটা রিভলভার বার করলে। সুনীতি বললে,—মারবে না কি?

শঙ্কর বললে—না। আমি জ্বলচি এই একমাস ধরে। অনেক ভেবেচি···চাঁদের আলোয় বসে দুজনের অজস্র হাসি-গল্প দেখেচি। তোমার সামনে ওঁর প্রাণ এমন সরস হয়ে ওঠে, যত্নের সীমা থাকে না—আর আমি স্বামী, একটু যত্নের কাঙাল, কিছুই পাই না। ভেবেছিলুম,··· না···ভয় নেই, তোমাদের মারবো না······তবে,······এমন শোধ দেবো, সবাই তার ফল পাবে।······আমার মাথা ঘুরচে···

—শঙ্কর-দা। বলে সুনীতি ছুটে এসে শঙ্করের হাত ধরে ফেললে। সেই সময় চাকর এসে বললে,—গাড়ী তোয়ের।

—যাচ্ছি! বলে প্রবল ঝটকায় সুনীতির হাত ছিনিয়ে সরে গিয়ে শঙ্কর বললে,—একটি গুলি! আমি, যাবো, তুমি যাবে, সঙ্গে সঙ্গে নৈরাশ্যে বেদনায় বীণার দুনিয়াও পুড়িয়ে ছাই হয়ে যাবে। সে যেন ফুঁশতে লাগলো! সুনীতি চেতনাহীন! শঙ্করের হুঙ্কার,— আমি আত্মহত্যা করবো! অসতী স্ত্রী নিয়ে ঘর করবো?···না, না, আত্মহত্যা করবো। আর এ খুনের চার্জ্জে সাজা পাবে তুমি। বীণা, জ্বলবে··· · তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য, দরদ জানাবার জন্য তুমি তার পাশটিতে থাকবে, স্বপ্নেও তা ভেবো না······

একটা আওয়াজ! একটু ধোঁয়া!······

বীণা সুনীতি দুজনে কাঠ, স্পন্দনহীন! চেতনা ফিরতে চোখ চেয়ে দুজনে দেখে, শঙ্করের প্রাণহীন দেহ মেঝেয় লুটিয়ে পড়েচে।

সুনীতি রিভলভারটা হাতে তুলে নিয়ে দেখচে, এমন সময় শঙ্করের বাড়ীর লোকজন ঘরে এসে ঢুকলো……তার পর টেলিফোনে খপর পেয়ে পুলিশ…

পুলিশ সুনীতিকে খুনের চার্জ্জে চালান দিলে। চাকরটা সাক্ষ্য দিলে, বাবুর সঙ্গে বন্দুক কাড়াকাড়ি করতে দেখেচে সে কাকাবাবুকে। তাছাড়া বৌঠাকরুণকে নিয়ে কথা-কাটাকাটিও বিস্তর হচ্ছিল, সে শুনেচে।

সুনীতি এ খুনের কলঙ্ক, খুনের অপরাধ মাথায় তুলে নিলে— চোখের দৃষ্টিভঙ্গীতেও সত্য কথা প্রকাশ করলে না! কি করে তা হবে? তার প্রধান সাক্ষী বীণা! লক্ষ্মী সাধ্বী বীণা! দুখিনী, দুর্ভাগিনী বীণা! তাকে আদালতের কুৎসিত দৃষ্টির সামনে দাঁড় করিয়ে, মূঢ় জনতার অসম্ভ্রম কুৎসার মাঝে টেনে এনে বাঁচার চেষ্টা করার চেয়ে ফাঁসি-কাঠ তার ঢের সুখের, ঢের কাম্য!

অমূল্য স্তব্ধ হইল। ঝিল্লীর অবিরাম সঙ্গীতে একটা করুণ সুর জাগিয়া উঠিয়াছে। চারিধার আঁধারে ভরিয়া আসিতেছে। একখণ্ড মেঘ আসিয়া চাঁদের সামনে আড়াল তুলিয়া ধরিল। গাছপালার উপর হইতে জ্যোৎস্নার ক্ষীণ ধারাটুকু কোথায় উবিয়া গেল! সুনিবিড় অন্ধকারের মধ্যে পৃথিবীর সব হাসি-গান-গন্ধ-বর্ণ বিলুপ্ত হইয়া শুধু পুরুষের নির্ম্মম, বর্ব্বর প্রতিহিংসার রক্তধারা সেই অন্ধকারের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশিয়া তাকে যেন আরো গাঢ়, আরো নিবিড় করিয়া তুলিতেছিল ……

কাঁচা-পাকা

রাত্রি দশটায় দিল্লী-প্যাশেঞ্জার হাবড়া ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিল। পূজার কিছু দেরী আছে—আর এখানা অত্যন্ত 'শ্লো' প্যাশেঞ্জার বলিয়া যাত্রীর ভীড় এটায় কিছু কম।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিবামাত্র সেকেণ্ড ক্লাশের তরুণ যাত্রী নীরদ গাড়ীর একমাত্র তরুণী সঙ্গিনী স্নেহর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—এইবার!

স্নেহর পাশে তার এগারো মাসের খোকা শুভ্র শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; খোকার ঝী পাশের 'সার্ভেণ্ট'-মার্কা ছোট্ট কামরার মধ্যে—নীরদই তাকে সেই কামরায় উঠাইয়া দিয়াছে—রাত্রে বেচারী ঘুমাইয়া নিক্! যদি বেশী দরকার হয় তখন, নয়তো সেই ভোরে তাকে এ গাড়ীতে আনিলেই চলিবে। স্নেহ তখনই তরুণ স্বামীর ফন্দী বুঝিয়াছিল—কিন্তু সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে শান্তিভঙ্গ হইবে ভাবিয়া কোনো আপত্তি তোলে নাই! এখন স্বামীর মুখের ঐ ছোট্ট কথায় কতদিনকার কত বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যুতের মত তার সমস্ত প্রাণটাকে ছুঁইয়া বহিয়া গেল! সে শুধু চোখের দৃষ্টিতে কটাক্ষ ভরিয়া হাসিয়া জবাব দিল,—তুমি কম দুষ্টু!

—না, সত্যি, কথা রাখতে হবে এবার। তুমি তো বলে ছিলে—বলিয়া নীরদ বেঞ্চের তলা হইতে স্যুটকেশটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিল, এবং নিজে তার মধ্য হইতে বাহির করিল, একজোড়া মেয়েদের মোজা ও লেডিস্ শু।

সেগুলা বাহির করিয়াই স্নেহর পা টানিয়া নীরদ বলিল—মোজা পরো।

—আঃ, কি করো,—পায়ে হাত দাও কেন? যাও! বলিয়া স্নেহ পা সরাইয়া উঠিয়া নীরদের পা ছুঁইয়া সে হাত মাথায় ঠেকাইল।

নীরদ বলিল,—নাও, পরো।

—এখনি? এই রাত্রেই? এখন তো ঘুমোতে হবে! তা এই মোজা-জুতো পরেই ঘুমোব! এমন পাগলও দেখিনি!

স্নেহ-ভরা স্নেহর এই ভর্ৎসনার পর নীরদের মুখে এমন একটা কাতর ভাব ফুটিল যে, স্নেহ তা দেখিয়া তখনই বলিল,—পরচি, দাও। কাল সকালে ট্রেণ থেকে নামবার সময় পরলেই হতো না? তোমার সব বাড়াবাড়ি!

নীরদ বলিল,—তাই পোরো!

—অভিমান হলো অম্‌নি! দাও বাবু, পরি। স্নেহ স্বামীর হাত হইতে মোজা ও জুতাজোড়া টানিয়া লইয়া বেঞ্চের উপর রাখিল এবং মোজা পায়ে দিতে দিতে স্বামীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নীরদের মুখের উপর হইতে বেদনার কালো মেঘখানা সরিয়া গিয়া সেখানে তখন আনন্দের জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিতেছে!

মোজা-জুতা পায়ে দিয়া স্নেহ দাঁড়াইল। ট্রেণ চলিতেছিল। নীরদ বলিল—একটু চলে বেড়াও দিকি।

স্নেহ চলিয়া বেড়াইল। লজ্জায় তার পা কেমন বাধিয়া যাইতে-ছিল! স্বামীর পানে হাসিয়া চাহিতেই সে দেখিল, স্বামীর মুখে-চোখে কি সে মুগ্ধ ভাব! আঁচলের একটা কোণ মুখে পুরিয়া বাকীটায় পা ঢাকিয়া সলজ্জ হাসির ভঙ্গীতে সে বসিয়া পড়িল, বলিল—যাও, ভারী

লজ্জা করচে! নীরদ তাকে ধরিয়া তুলিল, এবং একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া তার মুখে বারবার চুমা দিল।

হঠাৎ স্নেহ চমকিয়া তাকে ঠেলিয়া সরিয়া গেল, বলিল,—আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো—ষ্টেশন এসেচে।

হতভম্বের মত নীরদ মাথা নীচু করিয়া দেখে, গাড়ী আসিয়া লিলুয়া ষ্টেশনে থামিয়াছে।

২

এই তরুণ দম্পতীর এই অদ্ভুত জায়গায় এই অপরূপ প্রেম-লীলার একটু ইতিহাস আছে।

নীরদ সুস্থ কলেজ হইতে বাহির হইয়াছে—সব কটা পাশ দিয়া এবং সব পরীক্ষাতেই বেশ সুনাম লইয়া। পড়া-শুনার সঙ্গে সঙ্গে এই জীবনের বসন্তে সে ফুলের গন্ধ, পাখীর গান, দক্ষিণ-হাওয়া এগুলার বিরুদ্ধে কোনোদিন প্রাণের কপাট বন্ধ রাখে নাই। কীট্‌স্-শেলীর কবিতা, কালিদাস-সেক্‌স্পীয়ারের নাটক, তাদের সাল-তারিখ আর নির্ঘণ্টের খোলস ছিঁড়িয়া ভিতরকার সুধা-রস নীরদকে আকণ্ঠ পান করাইয়াছিল—তাই পরীক্ষার ক্ষেত্রে ঐ সব কাব্য-নাটকের খুঁটিনাটী তর্ক-বিতর্ক, তাকে যেমন পরাস্ত করিতে পারে নাই, জীবনের ক্ষেত্রেও তেমনি তাদের স্বপ্ন-কুহক নীরদের প্রাণে এক মায়ার রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। অর্থাৎ ক্লাশে ভালো ছেলে হইয়া সে চোখে ঠুলি দিয়া অন্ধ ভাবেই বসিয়া থাকে নাই—প্রথম যৌবনের অপরূপ মাধুরীর বর্ণ-কুহকে বাহিরের বিশ্বকে সে বিচিত্র রঙে রাঙাইয়া তুলিয়াছিল।

বি-এ পাশ করিবার পর তার বিবাহ হয় স্নেহর সঙ্গে। স্নেহ একেবারে রবীন্দ্রনাথ ও কীট্‌স্-শেলীর কাব্য হইতে সমস্ত রূপের

হিল্লোল লইয়া যেন তার চোখের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল! ঠিক যেন বসন্তের প্রাতে ঘুম-ভাঙা হাওয়ার প্রথম স্পর্শে ফোটা-ফুলের কুঁড়ির মত!

কিন্তু সে ফুলটিকে ভালো করিয়া চোখে দেখিবার তার অবসর কোথায়? বাড়ীতে এক-বাড়ী লোক,—বাড়ীর আইন-কানুনও সেই কোন্ মোগল-আমলের কড়া পর্দ্দার কাপড়ে ঘেরা! স্নেহ মুখের ঘোমটা খুলিতে লজ্জায় কাঁটা হইয়া ওঠে! রাত্রে অস্ফুট কণ্ঠস্বর ছাড়া তার প্রেম প্রকাশের রূপ পায় না! অথচ বাহিরে মুক্ত জীবন-হিল্লোল দেখিয়া নীরদের প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত! ঐ যে বায়োস্কোপে তরুণ দম্পতী একত্র বসিয়া ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে কি সুখ ভোগ করিতেছে,—ঐ চলন্ত মোটরে জীবন আর যৌবনের চপল লীলা-রঙ্গ! আর তার অদৃষ্টে······? অথচ জীবনকে উপভোগ করিবার মত উপাদান তার হাতে যা আছে······

নৈরাশ্যের তীব্র নিশ্বাস আগুনের ঝাঁজ তুলিয়া তার প্রাণটাকে যেন পুড়াইয়া দিত। স্নেহ তো অবুঝ নয়! সে নীরদের দুঃখ বুঝিত; কিন্তু বেচারী কি করিবে? বাড়ীতে ঠাকুরঝি আছে; তাছাড়া সম্পর্কে বড় জা, ননদের দলে বাড়ী একেবারে ভর্ত্তি···তারা যদি এদিকে সাহায্য না করে, তবে সে বৌ-মানুষ নিজে হইতে কি করিয়া···সে যে বড় নিরুপায়!

নীরদ তা বুঝিত। তার মনে হইত, সে যেন পাথরের কারাগারে বন্দী আছে—লোহার কঠিন শৃঙ্খলে তার হাত-পা বাঁধা, প্রাণখানার উপর অবধি ভারী পাথর চাপানো! এক-একবার মনে হইত, মরিয়া হইয়া বিপুল বলে এ শৃঙ্খল সে ছিঁড়িয়া ফেলে, বুকের উপরকার পাথরটাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া সরায়! শুনিয়া স্নেহ বলিত,—ছি!

দুজনে কত না প্ল্যান খাটাইত, রাত্রির স্তব্ধ নির্জ্জনতায় নিজেদের ঘরে শয্যায় শুইয়া।…যদি কখনো পশ্চিমে যাওয়া যায়—শুধু দুইজনে—আর কেহ সঙ্গে থাকিবে না—শুধু নীরদ আর স্নেহ! আঃ!…কিন্তু তাই বা কি করিয়া হয়! বাড়ীর আইন-কানুন যে-রকম, তাহাতে সে আশা করা বাতুলতা।…নীরদ ঠিক করিল, সে ডেপুটিগিরি চাকরি লইবে, তাহা হইলে বিদেশে কেমন ঘুরিয়া বেড়াইবে, তখন……

কিন্তু বিধাতা অন্য বিধান করিলেন। পিতা বলিলেন,—ডেপুটিগিরিতে সুখ নেই, বাপু। তুমি হাইকোর্টে যাও। নীরদ বিরক্ত হইল; কিন্তু বাপের মুখের উপর কথা বলিবে, এমন সাহস বা এমন শিক্ষা ছিল না। তাই সে মনে মনে গুমরিয়া হাইকোর্টে গেল ওকালতি করিতে!…

সে কি ভালো লাগে! কতকগুলা নীরস কাগজ পড়িয়া বই মিলাইয়া পেন্সিল দাগিয়া দরখাস্ত লেখা! কোর্টে ঘণ্টা দুই ঘুরিয়া সে ইডেন গার্ডেনে গিয়া বসিত; বোটানিকাল গার্ডেনে যাইত,—ষ্টীমারে চড়িয়া কোনোদিন ছুটিত রাজগঞ্জে, কোনোদিন বা শিবতলায়।

দু' তিন বছর এমনি ঘোরার পর মাঠে জলে ভিজিয়া ম্যাচ্ দেখিয়া নীরদের জ্বর হইল। দেখিতে দেখিতে জ্বর বাড়িয়া গেল—শেষে প্রাণ লইয়া টানাটানি। ডাক্তারে প্রাণটা রক্ষা করিল—কিন্তু মনটা যে ক্রমেই থেঁতো হইয়া যাইতেছিল নৈরাশ্যে ঝাঁজিয়া, ডাক্তারের সাধ্য ছিল না, তার দাওয়াই দেয়!

শেষে একদিন নীরদ একটা ফন্দী ঠাওরাইল। সে ডাক্তারকে ধরিয়া বসিল। এবং ডাক্তারও নানা অছিলায় কথা পাড়িলেন, নীরদকে কোর্টে আবার বাহির করিবার পূর্ব্বে উহাকে একবার পশ্চিমে

মাস-দুয়েকের জন্যও ঘুরাইয়া আনা দরকার! নহিলে এ শরীরে কোর্টের খাটুনি সহ্য হইবে না।

এ ব্যাপার লইয়া বাড়ীতে তখন সোরগোল পড়িয়া গেল—এ যে বিচিত্র বিধান! ডাক্তার তাগিদের পর তাগিদ দিলেন—বাড়ীর কর্ত্তা ভাবিলেন, তাই তো! কিন্তু তার সঙ্গে যায় কে?

মাকে ধরিয়া নীরদ একদিন বলিল—আমার কেমন মাথা ঘোরে মা, প্রায়ই!

মা শিহরিয়া কহিলেন,—ষাট্, ষাট্!

তখন মা-ই বলিলেন,—নীরদকে পশ্চিমে পাঠাও! কিন্তু পাঠানো যায় কার সঙ্গে!

বাপ সঙ্গে যাইতে পারেন না,—তাঁর হাতে বিস্তর কাজ, বিশেষ পূজার মরশুম আসিতেছে। আত্মীয়-জ্ঞাতির দলের অবস্থাও তাই! কে এ ঝক্কি সয়?

নীরদ একা যাক্! নীরদ বলিল, তা হয় না। শেষে স্থির হইল, মা, বাড়ীর পুরানো ঝী দাশুর মা-আর পুরানো পাচক সঙ্গে যাইবে; আর যাইবে পুরানো ভৃত্য রামচরণের ভাই বিষণ! এখন তো উহারা বাহির হইয়া পড়ুক—তারপরে এখানকার বন্দোবস্ত পাকা করিয়া আর কাহাকেও পাঠাইলে চলিবে। নীরদ ঠিক করিল, মিহিজামে যাইবে—এক বন্ধুর বাড়ীও সে সংগ্রহ করিল। জায়গাটা কলিকাতার কাছে বটে, যাইতেও বেশী সময় লাগে না। অসুখ-বিসুখ হইলে চট্ করিয়া ফেরা যাইতে পারে—ডাক্তার পাঠানোও শক্ত ব্যাপার নয়। মা বলিলেন—অগঙ্গার দেশ—ভালো লাগে না যেতে!

অগত্যা মার যাওয়া হইল না। নীরদ ও স্নেহ তখন ভৃত্য, পাচক এবং দাসী লইয়া যাত্রা করিল।

যাত্রার পূর্ব্বাহ্নে নীরদ চুপিচুপি স্নেহর পায়ের মাপ লইয়া তার জন্য মোজা-জুতা কিনিয়া আনিয়াছে—এবং কথা হইয়াছে মিহিজামে লোক-চক্ষুর আড়ালে গিয়া স্নেহ পর্দ্দা খুলিয়া বেশ করিয়া তার সঙ্গে মিশিবে—কোনখানে এতটুকু আড়াল বা গোপনতা রাখিবে না। ট্রেণ হাবড়া ছাড়িতে তারই স্থচনাটুকু আমরা দেখিয়াছি।

৩

মিহিজামে নীরদের বাসা ছিল সুন্দরপাহাড়ীতে! নানা ফুলে-ভরা বাগানের মধ্যে পরিচ্ছন্ন বাংলা। কাছাকাছি দু-তিনটা ছোট ছোট পাহাড়ও দেখা যায় আর দিগন্তবিস্তৃত মাঠ—সবুজ ঘাসে ছাওয়া! বাঙলার সামনে লাল মাটীর পথ—দু'ধার গাছে ছায়া-করা, ভারী স্নিগ্ধ। বাড়ী দেখিয়া নীরদ ও স্নেহ মুগ্ধ হইয়া গেল; প্রাণ অসহ্য পুলকে উছলিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, তারা দুটি খাঁচার পাখী এতদিন খাঁচার মধ্যে বদ্ধ ছিল। খাঁচার বাহিরে এতখানি মুক্তিও ছিল! এ যে তারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই!

আসিয়া দু-তিন দিন ঘর গুছাইতেই বেলা কাটিয়া গেল। সেদিনও সন্ধ্যা হয়-হয়, এমন সময় নীরদ তাড়া দিল,—একদিনও বেরুনো হলো না। আজ বেরুবো, চট করে তৈরী হয়ে নাও!

স্নেহ গা ধুইতে গেল; নীরদ সজ্জিত হইতে লাগিল। স্নেহ যখন শাড়ী মোজা জুতা আঁটিয়া বাহিরে আসিল, তখন দিনের আলো নিবিয়া গিয়াছে। নীরদ বলিল—হোক্ গে সন্ধ্যে—এসো, একটু বেড়িয়ে আসি।

দুজনে বেড়াইতে বাহির হইল। একটু গিয়াই রেলোয়ে ষ্টেশন। ষ্টেশনের কাছে কতকগুলা দোকান—খাবারের দোকান, পানের দোকান, মাংসর দোকান। দুজনে প্লাটফর্ম্মে গেল। সিগন্যাল

পড়িয়াছে। কলিকাতার গাড়ী আসিতেছে। দুজনে গিয়া প্লাট্‌ফর্‌মের সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল। রেল-লাইন এখানে অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে ছুটিয়া গিয়া দূরে পাহাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে। ঐ দূরে ধোঁয়া! ট্রেণ আসিতেছে! ঘণ্টা পড়িল। দেখিতে দেখিতে ট্রেণও আসিল। এক-গাড়ী লোক। একটা হট্টগোল, দৌড়াদৌড়ি, পুলিশ, পাণিপাঁড়ে; চীৎকারে মিনিটখানেকের জন্য স্থানটাকে মুখরিত করিয়া দিয়া ট্রেণ তার দীর্ঘ দেহ লইয়া চলিয়া গেল। ষ্টেশন আবার যেমন ছিল তেমনি নীরব হইল; শুধু টিকিট-ঘরে টেলিগ্রাফের বাবু টকাটক্ টকাটক্ শব্দে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কাজ করিতেছে। স্নেহ বলিল—যেন একটা স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল—না?

নীরদ বলিল—ঠিক তাই। আমাদেরও জীবনটাকে এখানে স্বপ্ন দিয়ে গড়ে তুলি, এসো। এ স্বপ্ন কিছুতে মিলুবে না।

বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিতে ভৃত্য বলিল, গোয়ালা দুধ দিয়া যায় নাই এবং ময়দা না আনিলে লুচি ভাজা হইবে না।

নীরদ বলিল—মালী কোথায় গেল?

পাচক বলিল,—তার বাড়ীতে কাজ আছে বলিয়া সে এবেলা ছুটী লইয়া গিয়াছে।

নীরদ ধমক দিল—কার কাছে ছুটী নিলে?

পাচক বলিল—কেন, বৌমার কাছে বলেছিল তো।

স্নেহ অপ্রতিভভাবে বলিল—হ্যাঁ, বলেছিল বটে!

নীরদ বলিল—বেশ! গোয়ালার বাড়ী কে জানে? আর ময়দাই বা কোথায় পাওয়া যাবে, তাও তো জানি না।

পাচককে বলিল—তুমি জানো?

পাচক বলিল—না। মালী বলেছিল,আজ আমায় দেখিয়ে আনবে।

নীরদ বলিল—কুছ্ পরোয়া নেই !

ঝী রাগিয়া বলিল—খোকা খাবে কি ? দুধ নেই।

নীরদ বলিল—হরলিক্‌স্ দাও গে।

স্ত্রী বলিল—হরলিক্সের নতুন বোতল তিনটে ফেলে আসা হয়েচে !

—বেশ ! বলিয়া নীরদ মুহূর্ত্ত দাঁড়াইল; পরে বলিল—আচ্ছা, বিষণ, তুই আয় আমার সঙ্গে। ষ্টেশনে দেখি গে খোঁজ করে, একটু দুধ মেলে কি না !

নীরদ বিষণকে লইয়া চলিয়া গেল এবং ষ্টেশন-মাষ্টারকে বলিয়া-কহিয়া তাঁর ঘর হইতে রাত্রে খোকার ব্যবহারের মত এক পোয়া দুধ চাহিয়া আনিল। বাড়ী আসিয়া শুনিল, গোয়ালা দুধ দিয়া গিয়াছে। উহাদের কি-না-কি পরব ছিল, তাই দেরী হইয়াছে।

নীরদ বলিল—বিষণ, যা, এ দুধটা ফিরিয়ে দিয়ে আয়—বল্‌গে, দরকার নেই।

স্নেহ হাসিয়া বলিল—রাত্রে তুমি কি খাবে ? ময়দা অনেক দূরে পাওয়া যায়, গোয়ালা বলছিল।

নীরদ বলিল—তখন বললে না কেন, ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দাও ?

স্নেহ বলিল—সে দাঁড়াতে পারলে না, তার বাড়ীতে কাজ।

নীরদ বলিল—তাতে কি ! যাক্—গোটা কতক আলু সেদ্ধ করো, তাই খাবো। লুচির চেয়ে কি নীরেস সে ? আমরা দুজন বৈ তো না, কি বলো ? ভালো কথা, ষ্টেশনের কাছে দোকানে বেশ জিলিপি ভাজ্‌ছিল, সেই জিলিপি আর বোঁদে কিনে আনুক।

* * * *

চারিদিক গোছ-গাছ করিয়া ঠিক-ঠাক্ হইয়া বসিতে আরো পাঁচ-সাত দিন কাটিয়া গেল। গোছ-গাছ হইলে সেদিন সকালে নীরদ ও স্নেহ বহুদূর বেড়াইয়া ষ্টেশনে আসিল। বেলা তখন প্রায় আটটা। এখনি কলিকাতার ট্রেণ আসিবে। ঐ যে সিগন্যালও দিয়াছে।

দুজনে দাঁড়াইল, ট্রেণ চলিয়া গেলে বাড়ী ফিরিবে। সেদিন খাওয়া-দাওয়ার পর ঐ যে দূরে পাহাড়টা আছে, ওখানে যাইবার কথা। ঠাকুরকে বলিয়া আসা হইয়াছে—সে যেন দুপুরের টিফিনের জন্য লুচি ও তরকারী, ভাজা তৈয়ার করিয়া ফেলে; আর সঙ্গে যাইবে ষ্টোভ কেটলি প্রভৃতি চায়ের সরঞ্জাম। ওখানে ঘুরিয়া টিফিন সারিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিবে। অর্থাৎ আজ হইতেই জীবন-গ্রন্থে কাব্যের পৃষ্ঠা খোলা হইবে।

সশব্দে ট্রেণ আসিয়া পড়িল। আবার সেই সোর-গোল; স্নেহ ট্রেণের পানে চাহিয়া ছিল—আজ অনেক লোক নামিতেছে! উঃ, কি ভারী ভারী মোট-ঘাট!

নীরদ বলিল—এইবারে যাত্রী আসা সুরু হলো আর কি!

স্নেহ কোনো জবাব দিল না; একদল যাত্রী নামিতেছিল—সে তাদের দেখিতেছিল। তিনটা, পাঁচটা, সাতটা ছেলে মেয়ে! সব লইয়া—উঃ, এ যে একটা মস্ত দল! মোটা-সোটা স্ত্রীলোক একজন, বোধ হয় গৃহিণী! আর ঐ বোতাম-খোলা কোট গায়ে, হাতে হুঁকা, ভুঁড়িওয়ালা কর্ত্তা···এ কি, এ যে···

স্নেহ শিহরিয়া উঠিল।···তার পিশে মশায়!

যাত্রীরা সেই বিপুল মোটঘাট ও প্রকাণ্ড দল লইয়া ব্যস্ত, ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।—ওরে, কুঁজো কুঁজো—খাবারের চ্যাঙারি কৈ? খাবার? সীতেভোগ ছিল যে!—আর সীতেভোগ! যত বলি, গুছিয়ে রাখো—এমনি নানা কলরব-ভর্ৎসনায় একটা ঢেউ ছুটল।

নীরদ বলিল,—চলো—আবার ওদিকে চট্‌পট্‌ সব সেরে নিতে হবে তো—আজ পাহাড়ে পিকনিক্‌, মনে আছে ?

স্নেহর মন হইতে সব মুছিয়া গিয়াছিল। সে কেমন নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া ছিল; হঠাৎ বজ্রের মত দুজনের মধ্যে আসিয়া পড়িল, যাত্রীর দল হইতে একটি ছেলে। সে আসিয়াই—মেজদি! বলিয়া স্নেহর গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। যাত্রীরা অমনি তাদের পানে চাহিল।

স্নেহর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল—পিশিমা, পিশেমশায়! এই দিকেই আসিতেছেন; তাকে দেখিয়াছেন। সর্ব্বনাশ! তার পায়ে যে জুতা, মোজা, এই বেশ···!

একটা বারো বছরের বুড়ো-ধাড়ি মেয়ে আসিয়া বলিল—মেজদি কেমন সেজেচে দ্যাখো, মেমেদের মত! পায়ে জুতো মোজা—অ মা··· মা···মেয়েটা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে দলের কর্ত্তা ও গৃহিণী আগাইয়া আসিলেন। স্নেহ তাঁদের প্রণাম করিল। মোটা গৃহিণীটি নীরদকে দেখিয়া এক গলা ঘোমটা টানিয়া বলিলেন—জামাই বুঝি ?

স্নেহ ঘোমটা টানিতে পারে না—ক্রচ আঁটা! সে যেন মাটির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে! তার মুখে কথা নাই!

কর্ত্তা বলিলেন,—তুমিই নীরদ ?···তোমার এখানেই এলুম বাবা। ক'মাস ধরে ছুটি চাইছিলুম—এবারে শেষ দেড় মাস ছুটি মিললো। ভাবছিলুম, কাশী যাই, না, বৃন্দাবন যাব! বেয়াই মশায়ের সঙ্গে হঠাৎ সেদিন দেখা! তিনি বললেন, তোমায় এখানে একলা হাওয়া খেতে পাঠিয়ে তিনি ভারী উদ্বিগ্ন আছেন—ছেলে মানুষ—কর্ত্তা-ব্যক্তি কেউ নেই—কষ্ট হচ্ছে কত! শুনে তখনই ঠিক করলুম, তবে তোমাদের এখানেই আসি। বাড়ীভাড়াটা বেঁচে যাবে তো।—আমার খরচ-পত্র আমিই

করবো, তবু···কি জানো বাবা, ছাপোষা মানুষ—সংসারটি তো কম নয়!—ঐ মাইনেয়···তা, এ বেশ হলো! কোথায় খুঁজতুম? তা দেখি, তোমরা ষ্টেশনেই এসেচো।···তোমার বাবা টেলিগ্রাম করেছিলেন, বুঝি?

—আজ্ঞে না। বলিয়া নীরদ কাঠের পুতুলের মত একটা প্রণাম করিল, পরে পিস্‌শাশুড়ীকেও প্রণাম করিয়া কোনোমতে বলিল,—চলুন। কথাটা যেন কতদিনকার ক্ষুৎপীড়িত দুর্ব্বলের কণ্ঠস্বর!

কর্ত্তা বলিলেন,—মালটালগুলো তাহলে দেখে-শুনে আনাও, বাবাজী। আমরা এগুই! বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েচি। দুটো ছেলে নয় সঙ্গে থাক,—কেষ্টা আর বিনে। স্নেহ, চলো মা, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

বে-আইন

দাশু ঘোষ পাড়াগাঁয়ের গোয়ালা। ক'টা গরু আর ক' ঘর খরিদ্দার লইয়া তার দিন বেশ চলিয়া যায়! থাকিবার মধ্যে আছে একটি মাত্র মেয়ে রাণু। মা-মরা মেয়ে। মেয়ের বয়স পাঁচ বৎসর। বাপের কোলে-পিঠে চড়িয়াই মেয়েটি মানুষ হইতেছিল।

শত কাজকর্ম্মের আড়ালে প্রাণ যখন শোকের ঘায়ে কাতর হইয়া পড়ে, এই মেয়েকে বুকে চাপিয়াই সে সান্ত্বনা পায়, আরাম পায়। বিকালে তাকে লইয়া শিবতলার মাঠে গিয়া বসে, মন্দিরের দ্বারে গিয়া ঠাকুর দেখায়, বনের ফুল ছিঁড়িয়া তার দুই হাতে গুঁজিয়া দেয়; নদীর ঘাটে গিয়া নৌকা গণে—একখানা, দু'খানা—কতগুলা নৌকা ভাসিতেছে!

ঘাটের পাশে সেই শ্মশান-ঘাট,—বাব্‌লা ঝোপের মাঝে ঐ সে জায়গাটা, যেখানে নিজের হাতে চিতা জ্বালিয়া রাণুর মাকে একদিন তুলিয়া দিয়াছে, নিজের হাতে তার মুখে আগুন ধরাইয়া আসিয়াছে! ধূ-ধূ জ্বলিয়া চিতা গরিবের শেষ সম্বলটুকু পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে। আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তার প্রাণ শিহরিয়া ওঠে, মনে হয়, ঐ বুঝি চিতা এখনো জ্বলিতেছে! আকাশের পানে চায়,—একটা দুটো তারা মিট্-মিট্ করিতেছে—ও বুঝি সেই তারি চোখ, রাণুর মা'র। সমস্ত প্রাণ তার তাতিয়া ওঠে! তাড়াতাড়ি সে মেয়েকে লইয়া বাড়ীর পানে ফেরে। এমনি করিয়াই দিন যায়। এমনি করিয়াই মেয়ে রাণু আট বৎসরে পড়িল। জ্ঞাতি-কুটুম্বের দল আসিয়া তখন দাসুকে বলিল,—এইবার মেয়েটির বিবাহ দাও!

দাস্থর চোখ ছলছলিয়া উঠিল। বুকের পাঁজরা রাণু, বুকের রক্তে মানুষ-করা রাণু—বিবাহ দিয়া তাকে পরের ঘরে পাঠাইতে হইবে! এই ঘর একেবারে শূন্য করিয়া সে যাইবে কোথায়, কত দূরে, কোন্ অজানা ঘরে—দাস্থ এ-ঘরে তখন থাকিবে কি করিয়া? ভাবিতে গা শিহরিয়া ওঠে! সারাদিন কাজকর্ম্মের মাঝে রাণুকে চোখের আড় করিতে হয়—সেটুকুর অদর্শনেই প্রাণে যেন কে পাথর চাপিয়া ধরে! তাই সে হাঁপাইয়া ঘরে আসে, রাণুকে বুকের মধ্যে টানিয়া লয়, প্রাণ তবে শীতল হয়! সেই রাণু চলিয়া যাইবে? এই ঘর,—অপরাহ্ণের বেলা পড়িয়া আসিলে সন্ধ্যার অন্ধকারে ভরিয়া যাইবে, কে তখন বাঁবা বলিয়া তার গলা জড়াইয়া ধরিবে? কার অমৃত-স্বরে সারা ঘরে সুরের স্রোত বহিতে থাকিবে? আঁধার ঘর আঁধার থাকিবে, স্তব্ধ থাকিবে—কারো ডাকে স্বর ফুটিবে না, কারো নয়নের দৃষ্টি হইতে আলোর ছিটা ঝরিয়া পড়িবে না! দাস্থ বাঁচিবে কি করিয়া?

জ্ঞাতি-কুটুম্ব বলিল,—মেয়ে আঁকড়ে থাকলে চলবে না তো! বিয়ের বয়স হয়েচে যে তার!

উঠানের কোণে মাটীর পুতুল সাজাইয়া রাণু সেখানে বসিয়া খেলা করিতেছিল। ছোট্ট ডুরে শাড়ীর পুঁটুলিটির মতই কুণ্ডলী পাকাইয়া বসিয়াছিল—মাথাটুকু শুধু দেখা যায়। তার পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দাস্থ শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। তার মুখ দিয়া কোনো শব্দ বাহির হইল না।

জ্ঞাতি-কুটুম্ব ছাড়িবার পাত্র নয়! তারা দাস্থর পিছনে সৎ পরামর্শ লইয়া ঘুরিতে ছাড়িল না। ও-পাড়ার নফর গোয়ালা শেষে পরামর্শের সঙ্গে পাত্রেরো সন্ধান আনিল। ছেলেটি তারি সম্পর্কে ভাগ্নে হয়, থাকে কলিকাতায়। মস্ত গোয়াল তার বাপের, গোয়াল-ভরা গরু—

ঘরে গাড়ী-ঘোড়াও আছে—সেই গাড়ীতে করিয়া নিত্য সে কলিকাতার নতুন বাজারে দুধের জোগান দিতে যায়। এমন পাত্র হাতছাড়া করিলে বিশেষ রকম পস্তাইতে হইবে শেষে।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িয়া দাসু ভাবিল, এ অন্ধ মায়া ভালো নয়! এ যে মেয়ে—এ যে পরের ঘরের জন্যই তৈরী! ইহাকে বুক দিয়াও রাখা যায় না তো, রাখিবার জিনিষ নয়—ইহাকে বিলাইতেই হইবে! হয় আজ, নয়, কাল!

রতন ঘোষ বলিল,—তার চেয়ে এক কাজ করো বরং। ষষ্ঠীর ভাইপোটিকে জামাই করো—চাই কি, তোমার ঘরে এনেও তাকে রাখতে পারো, মেয়েকেও দূরে পাঠাতে হবে না।

রতন দাসুর টাকা ধারে, কাজেই দরদ তার এতখানি! দাসু ভাবিল, তা হয় না! তাতে সমাজের কাছে ইজ্জতের হানি আছে—ঘর-জামাই! সে কি মানুষ হইবে, বিশেষ মূর্খ গোয়ালার ঘরে!

দাসু মাথা নাড়িয়া বলিল,—না! আবার এ বয়সে নতুন গিঁট দেওয়া—তার চেয়ে ভাসিয়ে দেওয়াই ভালো। প্রতিমাকে তিনদিন আদর করে ঘরে রেখে জলেই তো দেয় মানুষ—বুক ভেঙ্গে গেলেও তাই দেওয়া ব্যবস্থা!—সেই ঠিক! দাসু চুপ করিয়া রহিল।

তখন আর রাণুর বিবাহে বাধা রহিল না।

নফর একটা দাঁও মারিল। বাপের এক-মেয়ের সঙ্গে বিবাহের বন্দোবস্ত করিয়া ও-পক্ষ হইতে সে মোটা রকমের কমিশন আদায় করিল।

শ্রাবণের এক সজল নিশীথে দাসু তার বুকের পাঁজরা ভাঙ্গিয়া রাণুকে জন্মের মত পরের হাতে তুলিয়া দিল। মুখে-চোখে অশ্রু মাখিয়া

চেলির কাপড় পরিয়া জগতে তার একটি মাত্র আপন-জন, তার এই বুড়া বাপকে ছাড়িয়া কোন্ অজানা ঘরে রাণু চলিয়া গেল।

২

দাস্থর আর এখানে দিন কাটে না! গরু, গোয়াল, খরিদ্দার—সব ভুলিয়া সব ছাড়িয়া মন তার নিশিদিন কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া এক অজানা ঘরের দ্বারে আছাড় খাইয়া মরিতে থাকে। হায়রে, কোন্ অজানা কোণে কি করিতেছে সে—একরত্তি মেয়ে? মা-হারা, বাপ-জানা বেচারী রাণু? আব্দারের তার সীমা ছিল না,—সেখানে কার কাছে আব্দার করিতেছে—কেই বা সে আব্দার রাখে তার?..... যদি কেহ রূঢ় কথা বলে, যদি কেহ চোখ রাঙাইয়া ওঠে? সে যে চোখ-রাঙানি কোনো কালে জানে না; রূঢ় কথার ধারও ধারে না! একটা কথার জবাব দিতে দেরী হইলে অভিমানে সে কাতর হইয়া পড়ে! সেখানে অজানা লোকজনের মাঝে কে জানে সে কেমন আছে। সময়ে কে বা ডাকিয়া খাবার দেয়! সে যে এখানে সন্ধ্যায় ঘুমাইয়া পড়িত, কত বুঝাইয়া, কত ভুলাইয়া, কি আদর করিয়াই না তাকে খাওয়াইতে হইত! সেখানেও তেমনি হয়তো ঘুমাইয়া পড়ে, যদি কারো মনে পড়ে, হয়তো ডাকে! ডাকিয়া সাড়া না পাইলে হয়তো বিরক্ত হয়—হয়তো দুটো ঝাঁজালো কথাও শুনায়, বেচারী তাতে নির্জ্জীব হইয়া পড়ে! হয়তো কতদিন অমন আহারও জোটে না! তারা তো জানে না, ও মেয়ে দাস্থর কে,—ও মেয়ের দামটা কি! তারা শুধু জানে, বাঙালীর ঘরের সর্ব্বসহা বৌ মাত্র রাণু।

ভাবিয়া মন-মরা হইয়া দাস্থ অসুখে পড়িল। মাহিনার লোক নিখুঁত করিয়া শুশ্রূষা করিল—দুই-চারিজন আসিয়া বলিল, মেয়েকে আনাও! দাস্থ গুম্ হইয়া রহিল, কোনো কথা বলিল না। শূন্য ঘরে

রোগের ঘোরে মন তার কলিকাতার দ্বারে-দ্বারে ঘুরিয়া মরিল। অজানা পথে ঘাটে কোথাও ঠাঁই মিলিল না! অজানা ঘর—তার অজানা কোণ—কোথায় লোকের ভিড়ে রাণু বসিয়া আছে···!

জ্বর শেষে বিকারে দাঁড়াইল। বিকারের ঘোরে কতবার সে চমকাইয়া উঠিল, কতবার ডাকিল,—রাণু, মা! কিন্তু কোথায় রাণু?

নফর একখানা চিঠি লিখিয়া দিল রাণুর শ্বশুর-বাড়ী,—দাসুর অসুখ, রাণুকে একবার পাঠাইয়া দিয়ো।

সে চিঠির জবাব আসিল না—রাণু তো আসিলই না।

ভুগিয়া ভুগিয়া দাসু সারিয়া উঠিল। আবার সেই ঘর, সেই দাওয়া, সেই উঠান, সেই গোয়াল, সেই সব—শুধু রাণু নাই! ইহার চেয়ে রোগে ভোগাও ছিল ভালো! রোগের ঘোরে রাণুর দেখা মিলিত, তার সঙ্গে কত কথাই হইত!

আরো ছ'য়মাস কাটিলে সে একদিন নফরকে ধরিল,—মেয়ের বিয়েই দিয়েচি—কিন্তু সে কি জন্মশোধ বিলিয়ে দিছি, দাদা! একবার এখানে সে আসবে না?

নফর ভ্রূটা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—তাদের বাড়ীর কি দস্তুর, জানো তো! হাজার হোক, পয়সাওলা লোক, বাড়ীর বৌকে তারা কোথাও পাঠায় না।

দাসু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—কিন্তু এ কি আর-কোথাও? এ যে বাপের কাছে! বুড়ো বাপ—যার আর তিনকুলে কেউ নেই ঐ মেয়ে ছাড়া—

নফর আর এ-কথার জবাব দিতে পারিল না। দাসু আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—একরাশ নক্ষত্র হীরার কুচির মত আকাশের নীল পটে চিক্ চিক্ করিতেছে!

৩

দাসু ঠিক করিল, হোক অপমান—জামাই-বাড়ীতেই সে যাইবে। মেয়েকে দেখিতেই হইবে—নহিলে বুক্ যে ফাটিয়া যায়!

একদিন ভোরের বেলায় টিকিট কিনিয়া সে রেলে চড়িয়া বসিল এবং বেলা প্রায় দু'টার সময় কলিকাতায় আসিয়া নামিল।

এখানে ওখানে কত সন্ধান লইয়া, নানা পথ ঘুরিয়া এক-গা ঘামিয়া শ্রান্ত দাসু আসিয়া জামাই-বাড়ী পৌঁছিল বৈকালে। যে-রকম অভ্যর্থনা আশা করিয়াছিল, তা তো জুটিলই না; জামাই শ্বশুরকে দেখিয়া একটা প্রণামও করিল না। বেয়াই শুধু বলিল,—এই যে, এসো বেয়াই।

তার পর নানা কথার পরও যখন রাণুকে দেখার কথা কেহ পাড়িল না, তখন দাসু নিজেই অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—একবার রাণুকে দেখবো।

বেয়াই বলিল,—তা দেখবে বৈ কি!

দাসুকে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। দাসু প্রবেশ-পথে দেখিল, রাণু একটা মস্ত জলের ঘড়া কাঁকালে করিয়া কলতলা হইতে চলিয়াছে। হঠাৎ দাসুকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল,—সঙ্গে সঙ্গে পা পিছলাইয়া কলসী-সমেত পড়িয়া গেল। ঘড়ার কানা লাগিয়া কপালটা কাটিয়া গেল। দাসু ছুটিয়া গিয়া তাকে ধরিল।

তার পরে দাসু মেয়েকে এক রকম কোলে করিয়াই ঘরের মধ্যে আসিল। মেয়ের পানে চাহিয়া তার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল! এই তার সেই রাণু? এ যে একটা শীর্ণ কঙ্কাল! পরণে একখানা ময়লা চিরকুট—গায়ে একখানা গহনা নাই! এই কি সে বড় মানুষের ঘরের আদরের বৌ!

অনেকক্ষণ মেয়েকে দেখিয়া দেখিয়া দাসু ডাকিল,—রাণু, মা।

রাণু সাড়া দিল,—বাবা! বাপের পানে মুখ তুলিয়া সাড়া দিয়াই সে মাথা নামাইল।

আশ্চর্য্য! এ কি রাণুর কণ্ঠস্বর! কোথায় সেই আদরে-ভরা হাল্‌কা হাওয়ায় নাচানো গানের সুর! রাণু যে হাওয়ার মতই চঞ্চল, সলীল,—সে এমন গম্ভীর নয় তো! কে এ? দাসু ভাবিল, তবে কি তার রাণুর ভিতরটা সব কাড়িয়া শুধু তার জীর্ণ খোলস্‌টাকে সে এই পরের হাতে তুলিয়া দিয়াছে!

দাসু তাকে কোলে টানিয়া, তার মুখে-চোখে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল,—বড্ড কেটে গেছে ঠোঁটটা!·· অমন কাজও করে! অত বড় ঘড়া ছেলেমানুষ বইতে পারে?···কেন, ঝী কি চাকর নেই রে? বড় লোক তো এরা—

রাণু সে কথায় কাণ দিল না—বাপের পানে চাহিল। সে কি দৃষ্টি! সে দৃষ্টিতে ছিট্‌কাইয়া বাহির হইয়া পড়িল, তরুণ প্রাণের কি সে করুণ ইতিহাস, মর্ম্মবেদনার কি কাতর উচ্ছ্বাস!

দাসুর আর বুঝিতে বাকি রহিল না, রাণুকে সে কোথায় পাঠাইয়াছে। রাজার রাণী হইবে ভাবিয়া, সহরে বড়লোক কুটুম করিয়া তার যে কত বড় লাভ হইয়াছে, এক নিমেষে দাসু তা বুঝিয়া ফেলিল! যদিই বা বুঝিতে গিয়া দুটো প্রশ্ন করিত, তারও প্রয়োজন হইল না। বাহিরে টিপ্পনীর স্বর শুনা গেল—বাপ-সোহাগী আদুরী মেয়ের সোহাগ হচ্ছে! লাগাচ্ছেন! বাপ আমাদের ফাঁসি দেবে!

এ কথা শুনিয়া দাসু একেবারে কাঠ হইয়া গেল। মেয়ের পানে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ প্রচণ্ড রোষের এক তীব্র বিদ্যুৎ-শিখা তার শান্ত প্রাণে আগুনের হল্কা বহাইয়া দিল। মেয়েকে বুকে টানিয়া

সে বলিল—আমার সঙ্গে যাবি মা? মেয়ে ব্যাকুল নিবেদন-ভরা চাহনিতে বাপের প্রশ্নের জবাব দিল ; তার মুখে কথা বাহির হইল না।

দাস্থ বলিল,—কালই তোকে নিয়ে যাবো।

রাণু অত্যন্ত ভীত নয়নে চারিদিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত স্বরে বলিল,—এরা পাঠাবে না।

দাস্থর প্রাণ হুঙ্কার দিয়া উঠিল,—না—পাঠাবে না! আমি তো মেয়ে বেচিনি কসাই-বাড়ী।

রাণু ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। চম্‌কাইয়া বাপের মুখ চাপিয়া সে কহিল—চুপ, চুপ!

ছোট্ট ইঙ্গিত! কিন্তু দাস্থর বুকে তা'ই একখানা প্রকাণ্ড শোকের ছবি আঁকিয়া তুলিল!

* * * *

অনেক রাত্রি। বিছানায় পড়িয়া দাস্থ ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। রাণুর যে-মূর্ত্তি সে চোখে দেখিল, তা দেখিয়া প্রাণ যে স্থির থাকে না! মেয়েটা এ দশায় থাকিলে বাঁচিবে না তো! তার এই এক মেয়ে, আর কেহ নাই তার! ইহাদের কি? একটা বৌ গেলে অমন পাচটা আসিবে! কিন্তু তার যে এই এক, তার সব—গেলে আর পাইবার নয়!

অন্ধকার ঘর। হঠাৎ কার হাতের স্পর্শ গায়ে ঠেকিল! সঙ্গে সঙ্গে অতি মৃদু কণ্ঠে কে ডাকিল,—বাবা—

——রাণু?

—হ্যাঁ, চুপ।

তার পর মেয়ে কাঁদিয়া বলিল,—আমায় নিয়ে চলো, এখনি। নাহলে······

কথা শেষ হইল না। তবু দাস্থ বুঝিল, না হইলে কি হইবে!

কিন্তু কি করিয়া যাওয়া যায়? ইহারা পাঠাইবে না। বেয়াইয়ের কাছে সে কথা পাড়িয়াছিল, বেয়াই হাসিয়া বলিয়াছে, তাদের বাড়ীর বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাইবার রেওয়াজ নাই!...তবে......?

রাণু বলিল,—আজ রাত্রেই চলো বাবা। এখনি। নাহলে কাল এঁরা পাঠাবেন না। তুমিও কাল চলে যাবে কুটুম-বাড়ীতে কাল তো আর থাকবে না।

ভোর না হইতেই মেয়ের হাত ধরিয়া বেচারা দাসু বাড়ীর বাহির হইল। একটু গিয়া একটা গাড়ীতে করিয়া ষ্টেশনে গেল। যখন ট্রেন চলিল, রাণু একেবারে বাপের বুকে ঢলিয়া পড়িয়া ডাকিল—বাবা, আর আমায় সেখানে পাঠিয়ো না। আমি মরে যাবো।...একটা বৌ শাশুড়ীর জ্বালায় গলায় দড়ি দিয়ে মরেচে। তাই আমার সঙ্গে বিয়ে দেছে—কলকাতায় কেউ মেয়ে দিচ্ছিল না।

দাসু চমকিয়া উঠিল। বটে! তাই! তাই নফরের অত অনুরোধ, অমন আগ্রহ! রাগে মনটা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পাজী, বেইমান, বিশ্বাসঘাতক! কিন্তু মিথ্যা এ রাগ। মেয়ের পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া দাসু বলিল,—না মা, আর সেখানে পাঠাবো না। রাণু বলিল,—পাঠালেও আমি সেখানে যাবো না। রাণু চোখের জল মুছিল।

৪

তবু রাণুকে যাইতে হইল, তবে পুলিশের সঙ্গে।

রাণুর শ্বশুর ছেলেকে দিয়া আদালতে নালিশ করাইল, মেয়ের বাপ আসিয়া তার বাড়ী হইতে তার স্ত্রীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। সে রাণুর স্বামী, আইনতঃ সেই তার অভিভাবক। বাপের সঙ্গে সম্পর্ক কি?

হাকিম আইনের চাকর। রাণুর নামে তখনি ওয়ারেণ্ট বাহির

হইল, দাস্থর নামেও বাদ রহিল না। আসামী হইয়া দাস্থ আসিল কলিকাতার পুলিশ কোর্টে বিচারের জন্য।

*　　　*　　　*

এই সময় আমার সঙ্গে দাস্থর দেখা। আমি দাস্থর পক্ষে দাঁড়াইলাম। ব্যাপার শুনিয়া দাস্থকে বলিলাম,—মামলা মিটাইয়া ফ্যালো, দাস্থ। আইনে তোমার সাজা হবে।

দাস্থ অবাক! মেয়ে অত্যাচারে জ্বলিতেছিল, পরের হাতে পরের ঘরে,—তার নিজের মেয়ে, ঐ এক মেয়ে, তার উপর মা-হারা সে! তাকে সে বাঁচাইতে চায় বলিয়া আইন তাকে সাজা দিবে!

আমি বুঝাইলাম, স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র মালিক!

দাস্থ বলিল,—ঐ তো স্বামী! তা-ছাড়া মেয়ে আমার একেবারে কচি, অত অত্যাচার তার সইবে কেন?

আমি বলিলাম,—তা বলিয়া তুমি চুরি করিয়া সেখান হইতে মেয়েকে আনিতে পারো না!

দাস্থ বলিল,—চোখের সামনে দেখিব, মেয়েটাকে মারিয়া ফেলিবে?

এ কথার উত্তর নাই। তখন আমার জুনিয়ারীর পালা। আইন তখনো মনে চাপিয়া বসে নাই, মানুষের মনটাকেই আইনের চেয়ে বড় দেখি! তবু পরামর্শ দিলাম,—আইন বড় বদ।

দাস্থ বলিল,—ঐ কসাইয়ের কাছে মাথা হেঁট করিব না। মেয়েকে উহারা দিবে না তো!

আমি বলিলাম,—আলাদা মামলা করিতে পারো, মেয়েও অত্যাচারের নালিশ করুক।...এ যে অপরাধ...তা ছাড়া অত্যাচারের সাক্ষী কে? দাস্থ বলিল,—আমি।

আমি বলিলাম,—তুমি তো অপরাধী।

দাসু বলিল,—আইন, মেয়ে—সব চুলায় যাক্!

মামলা চলিল। হাকিম ভালো, ব্যাপার বুঝিলেন। কিন্তু তাঁর হাত বাঁধা; কেতাব খুলিয়া অনেকবার চোখে চশমা আঁটিলেন, চশমা খুলিলেন; শেষে রায় দিলেন। দাসুর ক'দিনের জেল হইয়া গেল।

দাসু বলিল,—এ কি রকম হলো? মেয়েকে বাঁচাতে গেছি বলে জেল!

বহু চেষ্টাতেও তাকে বুঝাইতে পারিলাম না, সে বে-আইনী কাজ করিয়াছে, এবং আইন আগে, তার পর মানুষের স্নেহ, মায়া, মমতা!

শুনিয়া সে গম্ভীর মুখে জেলে গেল, মেয়ের নামও মুখে আনিল না।

শেষ

লেখকের লেখা অন্য বই

উপন্যাস

আঁধি	...	২॥০	দরদী...২য় সংস্করণ...		১৲
পিয়ারী	...	২৲	সোনার কাঠি...২য় সংস্করণ		১৲
কুজ্ঝটিকা	...	২৲	প্রেয়সী...৪র্থ সংস্করণ		১৲
নিরুদ্দেশের যাত্রী	...	১।০	মাতৃঋণ	...	১॥০
কাজরী ...২য় সংস্করণ		১॥০	নবাব	...	২॥০
স্ত্রীবুদ্ধি	...	১৸০	বন্দী...২য় সংস্করণ ...		১৲
বাব্লা	...	১॥০	রূপছায়া	...	২৲
মুক্ত পাখী	...	২৲	মরুমায়া	...	১৲
লাল ফুল	...	২৲	নেপথ্যে	...	॥০
ছোট পাতা	...	১॥০	পথের পথিক	...	।৵০
গরীবের ছেলে	...	১॥০	অকলঙ্ক চাঁদ	...	১॥০

ছোট গল্প

শেফালি...২য় সংস্করণ		৸০	যৌবরাজ্যে	...	১॥০
নির্ঝর...২য় সংস্করণ		১৲	পিয়াসী	...	১।০
মণিদীপ	...	১৲	মৃণাল	...	১।০
পুষ্পক	...	১৲	বৈকালি	...	॥০
পরদেশী...২য় সংস্করণ		১৲	চাঁদমালা	...	১৲

ছেলেমেয়েদের গল্প-উপন্যাস

লাল কুঠি (সচিত্র উপন্যাস)		১৲	ফুলের পাখা	...	॥০
মা-কালীর খাঁড়া (উপন্যাস)		১৲	তারার মালা	...	॥০
সাঁঝের বাতি	...	॥০	ময়ূরপুচ্ছ	...	॥০

বনের পাখী ... ॥০

নাট্যগ্রন্থ